Boighar.com

শ ক্তি প দ রা জ গু রু

পটলা সমগ্র ২

রহস্য নিবেদন

BOIGHAR

Boighar.com

সুখে থাকতে ভূতে কিল মারে বলে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে। মানে, সংসারে বেশ কিছু মানুষ আছে তারা সুখে শান্তিতে থাকতে চায় না। যেভাবেই হোক কোনো একটা অশান্তিকর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বেই। কথাটা আমাদের বন্ধু পটলা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা চলে। সে নিজে তো অশান্তিতে জড়াবেই, আর সেই সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের আমাদের বাকি চারজনকেও জড়াবে। ...

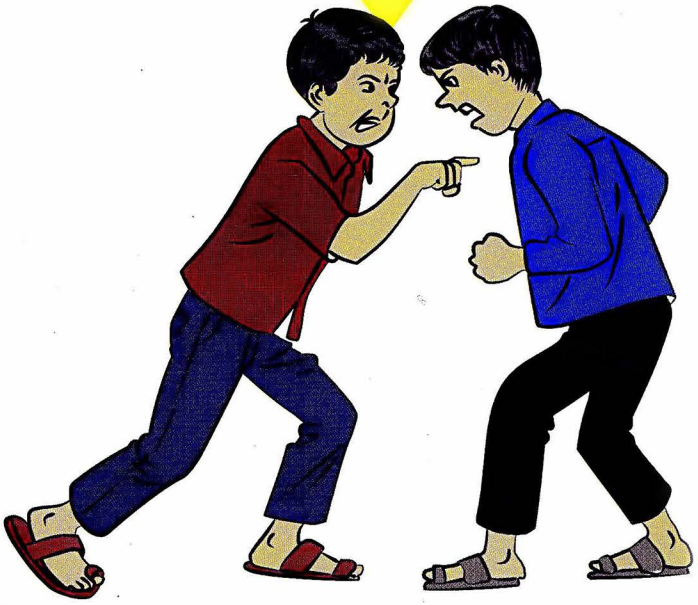

BOIGHAR

সমী, গোবরা, হোঁৎকা, ফটিক এবং পটলা, এই পাঁচজনকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব। পটলা এমনই এক ছেলে যার সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। সবসময় কোনো না কোনো ঝামেলায়, গণ্ডগোলে সে জড়িয়ে পড়বেই। আর সেই সব ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের ব্যাপারের মধ্যে ঘটে নানা মজাদার কাণ্ডকারখানা। তবে পটলা অ্যান্ড কোং কোনো ব্যাপারেই পিছু হঠার পাত্র নয়। তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফেলুদা, ঘনাদা, টেনিদা, পিনডিদার মতো পটলাও তো তোমাদের খুব প্রিয় চরিত্র। সেই পটলার নানা কাণ্ডকারখানা নিয়ে বহুদিন ধরেই লিখছেন সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু। পটলার সেই সমস্ত অভিযানগুলোকে দু'মলাটে বন্দি করে তোমাদের জন্য সাজিয়ে দেওয়া হল। সেগুলো পড়ে তোমরা খুব মজা পাবে। আর হ্যাঁ, পটলা যেমন নানা মজাদার কাণ্ডমাণ্ড করে, সে কিন্তু অনেক ভালো কাজও করে। তোমরা যদি এমন কোনো কাজ করতে পারো, দেখো তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর তোমাদের এই বই যদি ভালো লাগে, আমাদেরও ভালো লাগবে। আর কথা নয়, চলো এবার আমরা সকলে বেরিয়ে পড়ি পটলার সঙ্গে।

ISBN : 978-81-295-1384-7

পটলা সমগ্র

২

পটলা সমগ্র
২

শক্তিপদ রাজগুরু

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

PATLA SAMAGRA VOL-II
A Collection of Short Stories in Bengali By SAKTIPADA RAJGURU
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone 2241 2330/2219 7920, Fax (033) 2219 2041
e-mail deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹ 200.00

ISBN 978-81-295-2354-9

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : রঞ্জন দত্ত

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২০০ টাকা

প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই ঘর

SCAN

EDIT

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

কিশোর-কিশোরী
পাঠকদের

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

পটলা সমগ্র ১
পাঁচটি উপন্যাস
চলচ্চিত্রায়িত উপন্যাস-সংগ্রহ
পাঁচটি প্রেমের উপন্যাস
অধিগ্রহণ
জনপদ
স্বপ্নের শেষ নেই
আজ-কাল-পরশু
মাশুল
অমানুষ
স্মৃতিটুকু থাক
ভাঙাগড়ার পালা
দিনের প্রথম আলো
মেঘে ঢাকা তারা
শেষ প্রহর
গোঁসাইগঞ্জের পাঁচালী
নিঃসঙ্গ সৈনিক
পরিক্রমা
অনিকেত
দূরের মানুষ
নবজন্ম
গ্রামে গ্রামান্তরে
দিন অবসান
অধিকার

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে নানা লেখকের কলমে বেশ কিছু চরিত্র অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। কিশোর সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। ফেলুদা, টেনিদা, পিন্‌ডিদা, বগলামামা, বড়োমামা—এইরকম বহু চরিত্র সাহিত্যিকদের কলমে বর্ণময় এবং জনপ্রিয়। এইরকমই এক চরিত্র, বলা যায় মজাদার চরিত্র পটলা। কিশোর পটলা তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বিভিন্ন ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। ঘটে মজাদার বেশকিছু কাণ্ডকারখানা। তার মধ্য দিয়েও তারা বিভিন্ন রকম সামাজিক ভালো কাজও করে থাকে। প্রথিতযশা সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর কলমে পটলা এমনই এক জনপ্রিয় চরিত্র। পটলাকে নিয়ে লেখকের কাহিনির সংখ্যা পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। পটলার কাণ্ডকারখানাগুলো একত্রে দুই মলাটে বন্দি করে পাঠকদের কাছে নিবেদন করলাম। শুধু কিশোর বয়সিদেরই নয়, বড়োদেরও এই সংকলন প্রিয় হবে এই আশা।

পটলা সমগ্র ২

শক্তিপদ রাজগুরু

SCAN &EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE
BUYING THE ORIGINAL BOOK.

সূ চি

পটলার বসন্তোৎসব ১১

পটলার ম্যাজিক ১৬

দীপক রাগ ও ফটিকচন্দর ২২

পটলার সুমতি ২৮

পটলার সঙ্গীত সাধনা ৪৪

পটলার দেবদর্শন ৫৮

পটলাকে নিয়ে প্রবলেম ৬৪

লক্ষ্যভেদ ১১৫

হোঁৎকার বুদ্ধি ১২২

কুষ্মাণ্ড মাহাত্ম্য ১২৮

পটলার ভবিষ্যৎ ১৩৬

পটলার জলসা ১৪২

ইটের বদলে পাটকেল ১৫০

পটলা ও রামছাগল ১৫৭

পিকনিক ১৬৪

পটলার বৃক্ষরোপণ উৎসব ১৭১

পটলার ভ্রমণ ১৮০

পটলার ইন্দ্রজাল ২০৩

পটলার আইডিয়া ২১১

পটলার অগ্নিপরীক্ষা ২১৮

লঙ্কাদহন পালা ২৩৪

পটলার বসন্তোৎসব

দোলের দিনটা এবছর পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব অর্থাৎ আমাদের পাঁচজনের খুবই দুর্দিন গেছে। গেছে তাও বলা যায় না, এখনও তার জের চলছে। আর এই ঘন তমসার কারণ ওই পটলা।

ওটাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। অবশ্য ওই পটলচন্দ্রই আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের সেক্রেটারি-কাম-ক্যাশিয়ার-কাম-কামধেনু। অর্থাৎ যখন ইচ্ছা তাকে দোহন করা যায়। ক্লাবের যাবতীয় খরচখরচা, ফুটবল টিম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভ্রমণ ইত্যাদি দমকা খরচ ছাড়াও দৈনন্দিন খরচা যেমন গুপির দোকানের চা টোস্ট ওমলেট, ভজুয়ার ঝালমুড়ি, গোকুলের আইসক্রিমের বিল সব ওই পটলাই মিটিয়ে দেয়। অবশ্য ওদের অনেক টাকা। বিশাল বাড়ি, বাবার বিরাট কারখানা, কাকার ব্যবসা, ঠাক্‌মার বিরাট সম্পত্তি, কি নেই! তাই পটলাকে আমাদের দরকার।

তবে পটলার ওই এক দোষ। সব ভালো ওর, কিন্তু মাথায় মাঝে মাঝে উদ্ভট সব খেয়াল চাপে। আর তা মেটাতে গিয়ে নিজে তো বিপদে পড়বেই, সেই সঙ্গে আমাদেরও বিপদে ফেলবে। এবার দোলের দিন ওর খেয়ালেই নেমে এল পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের ঘোর দুর্দিন।

কুলেপাড়া চ্যালেঞ্জ শিল্ড ওই অঞ্চলের নামকরা শিল্ড। আই. এফ. এ শিল্ডের পরই তার নাকি সাইজ। সেই দুর্লভ শিল্ড আমরা পরপর দুবছর কুলেপাড়া ইলেভন বুলেটসকে কলা দেখিয়ে জিতেছি। এবারও সেমি-ফাইনালে উঠে গেছি, ওদিক থেকে উঠেছে কুলেপাড়া ইলেভন বুলেটস। ফাইনালে আর একবার মুখোমুখি হবো আমরা দুটো টিম। আর এবারও শিল্ড জিতব আমরাই তা কুলেপাড়াও জানে। এবার শিল্ড জিতলে ওই বিরাট শিল্ড পাকাপাকিভাবে এসে যাবে আমাদের হাতে। এ যেন আকাশের চাঁদ পাওয়া। তারই প্রস্তুতি চলেছে। ন্যাপাদার কোচিং-এ রোজ মাঠে নামছি আমরা। হোঁৎকা ব্যাকে, আমি পটলা ফরোয়ার্ড লাইনে, গোবর্ধন দশাসই চেহারা নিয়ে চায়না ওয়ালের অর্থাৎ দুর্ভেদ্য চীনের প্রাচীরের মত গোল আটকে দাঁড়ায়। অন্যরা তো আছেই।

আমাদের অন্যতম কর্মকর্তা ফটিক খেলাধুলা করে না। ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক সে। মাঠে তার দলবল নিয়ে সাধা গলা পঞ্চমে তুলে আমাদের উৎসাহিত করে আর আমরা গোল দিলে মাঠে নেমে কত্থক নৃত্য পরিবেশন করে। এবার হ্যাট্রিক করব তাই ফটিকচন্দ্র মাঠে কোরাস নৃত্যগীত পরিবেশনের প্ল্যান করছে ঢোল সহকারে। কিন্তু বরাতে যে এমনি সর্বনাশ লেখা আছে তা ভাবিনি।

দোল এসে গেছে। বিভিন্ন ক্লাব ওইদিন উৎসব করে। আমরাও এতদিন ক্লাবের মাঠে ফটিকের পরিচালনায় পাড়ার খেঁদি, বুঁচি, ছিপলি, মস্তানদের নিয়ে বসন্তোৎসব করেছি। তা সেদিন পটলা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গুপির দোকানের গরম ফিশ্ কাটলেট্ আনিয়ে সামনে ধরে।

হোঁৎকা বলে, ফিশ্-কাটলেট্! দুইখান দে।

গোবরার দেহটা গিরিগোবর্ধনের মিনি সংস্করণ। কিন্তু বুদ্ধিতে ঈষৎ কম। সে বলে, কাটলেট-এর সঙ্গে রুটিও দিতে বল পটলা। পেটের কোণে পড়ে থাকবে।

বইঘর.কম

তাই এল। পটলা যেন আজ কল্পতরু হয়ে গেছে। যে যা চাইছে তাই দিচ্ছে।

পটলা সঙ্গে এনেছে তার মাসতুতো ভাই আকাশচন্দ্রকে। তার শরীরটা সিঁটকে লগার মত, হাওয়ায় কাঁপে। কাঁধ ছাপিয়ে পড়েছে বাবরি চুল। পরনে কাজকরা গুরু পাঞ্জাবি-পায়জামা। বেশ শৌখিনই।

পটলা বলে, এবার দ-দ্-দোলে বসন্তোৎসব হবে নতুন আইডিয়ায়।

ফটিকই এসব করে। তবু জানাই, পটলা, এবার হ্যাট্রিক করে শিল্ড ঘরে তুলতেই হবে। খরচা আছে অনেক। ব্যান্ড আনতে হবে। দোলে বেশি খরচা করিস না।

পটলা অভয় দেয়, খ-খরচার জন্য ন-নো ফিয়ার। আইডিয়াটা শোন।

হোঁৎকা বলে, খাওয়া হইব তো। বেশ কবজিভোর মাংস-টাংস?

হোঁৎকার নজর খালি খাবারের দিকে। পটলা বলে, হবে।

—তালে ক'তর আইডিয়াটাই শুনি।

পটলা অবশ্য এত কথা একসঙ্গে বলতে গেলে অনেক টাইম নেবে। কারণ জিবটা ওর প্রায় ব্রেকফেল করে আলটাকরায় সেঁটে যায়। পটলার সেই মাসতুতো ভাই-ই বলে, কারণ আইডিয়াটা আসলে তারই।

আমরা শুনি। শ্রোতামাত্র। ফটিক গানটান নিয়ে থাকে। সে বলে, তা মন্দ হবে না। সকালেই প্রভাতফেরি একেবারে শান্তিনিকেতনী স্টাইলে ওই পবিত্র পোশাকে। শুধুমাত্র সংহতি, মিলনের গান গেয়ে পরিক্রমা। দারুণ হবে।

পটলা বলে, ত-হবে। আকাশদা কি যে সে। দেখবি ক্যামন হবে। এ-এক্কারে নতুন।

ক'দিন ধরে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব মেতে উঠেছে আগামী বসন্তোৎসবের প্ল্যান নিয়ে। পটলার ছোটকাকার প্রেসে ছাপা বাসন্তী রংয়ের হাজার কয়েক লিফলেট এরই মধ্যে বিতরণ করা হয়ে গেছে পাড়ার সর্বত্র।

ফটিক এখন আকাশদার সঙ্গে ক্লাবের ঘরে পাড়ার কিল্লিবিল্লিদের চকোলেট লজেন্স বিলিয়ে ডেকে এনে তারস্বরে গানের তালিম দিচ্ছে নৃত্য সহযোগে। ফটিক তবলা পিটছে আর আকাশদা ওর লগার মত হাত-পা আকাশে ছুঁড়ে নৃত্যশিক্ষা দিচ্ছে, 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে', ফাগুন নয়, যেন আগুনের শিখা লকলক করে নাচছে।

পটলা বলে, ব-বলিনি এবার নতুন করে প-পঞ্চপাণ্ডব ক-ক্লাব প-পাড়ায় আগুন লাগাবে।

দোলের দিন সাতসকালে ক্লাবের মাঠে এসে গেছে ফটিকের অক্লান্ত চেষ্টায় গড়া কিল্লিবিল্লিদের দল। সকলের পরনে বাসন্তী রংয়ের পোশাক।

পটলার দৌলতে আমাদেরও পরতে হয়েছে বাসন্তী রংয়ের পায়জামা-পাঞ্জাবি আর উড়ুনি। গোবরার বিশাল দেহে পাঞ্জাবিটা টিংটিং করছে, পায়জামা উঠেছে হাঁটুর কাছে। হোঁৎকা বেঁটে গোলগাল, তার পাঞ্জাবিটা সেমিজ হয়ে গেছে। হাঁটু ছাড়িয়ে ঝুলছে। আকাশদা ফটিকও ওই পোশাকে, একেবারে রংয়ের বাহার।

পটলার মুখে আজ খুশির চোটে বাক্য সরছে না। কেবল কয়েকটা স্বরবর্ণ, ব্যাঞ্জনবর্ণই বের হচ্ছে মাত্র।

হোঁৎকা আমাদের ফুটবল টিমের ক্যাপটেন। ওই বাসন্তী রংয়ের পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেই হুইসেল বাজিয়ে আগে আগে চলেছে সে। পেছনে আকাশদা আর ফটিক। কাঁধে জম্পেশ

বইঘর.কম
করে ঝোলানো হারমোনিয়াম। পিছনে গোবরা, আমি, পটলা, অন্যরা, তৎসহ ওই কিল্লিবিল্লির দল। তারস্বরে ফটিক গাইছে। আকাশদাও তার দীর্ঘ সিঁটকে হাত আকাশে তুলে গলার শির ফুলিয়ে চিৎকার করছে, 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে'।

কোথায় ফাগুন, কোথায় বন আর কোথায় ঘিঞ্জি রাস্তা! রাসমণি বাজারের ওদিকে রাস্তার দুদিকে বুকভোর খোলা নর্দমায় কাদা থিকথিক করছে, দুপাশে দোকান, লালার আটাকল, ওদিকে ভুসির আড়ত, সামনে বাজার, তরকারির খোসা, শুকনো পাতা, কপির ডাঁটা, পটা বেগুন-টম্যাটোর স্তূপীকৃত আবর্জনা। এখানেই তবু বসন্তের সাড়া এনেছি আমরা ওই মনোরম সাজে আর বেসুরো চিৎকারে। পথের দুদিকে অটোমেটিক লোক জুটে গেছে। দেখছে ওরা ওই অবাক ব্যাপার।

পথে রং খেলছে অনেকেই। আজ দোলের দিন, রং তো খেলবেই। তবে আমরা আবির ছড়াচ্ছি। রংয়ের ব্যাপারই নেই।

হঠাৎ গলির মুখ থেকে কুলেপাড়ার দল খোল করতাল মাইক তাসাপার্টি নিয়ে ড্যাম কুড়ু কুড়ু বাদ্যি বাজিয়ে আর উন্মাদ নৃত্যে কলরব তুলে একদল পিশাচের মত হা রে রে রে করে তেড়ে আসে। মুখে বাঁদুরে কালো রং। তারা তৈরি হয়েই এসেছে। বালতি থেকে ইয়া বোম্বা পিচকারিতে লাল খুনখারাপি রং ভরে কয়েকজন মিলে আক্রমণ করে আমাদের। নিমেষের মধ্যে হোঁৎকা, গোবরা, আকাশদা, পটলার রং বদলে করে দেয় একেবারে লাল টুকটুকে।

ওই অতর্কিত আক্রমণে আমরাও দিশেহারা। কিল্লির দল হাউমাউ চিৎকার করতে করতে নিমেষের মধ্যে ফরসা। পিছনে কোরাস গাইবার কেউ নেই। অবশ্য বনে বনে ফাগুন লাগার গানও তখন থেমে গেছে। প্রভাতফেরির দল ছত্রভঙ্গ। ফটিক হারমোনিয়াম বুকে করে সেঁধিয়েছে ভুসিমালের আড়তে। ছিটকে পড়েছে ভুসির গাদার উপর। মুখে গায়ে ভুসি মেখে দেখাচ্ছে একটা মর্কটের মত।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের বাদবাকিরা পথেই রয়ে গেছে লাল আপেল সেজে। কুলেপাড়ার সভ্যরা কাজ সেরে ততক্ষণে পলাতক। ওরা আমাদের বনে বনে ফাগুন লাগানোর চেষ্টাকে ব্যর্থ করে বিজয়ীর মত পালিয়েছে। কিন্তু আমাদের কপালে যে আগুন লাগিয়ে গেছে সেটা তখনও বুঝিনি। যখন বুঝলাম তখন আর করার কিছুই নেই।

রংয়ের চোটে চোখ জ্বলছে। পথের দুদিকে কৌতূহলী জনতা বিনা খরচায় এমন মজা দেখে বেশ উপভোগ করছে। হঠাৎ কলরব করে ওঠে জনতা—ভাগো, ভাগো, পালা—পালা!

হোঁৎকা চোখ খোলামাত্র দেখে সামনে চার পা তুলে শিং উঁচিয়ে ধেয়ে আসছে রাসমণি বাজারের ভোলানাথ।

ভোলানাথকে এ অঞ্চলের সবাই চেনে। এ এখানকার পার্মানেন্ট বাসিন্দা। বাজারের ওদিকে মন্দিরের চত্বরেই সে থাকে। আর বাজারের সবজি-আনাজপত্র, লালার দোকানের মুফৎ ভুসি, রেশনের দোকানে জোরজবরদস্তি চাল-গম সেঁটে নধর দেহ আর রাজকীয় মেজাজ নিয়ে ঘোরে।

ভোলানাথের সর্বাঙ্গে কুলেপাড়ার সভ্যরা বালতি কয়েক রং ঢেলে তার মেজাজ গরম করে দিয়েছে। সুখনিদ্রা ভেঙে গিয়ে সেও বের হয়েছে তার শত্রুদের সন্ধানে। এ হেন অবস্থায় সামনেই লালবর্ণ আমাদের ক'জনকে দেখে এবার হুঙ্কার ছেড়ে তেড়ে আসে।

প্রথমেই সে পেয়ে যায় হোঁৎকাকে। ওর বেঁটে গোলগাল দেহটা শূন্যে তুলে একপাক ঘুরিয়ে নিয়েই ছুড়ে দেয়। হোঁৎকা খবাৎ করে গিয়ে পড়ে ওদিকের নর্দমার ধারে দণ্ডায়মান লালাজির নধর ভুঁড়ির উপর, তারপর রিবাউন্ড করে সোজা চলে আসে সবজিওয়ালার কুমড়ো টালে—টালমাটাল হয়ে গড়িয়ে পড়ে রাস্তায়। তখন গোবর্ধনকে দেখা যায় ভোলানাথের শিং-এ চক্কর খাচ্ছে। তারপরেই সে গিয়ে পড়ে খোলা নর্দমার খিঁচের মধ্যে।

পটলার জিবটা আলটাকরায় আটকে গেছে। ব-ব-ব—একটা বিজাতীয় শব্দ ওঠে। পটলা ভোলানাথের শিং-এ চড়ে মাত্তর হাপচক্কর খেয়ে ছিটকে পড়ে পিচরাস্তার উপর। সঙ্গে সঙ্গে জিবটা খুলে গিয়ে বাকি শব্দটা বের হয়—বাপ রে।

আকাশ অবশ্য করিতকর্মা ছেলে, বেগতিক দেখে সে এর মধ্যে লম্বা পা ফেলে, ভোলানাথের নাগালের বাইরে চলে গেছে। তবু ভোলানাথ তার দিকে শিং চালাতে ওর ঢোলা পায়জামাটাই পেয়ে যায় আর একটানে সেটাকেই শিং-এ জড়িয়ে ফেলে। নেহাত আকাশদার পাঞ্জাবিটার ঝুল বেশি ছিল, তাই উইদাউট পায়জামাও পার পেয়ে যায়।

ডামাডোলের মধ্যে আমি হঠাৎ আবিষ্কার করি ভোলানাথের ঘাড়ে কি করে যেন অধিষ্ঠান হয়ে গেছি। কে বলে, বসে থাক। নড়বি না!

ষাঁড় নাকি মহাদেবের বাহন। কিন্তু মহাদেব কি করে ষাঁড়ের পিঠে বসে কৈলাস পাহাড় টপকে মুভমেন্ট করে জানা নেই। এক ঝটকায় ষণ্ডমহারাজ আমাকে ছিটকে ফেলতেই পথের পাশের পত্রহীন বটগাছের ডালটাই ধরার চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না। হাত ফসকে পড়ি কালভার্টের উপর। তারপর আর হুঁশ নেই কে কোথায় কীভাবে রইল।

জ্ঞান ফেরে হাসপাতালে। দেখি পাশাপাশি বেড়ে পড়ে আছি পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের চার মূর্তি। ওনলি ফটকে সটকেছিল আর আকাশটাই ওনলি পাঞ্জাবিপরা অবস্থায় কোনমতে পটলার বাড়িতে গিয়ে বসন্তোৎসবের 'ফুল রিপোর্ট' দিয়েছিল। জনতা কোন ঠ্যালাওয়ালাকে ধরে হাসপাতালে আমাদের জমা করেছিল।

হোঁৎকার বাঁ হাত ভেঙেছে, গোবরার গেছে ডান পা। আমার গোড়ালিতে চোট। পটলার সর্বাঙ্গ থেঁতলে গেছে পিচরাস্তায় পড়ে। ফলে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থেকে বের হয়ে এলাম। সেদিন দেখি পাড়ায় বিরাট প্রসেশন করে তিন দল ব্যান্ডপার্টি তাসাপার্টি নিয়ে কুলেপাড়া ইলেভেন বুলেটস্ কুলেপাড়া শিল্ড জয়ের বিজয়-উৎসব করছে। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব এবার সেমি-ফাইনাল থেকেই মাঠে অনুপস্থিত। তারা তখন হাসপাতালে।

পটলার আকাশদা নেই। বনে বনে ফাগুনের আগুন নয়, আমাদের বরাতেই নুড়ো জ্বেলে তিনি বিদায় নিয়েছেন। এখন পটলা বলে, মি-মি-মিসটেক হয়ে গেছল র‍্যা? কে-কে জানত বসন্তোৎসব এ-এমনি হবে।

পটলার ম্যাজিক

মাত্র ন'টাকা? পুরোপুরি দশই দাও। অ নরুমামা।

নরুমামা বলে ডাকি বাসন্তী স্টোর্সের মালিক নরেশ চাকলাদারকে। শীর্ণ পাকানো চেহারা, রস কষ নেই, শরীরে দয়া ধর্ম বলেও কিচ্ছু নেই। নইলে প্রায় নতুন ম্যাচ ক্যারাম বোর্ডের জন্য মাত্র ঐ ন'টাকা দিয়েই হাঁকিয়ে দিল। অথচ ওটাকে পালিশ করে নরুমামা অন্য কোনো খদ্দেরকে নিদেন আশি টাকাতে ঝাড়বে।

হোঁৎকা কাতরস্বরে বলে,—অ মামা।

নরুমামা টাকাগুলো গুনে দিয়ে বলে—আর এক পয়সাও দেব না, ওতেই দিতে হয় তো দাও, নইলে নিয়ে যাও তোমার কাঠের বোঝা।

ক্লাবের সখের ক্যারাম বোর্ডখানাও বেচতে হল শুধুমাত্র দেনা শোধ করে ইজ্জত রক্ষার জন্য, আর ও বলে কিনা কাঠের বোঝা।

জবাব না দিয়ে বের হয়ে এলাম।

পাওনাদার ঝালমুড়িওয়ালা কেবলরাম। ওর দেনা শোধ করতেই হবে, ও দেশে চলে যাচ্ছে। কেবলরাম তার প্রাপ্য সাতটাকা বুঝে নিয়ে চলে গেল। হোঁৎকা বলে,—রইল গিয়া ওনলি টু রুপিস! উঃ! তারপর আছে মালাই বরফওয়ালার দেনা—

ফটিক বলে, ক্লাব থেকে রেজিগনেশন দেব।

হোঁৎকা বলে,—আইসক্রিম ভেলপুরি খাইছস, দেনা কিলিয়ার কইরা যা গিয়া, নয় তরে ছাড়ুম না।

তাড়াতাড়ি থামাই ওদের,—এসব করলে চলবে? ক্লাবে চল—ঠান্ডা মাথায় সেখানে গিয়ে আলোচনা করা যাবে।

হোঁৎকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—ক্লাব? তার চেয়ে ক শ্মশানে চল। ও তো শ্মশানই হইয়া গেছে!

ফটিক নাটক গান নিয়ে থাকে। সে বলে ওঠে অহীন্দ্র চৌধুরীর পোজে—সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে রে! উঃ পটলা কিনা বিটট্রে করল এইভাবে! ঘটি বাটি বন্ধক দিতে হচ্ছে? আর দ্যাখ ও কিনা—

সামনে রাস্তার এমাথা থেকে ওই মাথা অবধি লাল শালুর ব্যানার পড়েছে, সাদা কাপড়ের পট্টি দিয়ে লেখা আছে

'অপূর্ব জাদু প্রদর্শনী—আসুন-দেখুন ধন্য হোন।

জাদুকর প্রফেসার পটল ঘোষ!"

হোঁৎকা বলে,—হালায় ম্যাজিসিয়ান হইছে! হবি হ' আমাগোর ডুবাইবি ক্যান?

পটলা আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের সেক্রেটারি কাম ক্যাশিয়ার কাম ফাইনান্সার। অর্থাৎ

এক কথায় কামধেনুই বলা যায়। বাড়ির অবস্থা বেশ ভালোই। বাবা-কাকাদের কয়েকটা চালু কারখানা, আর আছে ঠাক্‌মা, বুড়িকে চাপ দিলেই টাকা বের হয়।

সেই পটলার এখন বাতিক হয়েছে ম্যাজিকের। সে নাকি দ্বিতীয় পি. সি. সরকার হবে আর গুরুও জুটেছে। বুড়ো বসন্তবাবু ইদানীং পটলাকে নিয়ে পড়েছে, তাকে ম্যাজিসিয়ান বানিয়ে দেবে।

পটলাকে দেখেছিলাম কদিন ধরে ওদের বাড়ির একটা ঘরে পর্দা টাঙিয়ে হাত পা নেড়ে তাসের খেলা প্রাকটিস করতে, হাওয়ায় নাকি তাস ধরে ফেলছে ঝপাঝপ্‌। আর শূন্যে খপ করে টাকাও ধরছে।

হোঁৎকা ওই হাওয়ায় টাকা ধরার ব্যাপারটা দেখে বলে—হেই ম্যাজিক খানই সেরা, পটলা, তরে এইবার ক্লাবের প্রেসিডেন বানামু চল্‌।

বুড়ো বসন্ত বলে ওঠে,—যাও দিকি ছোকরা। পটলা আর ওইসব বাজে ব্যাপারে নেই। ম্যাজিক সাধনার বস্তু, সেইটাই করতে দাও।

আমাদের একরকম ভাগিয়ে দিল পটলার গুরু বসন্তবাবু! তারপর থেকে পটলাও আর আসেনি ক্লাবে। দু-তিন দিন পার হয়ে যাবার পরও গেছি ওর সন্ধানে, দেখি পটলা খুবই ব্যস্ত। বসন্ত মজুমদার বলে,—ওকে ডিসটার্ব করবে না! ও এখন হিপনোটিজম শিখছে। মনসংযোগের প্রয়োজন। সামনে ওর শো হবে—এখন ব্যস্ত। অর্থাৎ পটলার আর আমাদের প্রয়োজন নেই।

ক্ষুণ্ণ মনে বের হয়ে আসি। অথচ এই পটলার জন্য পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের কজন সভ্য যা করেছি সে সব ফর্দ দিলে সব মিলিয়ে তা একখান কেন দুতিন খানা গ্রন্থাবলি হয়ে যাবে।

হোঁৎকা বলে দুনিয়াটা বেইমান হইয়া গেল রে? শেষে পটলাও! দুঃখ এদিকে তো হয়েছেই, আর সেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত এবার এসে পড়েছে পাওনাদারের দল। এতকাল ঝালমুড়িওয়ালা, মালাইওয়ালা, ভেলপুরিওয়ালা মায় ন্যাপলা কেবিনের চা টোস্ট ওমলেট-এর বিল সব মিটাত পটলাই। তারাও মিন মিন করত পটলার সামনে।

এখন তারা জেনে গেছে, পটলা এখানে আসে না তাই তারাও এবার বেড়াল থেকে নখদন্ত প্রকাশিত এক একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারে পরিণত হয়েছে।

ওরা মাল তো ছাড়ছেই না,—উল্‌টে তাগাদা দেয়,—বকেয়া পয়সা ফ্যালো।

ন্যাপলা কেবিনের মালিক ন্যাপা মাইতি শাসায়,—জামা খুলে নেবো।

মালাইওয়ালাও বলে গেছে,—কুলপি কর দেঙ্গা!

বিষম বিপদেই পড়েছি আমরা। ক্লাবের ব্যান্ড একটা বেচে ওদের দেনা কিছু শোধ করেছি, আজ ম্যাচ বোর্ড ন'টাকায় বেচে দেনামুক্ত হয়ে মাত্র ক্লাব ফান্ডে দু'টাকা সম্বল করে শোকে মুহ্যমান হয়ে ক্লাবের চাটাইয়ে এসে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছি।

সামনে ফুটবল খেলা, কোনো প্লেয়ারই আসবে না মাংস রুটি কলা না পেলে।

হোঁৎকা কি ভাবছে। আমি জানাই,—ক্লাব তুলে দে।

ফটিক সাড়া দেয় না। গোবরা বলে,—তাই কর। মামার আড়তে বসে কুমড়োই বেচব।

হোঁৎকা বলে তার আগে পটলার ম্যাজিকই ভ্যানিশ করুম, হালায় কত গুল দিছে রে?

লাল হ্যান্ডবিলে পটলার ম্যাজিকের কেরামতির ফর্দ দেওয়া হয়েছে। বাক্সের মধ্যে

বইঘর.কম

একজনকে বন্দি করে রাখবে কিন্তু তাকে দেখা যাবে দর্শকদের মধ্যে। আবার বাক্সে বন্দি হয়েই দেখা যাবে তখুনি তাকেই।

গোবরা বলে, চল দেখেই আসি ম্যাজিক!

—আমাদের সর্বনাশ হল ওই ম্যাজিকের জন্যে! আবার তাই দেখতে যাবি পয়সা খরচ করে?

গোবরা বলে,—মামার আড়তের দুখান কুমড়ো সরিয়েছি, ওতেই হবে। আর পটলাকে জব্দ করতে হলে ওখানেই যেতে হবে।

পটলাকে মদত দিচ্ছে কুলেপাড়া ক্লাব। পটলাকে তারা নাকি এবার সেক্রেটারি বানাবে। তারাই স্কুলের ছুটিতে হলটা বলে কয়ে ম্যানেজ করে সেখানে পটলার ম্যাজিক শো করাচ্ছে, আমদানিও হবে তাদের। পটলা নেচে কুঁদেই খালাস।

হল ভর্তি লোকজনের সামনে পটলা ম্যাজিক দেখাবে কি, ম্যাজিক দেখাচ্ছে তো ঐ সিড়িঙ্গে বসন্ত মজুমদার। পটলা জরির পোশাক পরে মাথায় পালকের নীচে ইয়া কাচ সেটা করা পাগড়ি একটা পরে কেবল হাত পা নাড়ছে। কারণ কথা বলতে গেলেই ওর বিপদ। ওর জিবটা আলটাকরায় আটকে যায়। ব্রেক ফেল করে।

তাই ইংরাজিতে 'লেডিজ এ্যান্ড জেন্টেলম্যান' বলার পরই খেই ধরে বসন্ত মজুমদার।

দুচারটে খেলাও দেখাচ্ছে। এরপর পটলার খেলা—ম্যাজিক বক্স। তাতে হাত পা বেঁধে একটা ছেলেকে পুরে দিলে পটলা, হাতের জাদুদণ্ড নেড়ে চেড়ে কি মন্তর বলে সিন্দুক বন্ধ করে তালা এঁটে পর্দা টেনে দিল। তারপরই দেখা যায়, সেই ছেলেটাই পরনে সেই গেরুয়া পাঞ্জাবি পায়জামা পরে দর্শকদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছে, ফোকাস পড়ে তার উপর। আর এহেন তাজ্জব ঘটনা দেখে চড় চড় হাততালি পড়ে, সিটি বাজে, ছেলেটা চলে যায়, ছেলেটা দেখা যায় বাক্সের মধ্য থেকে সেই আবার বের হচ্ছে।

তাজ্জব ব্যাপার। পটলা মাথা নিচু করে তার এই বিরাট যোগসাধনার কৃতিত্বের ফসল কুড়োচ্ছে হাততালি আর সিটির মধ্যে।

খেলা শেষ, বের হয়ে আসছি। পটলা আমাদের দেখেও যেন দেখেনি ভাব দেখায়।

খেদোক্তি করি,—পটলাটা আজ চিনতেই পারল না?

ফটিক বলে,—বড় হলে, নাম করলে তাই হয় রে।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে,—ওর থিকা আমিই বড় ম্যাজিসিয়ান। কালই তরে ম্যাজিক দেখামু। গোবরা কুমড়া বিক্রির পাঁচ টাকা দে। অ্যাডভান্স—সব শোধ কইরা দিমু।

গোবরা টাকাটা দিয়ে বলে,—আর নাই—নট এ সিঙ্গিল ফার্দিং।

হোঁৎকা বলে—লাগবো না কাল ম্যাজিক দেখতে আইবি। হক্কলেরে কইয়া দে।

—তুই! তুই আসবি না?

হোঁৎকা বলে,—না। কাল কাম আছে। জরুরি কাম—ম্যাজিকের পরই আমারে ক্লাবেই পাইবি।

হোঁৎকা টাকা নিয়ে চলে গেল।

গোবরা বলে,—ব্যাটা বাঙাল সটকান দিল নাকি রে?

—কে জানে? ওর ব্যাপার বুঝছি না!

ফটিক নাটকীয়ভাবে বলে,—একে একে নিভিছে দেউটি।

পটলার ম্যাজিক শোর কথা এর মধ্যে পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এক টাকায় এত কাণ্ড—হই চই দেখার লোকের অভাব হয়নি। আজ একেবারে হাউসফুল, গমগম করছে স্কুলের হল।

আজ বিশেষ শো। পটলার আমন্ত্রণে হেডমাস্টার মশাই, সব শিক্ষকরা, মায় কাউন্সিলার হলধরবাবু, কেবলরাম, করাতকলওয়ালা, পটলার কাকারা মায় বুড়ি ঠাক্‌মা অবধি এসেছে।

দেখি দূর থেকে তারা ওপাশের ঘরে সেই রাজপুত্তুর সাজা পটলার সঙ্গে কথা বলছে, ফোটোগ্রাফার ফোটো তুলছে ঝকঝকে আলো জ্বেলে।

হলের এক কোণে বসে আছি। পটলা তার সঙ্গে বসন্তবাবুর খেলা শুরু করেছে।

ওদিকে গ্রিন রুম, তারপরই স্কুলের বাগান—পেছনে পাঁচিল অবশ্য আছে, কিন্তু ছেলেরা সহজে গেট এড়িয়ে স্কুল থেকে পালাবার জন্য পাঁচিলের দু'এক জায়গায় ফোঁকর করে রেখেছে।

মাইকে এবার ঘোষিত হয়, 'পটলচন্দ্র দেখাবেন তাঁর বিশ্বনন্দিত খেলা—ম্যাজিক বক্স! কঠিন সম্মোহনের খেলা, দর্শকরা যেন গোলমাল না করে মন দিয়ে দেখেন।'

মিউজিক শুরু হয়েছে, স্টেজে বাক্সের মধ্যে বন্দি করে ছেলেটাকে ঢোকানো হচ্ছে, স্বয়ং হেডস্যারই গেছেন বাক্স তালা ঠিক আছে কিনা দেখতে। এবার ছেলেটাকে সিন্দুকে ঢুকিয়ে তালা দেওয়া হল, পর্দা টাঙানো হল।

হল নীরব, ছুঁচ পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। পটলার কণ্ঠস্বর শোনা যায়,—এবার দেখবেন ওই বাক্সবন্দি ছেলেটিকেই দর্শকদের স-সামনে—ওয়ান, টু—থ্রি!

মঞ্চের একপাশে ছেলেটার দাঁড়াবার জায়গা নির্দিষ্ট আছে, কালও দেখেছে সবাই, আজও সেখানে ঝপ করে ফ্লাডলাইট জ্বলে ওঠে, কিন্তু চমকে ওঠে পটলা! জায়গাটা শূন্য—গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা ছেলেটা সেখানে নেই, কেউ নেই! শূন্যস্থানে আলোটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মত পড়েছে।

স্তব্ধ হল—পটলাও ঘামছে। কেউ নেই—ছেলেটাকেও দেখা যায় না।

এবার কে গর্জে ওঠে,—ম্যাজিক না ফ্যাজিক। গুল মারছিস পটলা?

কে চিৎকার করে ওঠে,—আরশোলা আবার পাখি, পটলা আবার ম্যাজিসিয়ান! ইল্লি—ওঠ্‌রে!

পটলার পা দুটো সেঁটে গেছে মঞ্চে! বসন্ত ঘামছে। এ কী হল?

মিউজিক থেমে গেছে। শব্দ ওঠে মড়মড়-মড়াং। চেয়ার ভাঙল একটা—দুখানা। দর্শকরা হইহই করে চলে। তুমুল হট্টগোল।

তারপরই শূন্যে ধেয়ে আসে মঞ্চের উপরে একখানা চেয়ারের পিঠ ভাঙা, পটলার কপালেই সপাটে লেগেছে, ছিটকে পড়ে সে। বসন্ত মজুমদার চিঁচিঁ করছে,—ড্রপ! ড্রপসিন ফেলে দাও। তারপরই হলে সে কী ভয়ানক কাণ্ড, চেয়ার টেয়ার ভেঙে একসা।

ফটিক বলে,—কেটে পড় এখান থেকে।

ক্লাবের ঘরের দিকেই চলেছি। এ সময় ওদিকটা নির্জনই থাকে। একটু বসে জিরানো যাবে।

ক্লাবের ঘরে দেখি, বসে আছে হোঁৎকা। আর একটা ছেলে নিবিষ্ট মনে মোগলাই পরটা খাচ্ছে।

হোঁৎকাই খাওয়াচ্ছে ওকে,—খা কোনো ভয় নাই। একটু পরেই তোর বাড়ি পৌঁছাইয়া দিমু। আরও দুখানা মোগলাই দিমু তরে। অ্যাই দ্যাখ।

ছেলেটা আধখানা মোগলাই সাবাড় করে ওগুলোর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে,—দেবে তো?

—হ্যাঁ! দিমু। হোঁৎকা আমাদের ঢুকতে দেখে বলে!

কি রে ম্যাজিক কেমন দেখলি? স্রেফ গুলবাজি—হলে তো চেয়ার ভাঙাভাঙি হল, পুলিশ এসেছে।

আমি দেখছি এই ছেলেটাকে। গোগ্রাসে পরোটা খাচ্ছে। এর পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি, পায়জামা, পোশাকটা এর পক্ষে বেমানানই। আরে! এমনি একটা ছেলেকেই তো স্টেজে পটলা বন্দি করে তার ম্যাজিক বাক্সে পুরছিল। সেই ছেলেটা কি?

শুধোই,—একে কোথায় পেলি। একেই তো দেখলাম পটলা বাক্সে বন্দি করল—

হোঁৎকা বলে,—এ্যাই তর বুদ্ধি! এই বুদ্ধি লই স্কুলে ফাস্ট হোস? এডা কেন হইব! এডা তো মনা—

ছেলেটা বলে ওঠে,—হি গো। আমার নাম মনা, আর বাক্সে পোরে আমার দাদা ধনাকে। ও থাকে বাক্সে আর আমি থাকি বাইরে। আটআনা পয়সা দিলেই আমি গে এসটেজে দাঁড়াই, ধনা তো তখন বাক্সে পোরা। আমাকেই দেখে—যমজ কি না। দেখতে একইরকম। তাই বাবু একটাকা দিয়ে নিয়ে এল, ডিম পরোটা খেতে দিল, পালিয়ে এলাম। মরুক গে ধনা বাক্সে ঢুকে।

—এ্যাঁ। এই বলে হিপনোটিজম-এর ম্যাজিক!

হোঁৎকা বলে,—বুঝছিস! আমি কালই বুইঝা গেছি, ওই যমজ ছোঁড়া দুইটারেই চিনি। তাই পটলার ম্যাজিকের বারোটা বাজাইবার জন্য একডারে লইয়া আসছি গ্রিনরুম থনে। এহন বোঝ মজা!

পরদিন সকালে গিয়ে দেখি, সাংঘাতিক কাণ্ডই ঘটেছে।

চেয়ার ভাঙার ঘায়ে পটলার কপালে আব গজিয়েছে, নেহাৎ পাগড়ি ছিল তাই রক্ষে, কপাল ফাটেনি।

আমাদের ঢুকতে দেখে তার ঠাক্‌মা বলে ওঠে,—তোরা এসেছিস? পটলাকে দ্যাখ ভাই, কী যে হয় ওর মাঝে মাঝে। মাথায় ভূত চাপে। ভূতটাকে ছাড়াতে পারিস না তোরা?

পটলা আজ আমাদের দেখে লেংচে লেংচে এগিয়ে আসে। মুখে করুণ হাসি হেসে বলে,—আয়। ওসব ভক্কিবাজিতে আর নাই রে। ক্লাবে চল।

হোঁৎকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—ক্লাব তুইলা দেব রে! দেনার দায়ে ক্যারাম বোর্ড, ব্যান্ড সব বেচছি, আর ওসবে নাই।

ঠাক্‌মা বলে, সেকি রে! ওসব আবার নতুন করে কেন। আমি ব্যবস্থা করছি। আর শোন অনেকদিন আসিসনি, আজ প্রসাদ না খেয়ে কেউ যাবি না।

দীপক রাগ ও ফটিকচন্দর

ফটিক কদিন আড্ডায় নেই। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের আড্ডায় আমি, হোঁৎকা, পটলা, কানাই ঠিকই বহাল আছি। ফটিক কদিন ওর মামার ওখানে নিউ কর্ড লাইনে কোনো গ্রামে গেছে। সেখানে মামার পুকুরের তাজা মাছ, ক্ষেতের তরিতরকারি, ঘরের গরুর দুধ খেয়ে বেশ তাগদ বাড়িয়ে আসবে। সেই গ্রামে নাকি কোনো তাবড় কালোয়াতি গাইয়ে থাকেন। তাঁর তানের চোটে তানপুরার তার পড়াং করে ছিঁড়ে যায়, আর সুরে নাকি আগুন জ্বলে, ফুল ফুটে ওঠে। ফটিক তাই গেছে। ত্যামন দেখলে তার চ্যালা হয়ে পড়ে থাকবে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণে।

কানাই বলে—ব্যাটা ফটকে না ফট হয়ে যায়। এদিকে কুলেপাড়ার আজ বিজয়া-সম্মিলনীর ফাংশন গান-বাজনা হবে। ফটিককেও গাইবার জন্য বলতে এসেছিল—ক'বার খুঁজে গেছে।

হোঁৎকা নড়েচড়ে বসে। শুধোয় সে,—তা মাগ্‌না ফাংশন না লিভার ফাংশনও কিছু থাকবো? কানাই খবর এনেছে, বলে সে—বিশ কেজি মাংস, লুচি, আলুর দম আর শুনলাম রাজভোগ থাকবে, আর্টিস্টদের জন্যেও এসপেশাল ব্যবস্থা আছে।

হোঁৎকা ফুঁসে ওঠে—বুঝছস শিয়ালের বিষ্ঠায় কাম হয়, তা শিয়াল জানতি পারলি পর্বতে গিয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করবো, পাছে মানুষের কোনো কামে লাগে। হালার ফটিকও হইছে তায়। আজ থাকলি—দু'একখান তা-না-না করলি, তগোর গেস্ট হইয়া আমাগোর মাংস লুচি রাজভোগ জুটত, তা কে শোনে তার কথা।

পরক্ষণেই দম নিয়ে হোঁৎকা বলে,

—পটলা, দে দিন অষ্ট আনা, ঝালমুড়ি লইয়া আসুক আমার লগে, ক্ষুধা পাইছে।

হোঁৎকার ঘন ঘন ক্ষুধা পায়। বিশাল দেহ তার, ক্ষিদেও তেমনি বিকট।

পটলা একা ওকেই বা খাওয়াবে কি করে, তাই একটা টাকাই বের করে বলে—যা কানাই গবুর দোকান থেকে ঝালমুড়িই আন।

হোঁৎকা ফুঁসছে—মামার বাড়ি তা কতদূর! আইতে পারস না? আমি হালায় সেবার তগোর ফুটবল ফাইনালে ডানকুনি থনে আইলাম—

হঠাৎ দেখা যায় ফটিকচন্দ্রকে। সাইকেল রিক্সায় চেপে আসছে—পরনে কল্কাদার বাহারের কাজ করা গুরু পাঞ্জাবি, বাহারি ধুতি।

—এ্যাই যে! কানাই চিৎকার করে—তোকে কুলেপাড়া ক্লাব হন্যে হয়ে খুঁজছে, তুই মামার বাড়ির আদর খেতে গেলি এই সময় ফাংশন ফেলে?

ফটিক বলে—শ-শুনেই চলে এলাম। গা-গাইছি ওদের ফাংশানে। জ-জ—

ফটিকের ওই রোগ। জিবটা মাঝে মাঝে নিদারুণভাবে ব্যাক গিয়ার মেরে 'বিট্রে' করে বসে। হোঁৎকা বলে,—

—তা এত দেরি হইল ক্যান? বৈকাল চারডা বাজে, সন্ধ্যায় ওগোর ফাংশন।

ফটিক ততক্ষণে জিবের জড়তা মুক্ত হয়ে বলে,—

—নতুন ওস্তাদজি বললেন—গা-গান খান্ তুলে নে যা। সেইখানেই গাইব। দী-দীপক রাগ—

হোঁৎকার কাছে ওসব রাগ-রাগিণীর কোনো গুরুত্ব নাই। সে বোঝে ভোজনপর্ব।

হোঁৎকা বলে—থো ফ্যাইলাই তর দীপক ফিপক্। গান ভালো হইবো তো! শোনলাম ওগোর খাওয়ানের ব্যবস্থা ভালোই আছে। লুচি ভরপেট, মাংস—রাজভোগটোগ দিবে। তর গেস্ট কইরা লইয়া যাবি।

ফটিক অবাক হয়—তাই নাকি! তা য-যাবি। আটিস্ বইলা কথা। তার গেস্ট! খাতিরই হইবো আ-আলাদা।

আমরাও বলি—তোর গান শুনতে পাব না? কিসব দীপক রাগ গাইবি! ও তো গেয়েছিল তানসেন—

ফটিক গুরু পাঞ্জাবিটা ঠিক করে নিয়ে বলে—

—আমার গুরু ওই কপিলাক্ষ মাসচটক্ও গান, সেই রাগই ত তু-তুলছি কদিন ধরে! দেখবি আ-আগুন জ্বলে যাবে ঠিক গা-গাইতে পারলে।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে।

কুলেপাড়া ক্লাবের মাঠে সাজানো প্যান্ডেলের সামনে লোক ধরে না। ওদিকে টিকিট কাউন্টারে ভিড়ও রয়েছে। মাইকে ঘোষিত হচ্ছে নামিদামি শিল্পীদের নাম। আর নতুন উদীয়মান প্রতিভাও দু'চারটি আছে, তার মধ্যে সগৌরবে ঘোষিত হচ্ছে আমাদের ফটিকচন্দেরও নাম! তিনি দুর্গম হিমালয়ের কোনো সাধু মহারাজের কাছে নিষ্ঠার সঙ্গে আদিকালের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সবে পদার্পণ করেছেন কলকাতার মাটিতে।

গর্বে আমাদের বুক ফুলে ওঠে।

গেটেও ভিড়। দেখি ওদিকে একটা গাড়ি এসে থামল। ব্যাজপরা ভলেনটিয়ারের দল শশব্যস্তে ভিড় হটাতে থাকে। নামছে স্বয়ং ফটিকচন্দ্র, গায়ে আদ্দির কলকাদার পাঞ্জাবি, পায়জামা, পিছনে হোঁৎকা। তার হাতে তানপুরা। হোঁৎকাকে দেখে ঘাবড়ে যাই।

ভলেনটিয়ারের দল ততক্ষণে ফটিকদাকে নিয়ে উধাও।

হোঁৎকা শুধু ইশারা করে গেল।

—কিরে পটলা। হোঁৎকা আবার তানপুরা বাজাবে নাকি? এ্যাঁ!

কানাই থমকে ওঠে থাম তো! তানপুরা বাজাতি সবাই পারে। তার টানলেই হল। তবে গাইবে ফটিক একখান।

আমি তাগাদা দিই—ঢুকবি কি করে? তিন টাকা টিকিটের দাম। পটলা বলে—দ্যাখ না কোথাও ফাঁক-ফোকর ঠিক পাব।

ওদিকেরও গ্রিনরুমের পাশটাই অরক্ষিত। দুচারজন ভলেনটিয়ার এদিক ওদিক রয়েছে। কানাই কোত্থেকে কয়েক খিলি পান কিনে কলাপাতায় মুড়ে সটান ওইদিকের দরজায় ঢুকে যায়। কে শুধোয়—এদিকে কেন?

কানাই পান দেখিয়ে শোনায়—ললিতদার পান কইরে জর্দা আনতে বললে তিনশো বাইশ—

আমাকেই শোনায়। আমি জর্দার মোড়ক দেখিয়ে বলি—এই তো।

কানাই পানটা আমার হাতে ধরিয়ে বলে,

—এ্যাইরে—যদুপতিদার সিগ্রেট আনতে ভুলে গেছি, এটা তুই ভেতরে নিয়ে গিয়ে গ্রিনরুমে ললিতদাকে দিবি। পান না হলে ললিতদার গানের মুড আসে না! আমি যদুপতিদার সিগ্রেট নিয়ে আসছি।

ললিতবাবু আর যদুপতি রায় বাংলার নামি শিল্পী। ওর নাম করতেই আমাকে আর কেউ আটকালো না। পানসমেত ভেতরে ঢুকে সিধে প্যান্ডেলে গিয়ে একটা চেয়ার জুড়ে বসলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কানাই কি ভাবে পটলাকেও ম্যানেজ করে নিয়ে এসে পাশের চেয়ারে জাঁকিয়ে বসল কার নাম করে কে জানে।

পটলা বলে—তা কুলেপাড়া ক্লাব বেশ সেল করেছে রে!

কানাই এসব খবর রাখে। বলে সে গলা নামিয়ে,

—থাম তো! এর অর্ধেকই ঢুকেছে ইশারায় আর ম্যানেজ করে, তার অর্ধেক তো সব ভলেনটিয়ার। বিক্রি হয়েছে অষ্টরম্ভা। ওদের সেক্রেটারি গুপীনাথ তো মাথার চুল ছিঁড়ছে। প্রেসিডেন্ট বিশ্বরূপ দৌড়েছে মদন সাহার কাছে টাকা ধার করতে।

"ভিতরের খবর এমনিই কিছু"—

দু'একজন গাইয়ে গান গাওয়ার পর কে শোনায়—

—গোপেন বাবু, জুনিয়ার কিশোর, দু নম্বর মহম্মদ রফি, তোমাদের হেমন্তদা এসব কোথায় হে? তাদের ছাড়ো—এসব কুচো চিংড়ি হঠাও।

মাইকে ঘোষণা চলছে—নতুন প্রতিভাদের স্বীকৃতি দিন, আমরা সব শিল্পীকেই যথাসময়ে আসরে হাজির করাব। আপনারা ধৈর্য ধরে এঁদের গান শুনুন! এরপর আসরে আসছেন তরুণ মার্গসঙ্গীত সাধক ফটিকচন্দ্র গড়গড়ি। ইনি গাইবেন অধুনালুপ্ত রাগ দীপক! হিমালয়ের দুর্গম গুহায় কোনো সাধুর কাছে তানসেনের এই 'রাগ' তিনি পুনরাবিষ্কার করে এসেছেন বিংশ শতাব্দীতে।

ফটিক-এর সম্বন্ধে এসব গুলতাপ্পি কি করে আবিষ্কার করল এরা ভাবতে পারিনি। কানাই বলে—এসব কি রে! কর্ডলাইনে মামার বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যায়নি। বলে হিমালয়ের গুহায় ছিল ফটকে।

পটলা বলে—চেপে যা!

ওদিকে প্যান্ডেলে চাপা গুঞ্জরণ ওঠে। কে বলে,

—এটা আবার কোনো তানসেনের বাচ্চা রে?

অন্যজন হেঁকে ওঠে—'পহা' দিয়ে টিকিট কেটেছি, ত্যামন হলে হিমালয়ের গুহাতেই রেখে আসব চাঁদুকে বুউলি!

ভলেনটিয়ারের দল শান্তিরক্ষায় ব্যস্ত।

ততক্ষণে আসরে এসে গেছে ফটিকচন্দ্র। পরনে গেরুয়া লম্বা কুর্তা সন্ন্যাসীদের মত! আর মাথায় গেরুয়া রং-এর জম্পেশ পাগড়ি। দেখতে ভালোই লাগে। প্যান্ডেলের কলরব থেমে যায়। মেয়েদের অনেকেই ওকে কোনো স্বামীজি ভেবে নমস্কার করে।

পটলা চাপাস্বরে বলে—ফটকের আবার ঢং ঢাং দেখেছিস! যেন নাটক করতে এসেছে।

কানাই ওকে থামায়! ওদিকে আবার জাঁকিয়ে বসেছে হোঁৎকা—তার মাথায় পাগড়ি গেরুয়া আলখাল্লা। তানপুরা ধরেছে সে। অন্যদিকে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে ফটিকের ভূতপূর্ব গুরু নিশিবাবু। তবলায় বসেছে সিঁটকে মত একজন লোক।

বইঘর.কম

কানাই পটলা আমি এই অবকাশে চেয়ার বদলাতে বদলাতে একেবারে ডায়াসের কাছে এসে গেছি। এদিকে গ্রিনরুমে যাবার সর্টকাট পথ। ওই পথেই পেছনের কচুবনের গা দিয়ে কেউ পান, কেউ তামাক—সিগ্রেট হাতে করে ঢুকেছি।

প্যাণ্ডেল স্তব্ধ। ফটিক-এর গলা এবার খেলছে তা—না—না! তুম—তেরে না না! মা—মা, গা—ধা!

মাথা নাড়ছে লিকলিকে দেহ নিয়ে তবলচি, আর তবলা পিটছে ধুম ধাড়াক্কা। ওদিকে হোঁৎকা পাগড়ি পরা তারকেশ্বরের কুমড়োর মত মাথা নিয়ে বুজে গোব্‌দা গোব্‌দা আঙুল দিয়ে তানপুরার তারগুলোয় টান দিয়ে চলেছে। গাঁ গাঁ ঝন ঝন আওয়াজ ওঠে।

ফটিকও গেরুয়া পরে দুহাত দুই দিকে তুলে মহা উৎসাহে চিৎকার করে চলেছে বিকট স্বরে—

দিয়া জ্বালাও, মনমে আগ লাগাও—

মা—মা—গা—ধা—নি—ধা—রে...

দীপক রাগ শোনাও বিপদের। কোনো বই-এ পড়ে জেনেছি, তানসেন নাকি এই রাগ গাইবার সময় কোনো শাকরেদকে বলেছিলেন আগুন জ্বলে উঠলে সে যেন মেঘমল্লার গাইতে শুরু করে।

তাহলে মেঘ—বৃষ্টি এসে দীপক রাগের আগুনকে নিভিয়ে দেবে। কিন্তু সেই শাকরেদ আর ঠিকমত মেঘমল্লার গাইতে পারেনি।

ভয়ে ভয়ে বলি—কানাই, দীপক রাগে আগুন জ্বলে ওঠে। যদি ঠিক ঠিক গাইতে পারে আগুন জ্বলে উঠবে। তখন মেঘমল্লার না গাইলে তানসেনের মতও সেই আগুনে জ্বলে যাবে রে!

পটলা ধমক দেয়—থাম তো! ও ব্যাটা গাইবে দীপক! কচু গাইবে। কানাই চারিদিকে চেয়ে বলে চাপাস্বরে—কেস গড়বড় সমী!

শ্রোতাদের মধ্যে বেশ গুঞ্জরণ ওঠে। কে হাততালিও দেয়। ওদিকে ফটিক উৎসাহ পেয়ে চোখ বুজে তখন পেল্লায় চিৎকার করছে দ্বিগুণ জোরে—দিয়া জ্বালাও—দি—দি—দি—জ্বা—জ্বা—

চমকে উঠি—এ্যাই রে, ফটিকের ব্রেক ফেল করেছে!

জিবটা সেঁটে গেছে আলটাকরায়। আর পরক্ষণেই প্যাণ্ডেলে হাসির তুবড়ি ফোটে। হোঁৎকাও প্রাণপণে এতক্ষণ তানপুরার চারটে তারকে থাবড়ে আর্তনাদ বের করছিল, হঠাৎ সেই চারটে তারই এবার পড়-পড় করে ছিঁড়ে গেছে। দুঃশাসনের দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের মত ছিন্ন তারগুলো হোঁৎকার হাতের মুঠোয়—তার ছিটকানো তানপুরা তখন ধরাশায়ী।

বিনা তানপুরাতেই ফটিক আর্তনাদ করছে যখন চোখ বুজে—পেল্লায় ভাবে—জ্বা—জ্বা—জ্বা—

হঠাৎ দর্শকদের মধ্য থেকে মড়মড় শব্দ ওঠে, বোধহয় চেয়ার ভাঙল। পরক্ষণেই ভাঙা চেয়ারের বসার জায়গাটা একটা উড়ন্ত পীরিচের মত গিয়ে ফটিকের মাথায়।

লে বে! —ফোট!

চমকে উঠি আমরা। ওদিকে সমূহ বিপদ। নেহাৎ মাথায় ওই জম্পেশ পাগড়ি ছিল তাই রক্ষে না হলে বোধহয় ওই চেয়ারের টুকরোর আঘাতে ফটকে শুয়ে পড়ত টানটান হয়ে।

তার চোখ খুলে গেছে, সামনে তখন মারমুখী জনতা!

BanglaBook.org

কে গর্জে ওঠে—দীপক রাগ গাইছ তানসেনের বাচ্চা? জিবের আড় ভাঙেনি—তোতলা— গর্ধব রাগ গা মাঠে গিয়ে।

অন্যজন মিহি গলায় আওয়াজ দেয়—

হিমালয়ের 'কেভ' এ রিটার্ন টিকিট কাটিয়ে দেব ন্যাপলা। তৎসহ এবার ধেয়ে আসে শূন্যপথে লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপিত শক্তিশেলের মতই চেয়ারের একটা ঠ্যাং! বোঁ বোঁ শব্দে ধেয়ে আসছে, নির্ঘাৎ লাগবে—হোঁৎকাও এবার তারহীন তানপুরার ডাণ্ডা পাকড়ে এদিকের লাউ-এর দিকটা গদার মত করে তুলে ধরে সেই শক্তিশেলকে ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়েছে শীর্ণ তবলাওয়ালা, চুরমার হয়ে যায় মাটির বাঁয়া—আর বাঁয়ার ছাউনিটা ক্ষুদ্র ঢালের মত ধরে অন্য হাতে তবলাটা তুলে ফুড়ুৎ করে সে ডায়াস থেকে ভেগে যেতেই দর্শকবৃন্দ এবার শিকার হাতছাড়া হবার রাগে জ্বলে ওঠে।

কে গর্জন করে—দিয়াই জ্বালাও! লাগা শালাদের—পহা নিয়ে ধাপ্পা দিয়েছে,—হেমন্ত জুনিয়ার কিশোর ছ্যামল দা আসবে? জোচ্চোর শালারা ধাপ্পা দিচ্ছে—বাকি চেয়ারগুলো তখন মড়মড় শব্দে ভাঙছে—

ডায়াসের দিকে তখন ধেয়ে চলেছে কাষ্ঠখণ্ড—লোষ্ট্রখণ্ড। ফটিকের গায়ে মাথায় দু'একটা লেগেছে, হোঁৎকা তখন সেই বিশাল তানপুরাকে গদারূপে ব্যবহার করে চলেছে, কোনমতে ওই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হোঁৎকা লাফ দিয়ে পড়েছে ডায়াস থেকে ফটকেকে নিয়ে। তার হাতে তখন বোঁ বোঁ ঘুরছে দশাসই গদা। গর্জাচ্ছে সে—মাইরা ফেলামু, শ্যাষ করুম তগোর!

আমরাও এগিয়ে আসি। ফটিককে বাঁচাতেই হবে। দেশের ভবিষ্যৎ। প্যাণ্ডেল তখন কলরব—আর্তনাদ উঠছে। কে কাকে রাখে। আর কে কাকে মারে তার ঠিক নেই। হৈ চৈ—লণ্ডভণ্ড কাণ্ড!

আমরা এগিয়ে গিয়ে ফটিকের গেরুয়া আলখাল্লা—পাগড়ির খোলস ছাড়িয়ে দিয়ে দলে ভিড়িয়ে নিয়ে আমরাও চেঁচাচ্ছি—

মারো—মারো শালাদের।

এই অবকাশে পিছনের গ্রিনরুমের গুপ্ত পথে আহত ফটিককে যখন রেসকিউ করে আনলাম তখন দূরে প্যাণ্ডেলে আগুন জ্বলছে। রাতের অন্ধকারে আগুনের শিখা দেখা যায়—ছুটছে দমকলের গাড়ি।

ফটিক হাঁপাচ্ছে। গদাযুদ্ধ থামিয়েছে হোঁৎকা।

বলে সে—হঃ যাই ক! ফটকে দীপক রাগখান ঠিক ঠিক গাইছে। দ্যাখ—আগুনই জ্বলেছে। হালা কুলেপাড়ার ওগো বেইমান। লুচি-মাংস-রাজভোগ কিছুই দিল না! এমন গাওনের পর। পটলা—

অর্থাৎ পটলাকেই যেন তার জন্য খেসারৎ দিতে হবে।

পটলা বলে—এখন বাড়ি যা। কুলেপাড়ার ক্লাব তোদের খুঁজছে। ফটকেকে পেলে ছাড়বে না। গান গাওয়া ঘুচিয়ে দেবে।

ভয়ে ভয়ে ফটিক বলে—ভাবছি কালই মামার ওখানে ফি-ফিরে যাব। হোঁৎকা গর্জে ওঠে—তাই যা। আর কালোয়াতি গান গাইব না—খবরদার।

জানতি পারলি তর টুঁটি টিপ্পা শ্যাষ কইরা দিমু! বোঝছস? উঃ—কি কাণ্ড!

পটলার সুমতি

আমাদের পটলা বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর আবার উসখুসিয়ে উঠেছে। সে মাঝে মাঝেই এমন একটা কাণ্ডকারখানা করে বসে আর হ্যাপা সামলাতে গিয়ে আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের সদস্যদের হয় নাজেহাল অবস্থা। হোঁৎতা তো মাঝে মাঝেই ঘোষণা করে—এই ক্লাবথনে রেজিকনেশনই দিয়া ইলেভেন বুলেটে জয়েন করুম। তরা থাক্ পটলারে লই। আমি আর নাই।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। পটলাকে ছেড়ে, এই পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব ছেড়ে যেতে পারে না। অবশ্য তার কারণও পটলাই। এই অঞ্চলের বনেদি ধনী পরিবার ওরা। বিশাল বাগান-পুকুর সমেত বাড়ি। ওদিকে বড় রাস্তার ধারে একটা বাজারও ওর ঠাকমার নামে। বাবা-কাকাদেরও নানা ব্যবসা, কারখানা রয়েছে। বিরাট কাঠগোলা, আরও কত কী! পটলাই তাঁদের একমাত্র কুল-প্রদীপ। ঠাকমার কাছে নাতিই সব। ঠাকমা নাতির খামখেয়ালিপনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও পটলার সব খেয়াল মেটাতেই দু'হাতে টাকা দেন। আর আমরা হলাম পটলার অতন্দ্র প্রহরী। তাই ঠাকমার সেই স্নেহের অংশীদার হয়েছি। ক্লাবের সব খরচা জোগান ঠাকমা। টিফিনের ব্যবস্থাও ভালো। ঠাকমা বলেন, তোদের ভরসাতেই আমি থাকি রে! পটলাকে তোরাই সামলা।

কিন্তু পটলাকে সামলানোই দায়। কখন যে ওর মাথায় কোনো পোকা নড়ে উঠবে কে জানে!

এবার পটলার খেয়াল হয়েছে সে কিশোরদের নিয়ে একটা সিরিয়াল করবে টিভি চ্যানেলে। ধেড়েদের নিয়েই সবাই ছবি—টিভি সিরিয়াল করে। কিশোরদের কথা কেউ ভাবে না। এবার পটলা বলে, কিশোরদের নিয়েই টিভি সিরিয়াল করব।

হোঁৎকা বলে, ওসব টিভি সিরিয়াল কইর‍্যা কী হইব? ফুটবল টিমকে এবার ভালো কইর‍্যা করতে হবে।

ফটিক আমাদের মধ্যে সঙ্গীতচর্চা করে। এখন সে স্বপ্ন দেখছে টিভিতে মিউজিক ডিরেকটার হবে। তাই ফটিক বলে, ফুটবল টিম তো আছেই! ক্লাব থেকে টিভি সিরিয়াল হবে কিশোরদের। আমরাও পার্ট করব।

পটলা বলে, হোঁৎকার তো বাঙাল ভাষার টান আছে। ভানু বাঁড়ুয্যে নেই। এখন হোঁৎকা যদি বাঙাল ভাষায় কমিক্ করতে পারে, ওর দিন বদলে যাবে। আর সমীর, তুই লিখবি চিত্রনাট্য।

আমি বলি, আমি রচনা লিখতে পারি। তাই বলে চিত্রনাট্য?

পটলা বলে, এস. গুপী তোকে শিখিয়ে দেবে। ফটিক, তুই হবি মিউজিক ডিরেকটার। আর গোবরা—

গোবরা চাইল। ওর মামার হোলসেল কুমড়োর ব্যবসা। সারা বাংলার বহু জায়গা থেকে নানা সাইজের কুমড়ো-চালকুমড়ো আসে ট্রাকবন্দি হয়ে। খালধারে ওদের গুদামে টাল করা থাকে কুমড়ো। গোবর্ধন ওর মামার কুমড়োর ব্যবসা দেখে। পটলা বলে, হিসাব-টিসাব বুঝিস তুই। তুই হবি আমাদের প্রোডাকশন কন্ট্রোলার।

অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব এবার এই অঞ্চলের সব ক্লাবকে টেক্কা দিয়ে টিভি সিরিয়াল করতে চলেছে।

তার মানে পটলার ঘাড়ের পেতনিটা বেশ জাগ্রত হয়ে উঠেছে। আর এই ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা গ্যাসপ্রদানকারী শ্রী গুপীনাথ সরখেল, অর্থাৎ পটলার এস. গুপী। সেই ব্যাটাকেও দেখলাম।

অবশ্য ঠাকমা বলেন, পটলা কোত্থেকে ওই লোকটাকে জুটিয়েছে, ওই গুপীই ওর মাথায় এসব ঢুকিয়েছে। না হলে এ বাড়িতে এসব কেউ করেনি। ওর বাবা-কাকারা তো ব্যবসা করছে।

আমরাও এসব জগতের খবর জানি না। টিভি দেখতে হয় দেখি। তার পিছনে কী করে কী হয় জানি না। তবে ছবি নিয়ে স্বপ্ন একটা আছে সকলের।

ঠাকমা বলেন, এত করে ধরেছে পটলা, ক'দিন তো ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়াও করেনি। শেষে আমিই রাজি হয়েছি টাকা দিতে। তবে কোথায় যায় পটলা, কারা সঙ্গে থাকে, দ্যাখ যাতে কাজটা ঠিকঠাক হয়। তাই আমরাও রাজি হয়েছি। ঠাকমা বললে না করতে পারি না।

পটলা এখন খুবই ব্যস্ত। সেদিন পটলা বলে, তোরা সবাই সন্ধ্যায় আসবি। গুপীদা আসবেন। জরুরি মিটিং আছে।

আমরা সেইমতো পটলার বাড়িতে এসেছি। নীচের গেটের বাঁদিকের বড় ঘরটাকে পটলা এর মধ্যে তার অফিস কাম রিহার্সাল রুম করেছে। চেয়ার-টেবিলও আছে। আর ওদিকের মেঝেতে কার্পেট পাতা। দেওয়ালে বেশ কিছু নামিদামি শিল্পীদের ছবি। উত্তমকুমারের একটা বড় ছবিতে মালা পরানো। পটলা এখন নিজেই হিরো হবার স্বপ্ন দেখছে। তাই দু'বেলাই উত্তমকুমারের ছবিতে মাথা ঠুকছে। বলে, ওঁর আশীর্বাদ থাকলে আমিও বড় অভিনেতা হব।

হোঁৎকা বলে, তুই তো তর গুরুদেবের ছবি পাইছিস। শোন, ভানু বাঁড়ুয্যের একখান ছবিও খাটাইয়া থুইবি। অর আশীর্বাদও আমারে লইতে হইব।

ওদিকে মিটিং-এর আয়োজন চলছে। পটলা এর মধ্যে একটা লম্বা খাতায় গল্পও লিখে ফেলেছে। বলে, দারুণ একটা কিশোর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। একটা কুকুরও চাই। ওটারও বড় রোল আছে।

হোঁৎকা বলে, অর জন্য ভাবিস না। আমাদের কাল্লুরে লই আনুম।

কাল্লু হোঁৎকার বেশ ট্রেনড্ ডগ। জাতে অবশ্য ওটা খাঁটি নেড়ে। ওর বাপ-কাকারা রাসমণি বাজারে মাছের আড়তে থাকে। হোঁৎকা বাচ্চাটাকে বেশ নাদুস-নুদুস দেখে তুলে এনে পুষেছে।

কুকুরের প্রবলেম এত সহজে সমাধান হতে দেখে পটলা খুশি হয়। তবু আমি ভারি চিত্রনাট্যকার। তাই জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁরে, তোর কাল্লু পারবে তো সিরিয়ালে অভিনয় করতে?

বইঘর.কম

হোঁৎকা বলে, পটলা যদি উত্তমকুমার হইতে পারে, আমি যদি ভানু বাঁড়ুয্যে হইতে পারি তাইলে কাল্লুও ঠিক পারব।

গোবরা বলে, তা না হয় হল, কিন্তু তোর গুপীদা কইরে, পটলা? ডিরেকটারই নেই!

হঠাৎ দেখা যায় পটলদের গাড়িটা এসে থামে বাগানের ওদিকে। একটা লম্বা লগার মত লোক কেলো ধুতি-পাঞ্জাবি পরে গাড়ি থেকে নেমে সজোরে গাড়ির দরজা বন্ধ করে আমাদের দেখে হাত নাড়ে—হাই এভরিবডি, গুড ইভনিং। আমি এসে গেছি। কামিং—লম্বা পা ফেলে এগোতে যাবে লোকটা। তারপরই ঘটল কাণ্ডটা। কায়দা করে গাড়ির দরজা সজোরে বন্ধ করেছে আর তখনই ধুতির খানিকটা দরজায় আটকে গেছে। গুপীনাথ স্রেফ আন্ডারপ্যান্ট পরা অবস্থায় লিকলিকে ঠ্যাং বের করে এগিয়ে আসে। ধুতি রয়ে গেছে গাড়িতে। প্রথমে খেয়াল করেনি গুপীনাথ। তারপরই চমকে ওঠে—আমার ধুতি?

কোনোরকমে গাড়ির দরজা খুলে ধুতি বের করে আবার পরতে থাকে আর গজগজ করে, এর জন্যই বিলেতে থাকতে ধুতি ত্যাগ করেছি। এখানে এসে এইসব ডেঞ্জারাস পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে! রাবিশ! ধুতির বাপ-বাপান্ত করে ফিরে এল গুপীনাথ।

এর মধ্যে পটলা খাতাখানা এগিয়ে দেয়। গুপীনাথ বলে, কী, হিসটোরি লেখা হয়েছে? হিসটোরিই হচ্ছে ছবির লাইফ। বুঝলে? 'ফোর ইডিয়ট' ছবি আমার লাইফ নিয়ে।

আমি ওই হিসটোরি শুনে বলি, গল্প মানে স্টোরির কথা বলছেন? গুপীনাথ খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলে, ওই হল আর কি। আমাকে যেন পাত্তাই দিতে চায় না। পড়ার ভান করে সে। তারপর খানিক পাতা উলটে বলে, হুঁ! হয়েছে। তবে একটু ফাইট বাড়াতে হবে। ফুল অ্যাকশন। ভয় নেই। আমি ওইসব ফিট করে দেব। কত হিসটোরি ফিট করে দিয়েছি বোম্বাই-এ। অমিতাভ, মানে তোমাদের ওই অমিতাভ বচ্চন তো আমাকে ফ্লোরে দেখলে সায়লেন্ট হয়ে যায়। আর আমীর খান বলত—আমার ইসকিরিপট্—

আমি বাধা দিয়ে বলি, চিত্রনাট্য! ওর চিত্রনাট্য?

গুপীনাথ বলে, ওর লাগান, তারে জমিন—এসব ছবির হিসটোরি আমিই ফিট করে দিয়েছি। পটলা চেপে ধরল, তাই মুম্বাই থেকে ফ্লাইটে চলে এলাম ওর কাজ করে দেবার জন্য!

পটলা বলে, এ সমীর। এই-ই আমাদের চিত্রনাট্য লিখবে।

গুপীদা আমাকে আপাদমস্তক দেখে যেন দয়া পরম ধর্ম হয়েই বলে, তুমি লিখবে? ও কে! ভয় নেই, আমিই সব লাইন আপ্ করে দেব।

এর মধ্যে ফটিক সিরিয়ালের জন্য টাইটেল সঙ লিখতে শুরু করে দিয়েছে। সে ক্লাব থেকে হারমোনিয়ামও এনেছে। গুপীবাবুকে গানটা শোনানো হবে। গুপীবাবুই আপাতত অল ইন অল। তাই ওকে চটানো যাবে না। ওর স্বীকৃতি আগে দরকার। ফটিক গান শুরু করেছে। বেশ ইনিয়ে বিনিয়ে চাঁদ-ফুল-পাখি-দক্ষিণা বাতাস এরকম বেশ কিছু উপমা-টুপমা দিয়ে গানটাকে বানিয়েছে। গুপীদা গানটা শুনে বলে, মোটামুটি ঠিকই আছে, তবে সুরটা একটু তুলতে হবে। ওসব আমি তুলে দেব। তোমাদের ওই যে রহমান, ওই যে এখন মুম্বাইতে সুর চুরি করে মিউজিক করছে—

পটলা বলে, এ. আর. রহমান?

হ্যাঁ-হ্যাঁ। পুরো নামটা মনে থাকে না। ওকে আমি রহমান বলেই ডাকি। ও সুর করে প্রথমেই আমাকে শোনাত। আমি ওর কত সুর ঠিক করে দিয়েছি।

ফটিক বলে, রহমান সাহেবকে চেনেন তাহলে?

গুপীদা বলে, চিনব না? ওদের সারে গা মা শেখালাম আর চিনব না? দেখা হলে ও আজও সেলাম করে।

আমরা অবাক হয়ে দেখছি ওকে। পটলা বলে, টিভি কোম্পানি আপনার নাম শুনে বলে, ওকে সিরিয়ালটা বানাতে বলো। আমরা চালাব।

এর মধ্যে হোঁৎকা-গোবরা দুজনে এলাকার নামি রেস্তোরাঁ থেকে পটলার টাকায় ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন, চিকেন মাঞ্চুরিয়ান এনেছে। পটলা এসব ব্যাপারে ভালো টাকা খরচা করে। হোঁৎকা এমনিতে ভোজনরসিক। ও বাকি কাজটা করে। ওদের সঙ্গে মাংসের গন্ধ পেয়ে হোঁৎকার সেই কাল্লুও ল্যাজ নাড়তে নাড়তে এসে হাজির হয়েছে।

পটলার বাবা-কাকারা গোঁড়া বৈষ্ণব। তাঁদের বাড়িতে মাছটা চলে কোনোমতে। তাঁদের বাড়ির সঙ্গেই রয়েছে বড় মন্দির। পটলার বাবা বেশ সাত্ত্বিক ধরনের লোক। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। গলায় কণ্ঠি। কপালে তিলকও কাটেন। ওঁদের গুরুদেব এলে বাড়িতে নামকীর্তন হয়। তখন মাছও বন্ধ। পটলা অবশ্য বাইরে মুরগি-মাংস চালায়। তাই নিয়ে অশান্তিও হয়। বাবা বলেন, সাত্ত্বিক আহার করবি। তিন বেলা নামজপ করবি। এবার গুরুদেবকে বলে তোকে দীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করব।

পটলার কাছে বাড়ির এই পরিবেশ, গুরুদেব, তার দীক্ষা, নানান অসুবিধা। তবু মানিয়ে নেয়। কিন্তু হবিষ্যি খেয়ে থাকতে পারবে না সে। ঠাকমাই বলেন, এই তো ওর বাড়ন্ত বয়েস, এখন থেকে দীক্ষা নিয়ে কী হবে? আরও কিছুদিন যেতে দে। ঠাকমাই যেন পটলাকে ওই কঠিন নির্মম গুরুদেবের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সে তাই সিরিয়াল করার স্বপ্ন দেখছে গুপীনাথকে নিয়ে।

গুপীনাথ বলে, পটলা, তোর সিরিয়ালের শুটিং শুরু করতে হবে। এই কাজটা শেষ করেই আমাকে মুম্বাই যেতে হবে। ওদিকে যশ ফোন করছে। ওর ছবির চিত্রনাট্যটা দেখে দিতে হবে। ডিরেকটার নিয়ে পরামর্শ করতে চায়।

পটলা বলে, যশ?

আরে যশ, যশ চোপড়া! ও তো সব ছবি শুরু করার আগে আমার থেকে অ্যাডভান্স নেয়।

আমি বলি, অ্যাডভান্স না, অ্যাডভাইস?

ওই হল। ও আমার কনসাল ছাড়া কাজই করে না।

আমি শুধরে দেবার চেষ্টা করি—কনসাল্ট।

গুপী চিকেন মাঞ্চুরিয়ান চিবোতে চিবোতে বলে, আরে বাবা, পুরো ইংরাজি বলতে সময় লাগে। তাই শর্ট করে নিতে হয়। এটা এখানকার এসটাইল। তোমরা বুঝবে না।

তারপরই গুপীদা অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বলে, না, ফ্রায়েড রাইসটা মন্দ করেনি। তবে বিরিয়ানি খেয়েছিলাম হায়দ্রাবাদে নিজামের পার্টিতে।

কলকাতাতেও নিজাম রেস্তোরাঁ আছে। গোবরা বলে।

গুপী বলে, সে নিজাম নামেই। আমি বলছি আমার জিগরদোস্ত খোদ হায়দ্রাবাদের নিজাম উল্ মহম্মদের কথা। সে বিরিয়ানি তোমরা চোখেই দেখোনি। এক চামচ খেলে দিল খুশ!

আমি বলি, তাহলে কালই চিত্রনাট্যটা শুনে নিন। শুটিং যদি শুরু করেন।

বইঘর.কম

পটলাও চায় তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে। বলে সে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালই বসা যাক। নিন গুপীদা, চিলি চিকেনটা টেস্ট করুন।

গুপীনাথ গব গব করে খাচ্ছে। ওই লগার মত দেহে এত সব মাল কোথায় যাচ্ছে কে জানে! পটলাও খুশি। খাওয়ার পর গুপীদা বলে, পটলা, কালই ক্যামেরাম্যান আর অন্যদের বুক করতে হবে। আর সেট হবে তোমাদের বাগানেই। অন্য জায়গায় গেলে দু'হাজার টাকা ভাড়া নেবে।

হোঁৎকা বলে, হই ভালো, পটলা! এহানে বেশ মন দিয়া কাজ করা যাইব।

গুপীনাথ বলে, গুড! তাহলে হাজার দশেক টাকা দাও। ওদের অ্যাডভান্স করে দিই। সব টেকনিশিয়ানদের এখন থেকে বুক না করলে পাওয়া যাবে না।

পটলার ঠাকমার মত জোগানদার থাকতে টাকার অভাব নেই। গুপীনাথ দুটো নোটের বাণ্ডিল পকেটে পুরে ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন মাঞ্চুরিয়ানের ঢেকুর তুলে যাবার আগে বলে গেল, কালই চিত্রনাট্য ফাইনাল করে দেব। ব্যস, কাজ শুরু হয়ে যাবে।

আমরাও স্বপ্ন দেখছি এবার আমরা এক-একজন উত্তমকুমার, ভানু বাঁড়ুয্যে, এ. আর. রহমান হয়ে যাব। আমি তো ভাবছি এবার থেকে চিত্রনাট্যই লিখব।

কিন্তু পরদিনই ঝামেলাটা বেধে যায়। কাল রাতে গুপীনাথ এস্তার খেয়েছে। আমরা তার প্রসাদ কিছু পেয়েছি। আর মুরগির হাড়গুলো প্যাক করে বাগানে ফেলেছি। রাতের অন্ধকারে হোঁৎকার কাল্লু সেগুলো তুলে নিয়ে মন্দির চাতালে বসে চিবিয়েছে আর যত্রতত্র ছড়িয়েছে। পরদিন সকালে পটলার বাবা স্নান সেরে মন্দিরে ঢুকতে গিয়েই দেখেন চারিদিকে হাড় ছড়ানো। বোধহয় মাড়িয়েও ফেলেছিলেন কিছুটা। শীতের দিন। একবার স্নান করেছেন। আবার স্নান করতে হবে। আর মন্দিরের চাতালে যত্রতত্র ছড়ানো ওই সব নিষিদ্ধ বস্তু। বাবার হাঁকডাকে দারোয়ান-পুরুতঠাকুর-কাকাবাবু সকলেই ছুটে এসেছে। ওদের কাছেই শুনেছেন তিনি কাল রাতে পটলার ওই ছবি-করিয়ের দল এসব করেছে। শুনে পটলার বাবা গর্জে ওঠেন, ডাক পটলাকে! ছবি করাচ্ছি ওর!

পটলা তখন স্বপ্ন দেখছে তার ছবি চলছে টিভিতে। সারা এলাকায় তার নাম নিয়ে ফাটাফাটি। এবার সে সিনেমার হিরোই হবে। উত্তমকুমার যেন তাকে আশীর্বাদ করছেন। হঠাৎ কাকার ডাকে ঘুম ভাঙে। ধড়মড় করে ওঠে পটলা। ওদিক থেকে বাবার গর্জন ভেসে আসে, ডাক পটলাকে! হিরো হওয়াচ্ছি ওর। এইসব অনাচার আমি সইব না। গুরুদেবকে খবর দে, এ বাড়িতে আসুন ওকে দীক্ষা দেবার জন্য। কিংবা নিয়ে যান আশ্রমে। তিনমাস ব্রহ্মচর্য পালন করে শুদ্ধ হয়ে আসুক দীক্ষা নিয়ে। ডাক পটলাকে—

পটলাও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। তবে কাকুর কাছে শোনে, ওরা নাকি কাল মন্দিরে বসে মাংস খেয়েছে। পটলা বলে, না কাকাবাবু!

কাকাবাবু বলেন, ওসব জানি না। দাদা ডাকছে চল। গুরুদেবকে খবর দেবে বলেছে।

এমন সময় এসে পড়েন বিপদতারিণী ঠাকমা। পটলা বলে, বাঁচাও ঠাকমা—।

শেষ অবধি ঠাকমাই সেই যাত্রা রক্ষা করেন পটলাকে। ঠাকমা বলেন পটলার বাবাকে, নির্ঘাত বাইরে থেকে কুকুর-বিড়ালে এসব এখানে এনে ফেলেছে। পটলা কী করবে? খামোখাই তুই ওকে দোষ দিচ্ছিস। দারোয়ানদের বল রাতে না ঘুমিয়ে যেন কুকুর-বেড়াল

Boighar & MAH

তাড়ায়। শুধু শুধু ছেলেটাকে দোষ দিচ্ছিস। ঠাকমা নিজেই দারোয়ানদের শাসান—কী করিস তোরা? রাতের বেলায় যত রাস্তার কুকুর-বিড়াল এসে জোটে।

কোনোরকমে ব্যাপারটা চাপা পড়ে। ঠাকমা বলেন, তোরা ব্যবসা-বাণিজ্য করিস। মা লক্ষ্মীর দয়া আছে তোদের উপর। ছেলেটা মা সরস্বতীর পূজা করে তাতেও আপত্তি? ছবি করাও তো একটা ব্যবসা।

কাকাবাবু বলেন, তা সত্যি! আমার পরিচিত মদনজি তো ছবির ব্যবসা করে কোটিপতি হয়েছে।

ঠাকমা বলেন, শোন শরৎ। পটলা ঠিক কাজই করছে। এ ব্যবসাতে নাম-যশ-টাকা সবই আছে। দেশজোড়া নাম হয়, টাকাও।

পটলার বাবা চুপ করে যান। ঠাকমা ততক্ষণে লোক লাগিয়ে মন্দির সাফসুতরো করে গঙ্গাজল দিয়ে ধুইয়েছেন। ব্যাপারটা তখনকার মত চাপা পড়ে। পটলাও ঠাকমার সাপোর্ট পেয়ে নতুন উদ্যমে নেমে পড়ে।

সেদিন সন্ধ্যায় পটলা আমাদের সব কথা বলতে আমরাও বুঝি কোনো কুকুরই এ কাজ করেছে। আসলে এসব যে কাল্লুর কাজ তা ভাবিনি। কারণ কাল্লু এখন নেড়ি কুত্তা হলেও টিভি এসটার। সিনেমার পর্দায় তাকে দেখাবে। সে এসব কাজ করতেই পারে না। তবুও আমরা আজ হাড়-গোড় সব প্যাকেটবন্দি করে বাইরের ড্রেনে ফেলে দিয়ে আসি। আজ চিত্রনাট্য পড়া হয়ে গেছে। গুপীদা বলে, কিছু ফাইট ফিট করে দেব। আর কিছু গরম গরম ডায়ালগ—ব্যস। ওই যে মারব এখানে লাশ পড়বে শ্মশানে টাইপের। পাবলিক খুব খাবে। ভাবিস না পটলা, হাজার দশেক টাকা ছাড়—দেখবি ডায়ালগের তুফান বয়ে যাবে।

পটলা বলে, প্রতি সিনে যেন কেলাপ আসে গুপীদা, টাকা তুমি পাবে। আমার কথার হবে না খেলাপ। চাই প্রতি সিনে কেলাপ।

গুপীদা হাততালি দিয়ে বলে, শাবাশ পটলা! তোমার হবে। এর সঙ্গে দেব অ্যাকশন—তোমার হবে অ্যাকটর থেকে প্রমোশন। তোমার বিজয়রথ চলবে শনশন। তবে ওই দশ হাজার চাই ডোনেশন। হোঁৎকা, তুমিও তৈরি হও—অ্যাকশন। যা ফাইট কম্পোজ করব। হিরো আর তোমার—

ফটিক বলে, তা ভালো। আমি যা ব্যাকগ্রাউন্ড কম্পোজ করব, একেবারে ফাটাফাটি।

রিহার্সাল শুরু হল। আমরা সবাই যেন এক-একজন স্টার হয়ে গেছি। ওদিকে গুপীদা তখন পটলাকে দোহন করছে। সিরিয়াল শুরু হবার আগে তার বাজারও রেডি করছে গুপীদা। বলে সে, টিভিতে এ সিরিয়াল চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রাবণের বৃষ্টির মত টাকা আসবে, পটল। দু-তিনটে ছবির কাজ আমিই তোকে দিয়ে দেব। হিরোর রোল।

হোঁৎকা বলে, ভিলেনের রোলে আমার চান্স হইব না?

গুপীদা বলে, দেখছি। নাও শুরু করো। ওদিকে মুম্বাই থেকে অক্ষয়কুমার ফোন করেছিল। বলেছি দশদিন ওয়েট করো, অক্ষয়।

পটলা বলে, অক্ষয় কে?

আরে তোদের অক্ষয়কুমার। আমি গ্রিন সিগন্যাল না দিলে ও কোনো রোল নেয়ই না! আমি এসপুরুভ করব, তারপর—

বইঘর.কম

Boighar & MAH

আমি বলি, এসপুরুভ নয়—অ্যাপ্রুভ—

গুপীদা বলে, বড্ড ফোড়ন কাটো হে তুমি। চুপ করে বসো না। নে পটলা-হোঁৎকা ফাইটের সিন—

ফাইটের সিন করার আগেই হোঁৎকা কাল্লুকে ঘর থেকে বের করে দরজা বন্ধ করে দেয়। ওর ওই কাল্লুর একটা বিশেষ রোল আছে। হোঁৎকার হাতটা সহজেই চলে। ও এমনিতে মারকুটে ধরনের অন্যায় দেখতে পারে না। তাই কেউ অন্যায় করলে হোঁৎকা তার প্রতিবাদ করে। আর ওর প্রতিবাদ শুরু হয় হাত দিয়ে। এটা ওর অভ্যেস—ওর কাল্লু তা জানে। তাই সে প্রথম থেকে মালিককে থামাবার চেষ্টা করে। ঘেউ ঘেউ করে। মারপিট শুরু হলে কাল্লুও তার মালিকের হয়েই ফাইট শুরু করে দেয়। হোঁৎকা দেখেছে এই লড়াই-এর প্রতিপক্ষ কাল্লুর আঁচড়-কামড় খেয়েছে। তাই নিয়ে বেশ গোলমালও হয়েছে দু-একবার। তাই ওসব ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্যই হোঁৎকা তার ফাইট সিন শুরু হবার আগেই কাল্লুকে বের করে দেয়। তারপর ফাইট সিনের রিহার্সাল শুরু হয়।

ওয়ার্কশপও শেষ। পটলার বাজেটও বের হয়ে এসেছে। এবার শুটিং শুরু হবে। ওই বাগানে সেট পড়েছে। এর মধ্যে ক'দিন শুটিংও হয়। এক এলাহি ব্যাপার। পটলাদের বাগানে শুটিং হচ্ছে। চারদিক থেকে আলো জ্বেলে বাগানের এই অংশটাকে আলোকিত করা হয়েছে। এখানে হিরো গাড়ি থেকে নেমে বাগানে লুকিয়ে থাকা ভিলেনদের ধরবে। দু-দলের মধ্যে দারুণ ফাইট শুরু হবে। তাতে বোমা ফাটবে। দু-চারটে গুলিও চলবে। হিরো শেষ অবধি ভিলেনরূপী হোঁৎকাকে ধরে ফেলবে। এটাই কাহিনির ক্লাইম্যাক্স। তাই গুপীদা বলে, পটলা, গুলির লড়াই-এর পর হাতাহাতি ফাইট শুরু হবে। লড়াই থামালে চলবে না। ভিলেনকে যত নির্দয়ভাবে মারবে দর্শক তত কেলাপ দেবে। পটলাও চায় ছবি সুপারহিট করতে। তাই সেও রাজি হয়ে যায়।

এরপর মনিটর নিয়ে সব শুরু হবে। হোঁৎকাকে মার খেতে হবে। বোমা ফাটবে—গুলি চলবে। ধোঁয়ায় ধোঁয়া। তারপর পটলা আর হোঁৎকার ফাইট। পিছনে যাত্রার দলের যুদ্ধের বাজনা বাজাবে ফটিকের দল। সবটা ঠিক মনঃপূত হচ্ছে না গুপীদার। সেই-ই ডিরেক্টার। একটা নড়বড়ে ফুলফ্যান্ট পরেছে সে। লম্বা ঝুলঝাড়ুর মত চেহারা আর গায়ে একটা গোয়া প্রিন্টের শার্ট। গুপীদা ওদের দুজনের ফাইট দেখে বলে, হোপলেস! পটলা-হোঁৎকা ফাইট করতেও জানো না! ফাইটের একটা ছন্দ আছে—অংক আছে। অক্ষয়কুমারকে আমিই ফাইট শেখাই। পটলা, তুমি দ্যাখো আমি হোঁৎকাকে কীভাবে মারছি। হোঁৎকা নেহাত ছবির খাতিরে এমন অসম লড়াই লড়ছে। এবার ক্যামেরা জোনে এগিয়ে আসে গুপীনাথ স্বয়ং। শীর্ণ দেহ নিয়ে গাঁটাগোট্টা হোঁৎকার উপর চড়াও হয়। আর হোঁৎকাও ছবির খাতিরে ওর মার খাচ্ছে।

এমন সময় কাণ্ডটা ঘটে যায়। এতক্ষণ ওরা কাল্লুকে আটকে রেখেছিল। হঠাৎ সে এসে পড়ে এই জোনে। গুপীনাথ তখন বীরবিক্রমে হোঁৎকাকে মারার দৃশ্য অভিনয় করে দেখাচ্ছে। মার খাচ্ছে হোঁৎকা। হোঁৎকা সইলেও কাল্লু এই দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত নয়। তারই সামনে তার বসকে এইভাবে কেউ হেনস্থা করবে কাল্লু তা দেখতে চায় না। রাগে গরগর করছে কুকুরটা। তারপর হঠাৎ বাগানের ঘেরা লাফ দিয়ে টপকে পিছন থেকে গুপীর ঘাড়েই এসে পড়েছে। গুপীদাও অতর্কিত আক্রমণে ছিটকে পড়েছে। কাল্লু গুপীদার প্যান্টটা কামড়ে ধরেছে তার তীক্ষ্ণ

বইঘর.কম

ক্যানাইন দাঁত দিয়ে। একটানে গুপীদা নিজেকে মুক্ত করে প্রাণভয়ে দৌড়োচ্ছে—পিছনে ঘেউ ঘেউ করতে করতে কাল্লু। ঘটনাটা চকিতের মধ্যেই ঘটে গেছে। আমরা সকলেই হতবাক। হোঁৎকাও ভাবতে পারেনি যে কাল্লু এই কাণ্ড করবে। হৈচৈ পড়ে গেছে। গুপীদা লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। পিছনে সমানে তাড়া করেছে কাল্লু। হোঁৎকাও দৌড়োচ্ছে—কাল্লু, অ্যাই কাল্লু—

কাল্লু তখন ছুটছে গুপীনাথের পিছনে। গুপীনাথ সামনে মন্দির দেখে তার চাতালে উঠে পড়ে। কাল্লুও উঠেছে মন্দির চাতালে। গুপীদা আর্তনাদ করে শেষরক্ষার জন্য মন্দিরেই ঢুকে পড়েছে। কাল্লু মন্দিরে ঢুকতে যাবে এর মধ্যে মন্দিরের পুরোহিত-দারোয়ানরা ছুটে আসে। পটলার বাবা নিজে মন্দিরে তখন পূজায় ব্যস্ত। ঝড়ের মত ঢোকে গুপীদা। ওই ঝুলঝাড়ুর মত চেহারায় ছোড়া জামাপ্যান্ট দেখে মনে হয়, আমরা দোল খেলার পর নিজেদের জামা ছিঁড়ে সেগুলো যেমন লাইটপোস্টে ঝুলিয়ে দিই, তেমনি ল্যাম্পপোস্টে যেন কেউ ছেঁড়া জামা ঝুলিয়ে দিয়েছে। পটলার বাবা এহেন চেহারা দেখে চমকে ওঠেন। আর দেখেন মন্দিরের প্রায় ভিতরেই ঢুকে পড়েছে কুকুরটা। গুপীনাথ ভিতরে ঢুকে কুকুরটাকে দেখে বিচিত্রভাবে লাফাচ্ছে। কাল্লু তখনও গলার স্বর পঞ্চমে তুলে চিৎকার করছে—ঘেউ—ঘেউ—

পটলার বাবার ধ্যান ভেঙে গেছে। দেখছেন মন্দিরের মধ্যে এই ব্যাপার।

ওদিকে তখন পুরোহিত চিৎকার করছে, সর্বনাশ হয়ে গেল! বিগ্রহকে অপবিত্র করেছে। এবার ঘোর অকল্যাণ হবে। বাইরে এসে ভিড় করেছে শুটিং পার্টির দল। হোঁৎকাও এসে পড়ে কোনোমতে কাল্লুকে টেনে বাইরে নিয়ে যায়। আর বিপদমুক্ত হয়ে গুপীনাথও বের হয়ে আসে। গর্জাচ্ছে সে, ইস্টুপিট কুকুর! গুলি করে ফিনিশ করব ওটাকে। উঃ আছাড় খেয়ে হাঁটুতে যা লেগেছে! শুটিং প্যাক আপ।

এবার পটলার বাবাই মন্দির থেকে বের হয়ে আসেন। রাগে কাঁপছে তাঁর শরীর। ম্যানেজার-সরকার আরও লোক ছুটে আসে। বলেন পটলার বাবা, প্যাক আপ তুমি করবে কি! আমিই তোমাদের শুটিং চিরকালের জন্য প্যাক আপ করে দেব। কী হচ্ছে এটা? শুটিং না বাঁদরামি! ম্যানেজার, সব ক'টাকে বের করে দাও। দূর করে দাও এই আপদগুলোকে।

পটলা বলে, বাবা, আর একটা দিন শুটিং করলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে।

শেষ করতে হবে না। তোমার অত্যাচার আর আমি সইব না! এবার তোমার ব্যবস্থা আমিই করব!

ঠাকমাও এসে পড়েছেন। তিনি কী বলতে যাবেন, বাবা বলেন, তুমি কোনো কথা বলবে না, মা। আদর দিয়ে তুমিই ওকে বাঁদর করেছ। এবার যা করার আমিই করব! দারোয়ান, শুটিং বন্ধ। ওদের সবকটাকে তাড়াও। আভি! এরা সবকিছুকে অপবিত্র করেছে! কী সর্বনাশ যে হবে! আগে তাড়াও ওদের! পরে এর বিহিত করা হবে!

গুপীদা বেশ অপমানিত বোধ করে। সে বলে, আমি কালই মুম্বাই চলে যাচ্ছি। এখানে আর থাকছি না। আমার বাকি টাকা মিটিয়ে দাও। শুটিং যা হয়েছে তা জুড়ে নিলে তোমার ছবি হয়ে যাবে। আমার আর দরকার হবে না।

ওদিকে টেকনিশিয়ানরাও বলে, আমাদের টাকাও মিটিয়ে দিন!

ক্যামেরাওয়ালা, আলোওয়ালা, অন্যান্য সব টেকনিশিয়ানরা নিজেদের জিনিস সব গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় দেখা যায় ক্যামেরাম্যানকে। আমরা তার কাছে ক্যাসেট চাই। সে বলে তার কাছে কোনো ক্যাসেট নেই। আমরা অবাক হই। পটলা হাঁক পাড়ে—গুপীদা—

গুপীদা তার মালকড়ি নিয়ে আগেই সরে গেছে। দেখা যায় ক্যামেরাতে কোনো ক্যাসেটই নেই। এ ক'দিন এভাবেই ঘুরেছে। কোনো ছবি না তুলে শুটিং করার ভান করে সেই টাকাও হজম করেছে গুপীদা। তারপর গায়েব হয়ে গেছে। অর্থাৎ এতদিন ধরে গুপীনাথ আমাদের সঙ সাজিয়ে নাচিয়েছে মাত্র। হোঁৎকা বলে, তর ছবি হইব না। শয়তানডা টুপি দিই গেছে আমাদের। পটলা, তুই একখান ইডিয়ট।

ফটিক হাহাকার করে, এত সুন্দর মিউজিক করলাম! সব ফক্কা। এতদিনের এত পরিশ্রম, এত স্বপ্ন সব শেষ হয়ে গেল।

গোবরা বলে, ব্যাড লাক। হোঁৎকা, তোর কাল্লুই এসবের মূল। ব্যাটা তাড়া করে নিয়ে ঢুকে পড়ল মন্দিরে। কী হবে এখন?

কী হবে তা ভেবেও পাই না। ক্লাবের মাঠে হতাশ হয়ে হাত-পা ছেড়ে বসে আছি সন্ধেবেলায়। এদিকে আমাদের ছবির কেলেঙ্কারির কথা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। এইভাবে বোকা বানিয়ে যাবে আমাদের ওই সিঁটকে গুপীনাথ তা ভাবিনি।

এমন সময় পটলা কাঁপ-ছেঁড়া ভো-কাট্টা ঘুড়ির মত এসে পড়ে আমাদের মাঝে। আমি শুধোই, কী রে, গুপীনাথের কোনো খবর পেলি?

পটলা বলে, ওর খবরে আর দরকার নেই। বাড়িতে দারুণ কাণ্ড ঘটে গেছে। বাবা আজ গুরুদেবকে আসতে লিখেছেন। মন্দিরের প্রায়শ্চিত্ত হবে। তারপর আমারও ব্যবস্থা হবে। বাড়িতে আর আমাকে রাখবে না। আমাকে দীক্ষা দেবার জন্য হিমালয়ের কোনো গুহায় পাঠিয়ে দেবে। বেশ কয়েকমাস থাকতে হবে সেখানে।

আমি বলি, হিমালয়ে যাবি? দারুণ জায়গা!

পটলা বলে, বেড়াতে যায় লোকে তা সত্যি! ওই গুরুদেবের আশ্রম তো নয় পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্পের চেয়ে কঠিন ব্যাপার ওখানে! মাথার চুল কেটে ন্যাড়া হতে হবে। ভোর চারটের সময় উঠতে হবে এই শীতে। স্নান করতে হবে বরফগলা জলে। তারপর মঙ্গল আরতির পর ধ্যান করতে হবে। এ ছাড়া আশ্রমের গোয়ালে কাজ করতে হবে। গোবর-ময়লা সাফ-সুতরো করে জলখাবার স্রেফ ছোলা ভেজানো আর একটু গুড়! তারপর যেতে হবে বনে কাঠ আনতে। কুড়ুল দিয়ে কাঠ কেটে মাথায় করে আনতে হবে। আর খাবার তো হবিষ্যি। নো মটন—নো চিকেন—নো আন্ডা! ঠান্ডায় জলখাবারে—রাতে দুখানা করে পোড়া রুটি।

ওর ফর্দ শুনে আমাদের হাড়মাস হিম হয়ে যায়—বলিস কী রে!

পটলা হিরো হবার জন্য মাথায় বেশ মিঠুন মার্কা চুল রেখেছে। ও এমনিতেই শৌখিন। আর ভোজনরসিক। তার এই কাহিনি শুনে বলি, তাহলে তো সত্যি তুই প্রবলেমে পড়েছিস, পটলা!

পটলা বলে, গুরুদেব তো নয়, একটা কসাই, কী হবে আমার!

ওর যা হবার হবে, সেই সঙ্গে আমাদের ক্লাবও ডকে উঠবে। আমাদেরও ঠাটবাট, সিনেমা দেখা, খাওয়া-দাওয়া সব উঠে যাবে।

বইঘর.কম

হোঁৎকা বলে, তখনই তরে কইছিলাম, ও সব টিভি সিরিয়াল-ফিরিয়ালে গিয়া কাম নাই। শুনলি না। এহন কী হইব?

পটলা বলে, দ্যাখ, যদি কিছু করতে পারিস।

হোঁৎকার মাথায় মাঝে মাঝে বিচিত্র আইডিয়া উদয় হয়। আর প্রবলেমও সলভ হয়। হোঁৎকা বলে, গুরুদেব কবে আইত্যাছে?

দু-একদিনের মধ্যেই এসে পড়বে। ও তো আমাকে নিয়ে গিয়ে ওর দলে ভেড়াবার জন্য ছটফট করছে।

হোঁৎকা বলে, ভাবতে দে।

পটলার বাবার গুরুদেব শ্রীশ্রী একশো আট ভোলানন্দ বেশ হিসাবি লোক। হৃষীকেশের গঙ্গার ওপারে ওঁর আশ্রম।

আমরা সব ক্লাবের মাঠে বসে আছি। বড় আশা করেছিলাম ছবিটা রিলিজ করলে আমরা পাড়ার কেউকেটা হয়ে যাব। ফটিক তো ভেবেছিল সে এবার নামি মিউজিক ডিরেক্টার হবে। পটলা-হোঁৎকারা তো পরের ছবির স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু সব স্বপ্ন ভণ্ডুল হয়ে গেল। পটলা বলে, ওই গুপীনাথই ডুবিয়ে দিল। ছবির শুটিং করেছে আর ক্যামেরায় ফিল্ম-ক্যাসেটই ভরেনি। অথচ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে গেছে।

গোবরা গেছে গুপীনাথকে ধরে আনার জন্য। কিন্তু সেও ফিরে এসে সাইকেলটা মাঠে ফেলে আমাদের কাছে এসে বলে, তোর গুপীদা পুরো ফলস্ দিয়েছে রে! ওই ঠিকানায় কেউ থাকে না। কেটে পড়েছে ব্যাটা ফোর টোয়েন্টি—

গুপী উধাও। এবার নাকি পটলার সাক্ষাৎ যম সেই গুরুদেব আসছেন। পটলার বাবা চান পটলাকে দীক্ষা দিয়ে তাঁর কাঠগোলায়-কারখানায় ব্যবসার কাজে লাগাতে। তাই ওকে মাসকয়েক গুরুদেবের আশ্রমে রেখে কঠোর ব্রহ্মচর্য সাধন করতে হবে। পটলাকে হারাতে হবে আমাদের। আর পটলাও ভাবতেই পারে না কী ভাবে সে ওই গুরুদেবের জেলখানায় থাকবে!

পটলা কাতর গলায় বলে, একটা কিছু কর!

হোঁৎকা বলে, গুরুদেবকে আসতে দে। দেখি অর হালচাল। তারপর অ্যাকশন লইতে হইব ভেবেচিন্তে।

পটলা বলে, তদ্দিনে বাবা ওই মালের সঙ্গে পাঠিয়েই না দেয় আমাকে!

পটলাদের বাড়িতে বেশ হৈচৈ শুরু হয়েছে। যেন কোনো মহোৎসব। ম্যানেজার সব দিক তদারকি করছে। মন্দিরের সামনে প্যান্ডেল টাঙানো হয়েছে। বাগানের দিকে কয়েকটা ঘর এবং বসার ঘরে আসবাবপত্র আনা হয়েছে। গুরুদেব এখানেই থাকবেন। তাঁর শুভাগমন উপলক্ষে অষ্টপ্রহর নামকীর্তন চলবে। ওদিকে তৈরি হয়েছে ভোগ বিতরণ কেন্দ্র। গুরুদেব যে ক'দিন থাকবেন সে ক'দিন ওখানে অন্নসত্র চলবে। যে আসবে সেই-ই প্রসাদ পাবে। ভক্তদের সমাবেশ হবে ভালোই। ওদের পৌষমাস আর পটলার সর্বনাশ। হোঁৎকা-গোবরা আমাদের নিয়ে আসে পটলার বাবার কাছে। ঠাকমাও রয়েছেন। সামনে এখন বিরাট কাজ। পটলার দীক্ষা—বাড়িতে উৎসব। হোঁৎকা বলে, মেসোমশাই-ঠাকমা, আপনারা ভাববেন না।

পটলার দীক্ষা হইব। আমাদের ক্লাবের হক্কলেরে লইয়া এখানের সব কাম কইর‍্যা দিমু। ওসব খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা, গুরুদেবের সেবার কাজ সব কইর‍্যা দিমু।

অবশ্য পাড়ার পুজোর কাজ—অন্যসব কাজে আমাদের ক্লাবের ছেলেরাই এসে পড়ে। পটলার বাবা-কাকারাও জানেন যে এসব কাজে আমাদের ক্লাবের ছেলেদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ঠাকমা তো আমাদের উপরই নির্ভর করে আছেন। ঠাকমা বলেন, তাই কর তোরা। পটলার দীক্ষা, তোদের বন্ধু। তাকে উদ্ধার তো তোরাই করবি।

পটলার বাবা বলেন, বিরাট ব্যাপার! এদিকে এত লোকের সমাগম হবে, ওদিকে গুরুদেবের সেবার কাজ! পারবি তো?

গোবরা বলে, সিওর! ও নিয়ে ভাববেন না!

ঠাকমা বলেন, পারবে রে পারবে। ওরা খুব কাজের ছেলে।

পটলা ক্লাবে আসে সন্ধ্যায়। সে আমাদের ওভাবে ওর বাবা-কাকার দলে মিশে ওই সব কাজের ভার নিতে দেখে খুশি হয়নি। পটলা বলে, তোরা বাধা দিবি তা নয়, ওদের দলে মিশে আমাকে গুরুদেবের জেলখানায় পাঠাতে চাস! এত বেইমানি করবি? আমাকে বাঁচাবি তা নয় একেবারে লাইন ক্লিয়ার করে দিবি?

হোঁৎকা বলে, তুই চইল্যা যাবি, ঠাকমা আর তর বাবাকে হাতে না রাখলে যে ক্লাব ডকে উইঠ্যা যাইব!

পটলা চটে ওঠে, আমি মরি ক্ষতি নেই, তোদের কাছে ক্লাবই হল সব! ঠিক আছে! দুনিয়াটাই সেলফিশ! স্বার্থপর রে!

গুরুদেব এসে গেছেন সদলবলে। তাঁর জন্যই হোঁৎকা এদিক-ওদিকের কলোনি থেকে তিন-চারজনকে ম্যানেজ করেছে। তারা কেউ দিনমজুরি করে, কেউ ভ্যানরিকশা চালায়। কেউ বাজারে সবজি বিক্রি করে। কেউ বা অন্য কিছু করে। তারাই এখন তিলক কেটে খোল-করতাল নিয়ে সার দিয়ে বসে আছে। নামকীর্তন করছে। ওই দলে পকেটমার বিশুও আছে। ক'দিনের জন্য পকেটমারির কাজ ছেড়ে গেরুয়া পরে সে ভক্ত বনে গেছে।

গাড়ি থেকে নামছেন বেঁটে-গোলগাল চেহারার গুরুদেব। ন্যাড়া মাথা। পরনে সিল্কের গেরুয়া। সঙ্গে বেশ কিছু লটবহর নিয়ে ভক্তের দল। সকলেই ন্যাড়া। গুরুদেব শান্ত ঘূর্ণায়মান চোখে এ বাড়ির প্রাচুর্য-সম্পদ গাড়ির সংখ্যা দেখছেন। পটলার বাবা-ঠাকমা মা-কাকিমারা প্রণাম করেন। গুরুদেবও জানেন এদের বিচার। পটলাকে তাঁর শিষ্য বানিয়ে এদের এই বাগানের পরিবেশে আশ্রম করে জমিয়ে বসা যাবে। পটলা এদের একমাত্র বংশধর। ওটাকে শিষ্যের দলে ভেড়াতে পারলে গুরুদেব সমস্ত সম্পদ হাতে পাবেন। ওদিকে পটলা দাঁড়িয়ে আছে। ওর পরনে দামি পাঞ্জাবি-ধুতি। মাথায় বেশ হিরো মার্কা চুল। বাবা বলেন গুরুদেবকে, বাবা, এই আমার পটলা। একেই উদ্ধার করতে হবে।

গুরুদেব দেখছেন পটলাকে। আমরা তখন ওদিকে ওঁদের অভ্যর্থনার আয়োজনে ব্যস্ত। হোঁৎকা সানাই পার্টি এনেছে। তারা সানাই বাজাচ্ছে। ওদিকে চলেছে পকেটমার বিশুর নামকীর্তন। আমরা শিষ্যদের থাকার ব্যবস্থা করেছি। এবার হবে ওঁদের জলযোগ। গুরুদেব চারদিক নিরীক্ষণ করে বলেন, ওহে মনু, এ তো বেশ কঠিন কাজ হে!

বইঘর.কম

পটলার বাবা বলেন, দয়া করুন বাবা। উদ্ধার করুন!

গুরুদেব বলেন, হুঁ! তুমি যখন বলছ তখন এর সংস্কার করতেই হবে। পাপী-তাপীদের উদ্ধার করাই তো আমার কাজ! জয় ভোলানাথ।

বাবা বলেন, পটলা, প্রণাম কর বাবাকে!

পটলা নিজের বাবাকে প্রণাম করতে যাবে, ওর বাবা ধমকে ওঠেন, আমাকে নয়, গুরুদেব বাবাকে প্রণাম কর।

পটলা প্রণাম করতে যায় গুরুদেবকে। তিনি বলেন, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর। পটলা সেভাবেই শুয়ে গুরুদেবের শ্রীচরণে মাথা ঠুকে প্রণাম করে। নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছিল। কে গুরুদেবের পা ধুয়ে দিয়েছিল। সেই কাদা তার পাঞ্জাবিতে লেগে গেছে। এর মধ্যে একটা ছোট বাটিতে জল আনা হয়েছে। গুরুদেব তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে দেন। বাবা বলেন, গুরুদেবের চরণামৃত পান কর।

পটলা দেখছে বাটিটা। ওই পায়ের আঙুল ডোবা জলটা খেতে হবে? মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। ঠাকুমা বলেন, পটলা, গুরুদেবের চরণামৃত পান কর ভাই, পবিত্র জিনিস, খা।

গুরুদেব দেখছেন পটলার অনীহা, বলেন তিনি, শ্রদ্ধাভক্তি ওর উদয় হয় নাই। ভয় নেই, ওর জ্ঞানচক্ষু আমিই উন্মোচিত করে দেব আশ্রমে নিয়ে গিয়ে।

পটলা এবার বাবার ধমকে কোনোমতে জলটা গিলে নিয়ে চলে যায়। তারপর বাগানে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে বমি করে সেই চরণামৃত বের করছে। আমরাও গিয়ে জুটেছি। হোঁৎকা বলে, চরণামৃত প্যাটে থাকলেই জ্ঞান উদয় হইত।

পটলা গর্জে ওঠে, তাহলে তুইও খা গিয়ে ওই চরণামৃত। তোর জ্ঞান উদয় হওয়ার দরকার। তাহলে আমার একটা পথ হত। তা নয় তোরাও দলে ভিড়ে গেলি।

গোবরা বলে, মা সারদামণি বলেছেন যখন যেমন, তখন তেমন। এই ভাবেই চলতে দে।

এইসব আমায় সইতে হবে, পটলা ফুঁসে ওঠে।

আমি বললাম, যে সয়, সেই রয়। সহ্য করে থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ম্যানেজার আমাদের মধ্যে পটলাকে দেখে বলে, বাবা তোমাকে খুঁজছেন, ছোটবাবু।

কোন বাবা? পটলা বলে ওঠে। এখানে তো দেখি বাবারও বাবা এসে জুটেছেন।

ম্যানেজার বলেন, ওই গুরুদেব বাবা ওঁর ঘরে তোমাকে যেতে বলেছেন। আর হোঁৎকা, তুমিও চলো। বাবার চ্যালাদের জলযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

দু'জায়গায় দু'রকম রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। বাগানের মাঠে উনুন তৈরি করে সর্বজনের জন্য ঢালাও রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। আর নাটমন্দিরের চাতালে চলছে গুরুদেব আর তাঁর চ্যালাদের জন্য এলাহি ভোজনের ব্যবস্থা।

জলযোগের পর গুরুদেবের থালায় পড়ে আছে লুচি, পরমান্ন, এটা-সেটা। গুরুদেব পটলাকে দেখে বলেন, প্রসাদ নাও, বাবা পটল। তারপর একটু পদসেবা করো। চিত্তকে গুরুমুখী-ঈশ্বরমুখী করতে হবে। তাই এখন তোমাকে সাধুসঙ্গে থাকতে হবে।

চরণামৃত খেয়ে পটলা একবার বমি করেছে, এবার আবার প্রসাদের নামে ওই এঁটো খেতে

হবে! কিন্তু বাবা রয়েছেন কঠিন প্রহরায়। তিনি বলেন, পটলা, প্রসাদ নিয়ে গুরুদেব যা আদেশ করেছেন তাই করো।

গুরুদেব আসনে বসে আছেন। ওদিকে তাঁর চ্যালারা এর মধ্যেই এই ঘরে বাবা মহাদেবের একটা ছবি রেখেছে। ত্রিশূল হাতে মহাদেবের দণ্ডায়মান একটা ছবি। ধূপ-ধুনো জ্বলছে আর সেই পকেটমার বিশু, রিকশাআলা মদনারা খোল-করতাল বাজিয়ে তারস্বরে নামকীর্তন করছে। গুরুদেব দুটো পা মেলে বসে আছেন। পটলা তাঁর শ্রীচরণে শ্রীঅঙ্গে ঘি মালিশ করছে। হোঁৎকা-গোবরা তখন গুরুদেবের জলযোগপর্ব শেষ করে নিজেরা খেতে বসেছে।

পটলা দেখছে ওদের খাবার। আজ ওর একাদশী। এখন থেকে ওকে একাদশীও করতে হবে। রাতে ও পাবে শুধু গুরুদেবের প্রসাদ। রাগে গজগজ করছে পটলা।

সন্ধ্যার পর গুরুদেবের ধর্মসভা বসে। বহু ভক্ত সমাগম হয়। গুরুদেব সিল্কের লুঙ্গি পরে বিবেকানন্দের স্টাইলে পাগড়ি বেঁধে বচনামৃত দান করেন। আর প্রণামীর থালায় কত কী পড়ল তা দেখে নেন আড়চোখে। চ্যালারা যে তাঁকে ঠিকঠাক হিসাব দেয় না তা জানেন গুরুদেব। তবু বেশি যাতে না মারে তাই নিজেও নজর রাখেন।

গুরুদেব অবশ্য প্ল্যানটা অনেকদিন আগে থেকেই করেছেন। এদের বেশ কিছুটা জায়গা সমেত একটা বাড়ি ওঁকে হাতাতেই হবে। তার জন্য দানপত্রও তৈরি করে এনেছেন। সেটা কোনোমতে সই করাতে পারলেই এইসব জায়গা, একটা কারখানার তিনি দখল পাবেন। আর পটলাকে যদি হাতে আনতে পারেন বাকি সবই চলে আসবে তাঁর হাতে।

সন্ধ্যায় আমাদের ছুটি। ডিউটি শুরু হবে আবার রাত নটায়। তখন রাতের ভোজনপর্ব হবে। ক্লাবে এখন ভালোই আমদানি হচ্ছে। তবে চিন্তা পটলাকে নিয়ে। পটলা বলে, তোরা কিছু কর। না হলে এবার আমি সুইসাইড করব।

আমরা চমকে উঠলাম। হোঁৎকা এখন মহোৎসবে ভক্তদের কর্তা। ক্যাশকড়ি ভালোই আছে। গোবরাকে বলে, সাইকেল লয়ে ন্যাপার দোকানে যা। মটন বিরিয়ানি আর চিকেন মাঞ্চুরিয়ান লয়ে আয়।

পটলা বলে, সত্যি! হোঁৎকা বলে, এই দিয়া তুই এহন একাদশী কর। বাড়ি যাইয়া সাবু-টাবু অন্ধকারে ফেইলা দিবি।

পটলা বলে, আজ না হয় হল, কিন্তু গুরুদেব যদি সত্যি ন্যাড়া করে হিমালয়ে নিয়ে যায়?

আমি বলি, পটলা, গুরুদেব লোকটা কিন্তু সুবিধের নয়। ওর ঝুলিতে কী মতলব আছে কে জানে?

ফটিক বলে, ওই মহারাজ আর দুই চ্যালা সবসময় গুজগুজ করে। নিশ্চয়ই বদ মতলব আছে। পটলাকে ওদের সঙ্গে নিয়ে যেতে দেব না। কিছু একটা কর হোঁৎকা।

এর মধ্যে গোবরা বেশ কয়েক প্যাকেট বিরিয়ানি আর মাঞ্চুরিয়ান নিয়ে এসেছে। পটলা তাই দিয়ে একাদশী সম্পন্ন করে। তারপর পটলা বলে, আমি চলি। তোরা আয়।

সেদিন সন্ধ্যায় গুরুদেব পটলার বাবাকে তাঁর ঘরে ডেকে বলেন, মনু, আমাদের আশ্রমের ট্রাস্টিবোর্ডে তোমাকে চাই। দেবসেবার পুণ্যকর্মে তুমিও ব্রতী হও, পটলাকে আমার শিষ্য করে নেব। চিরজয়ী হবে সে।

বইঘর.কম

পটলার বাবা গুরুদেবের কথায় বলেন, তাই হবে।

এবার গুরুদেব তাঁর শিষ্যকে বলেন, তাহলে ট্রাস্টিবোর্ডের কাগজপত্র সব দেখেশুনে সই করিয়ে নাও। পটলার বাবাকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সবাই সই করেছেন, এরপর তুমি ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য হবে।

পটলার বাবার সামনে বেশ কিছু কাগজপত্র এগিয়ে দেন তিনি। পটলার বাবা বলেন, প্রভু, আপনার সেবক হতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব, দিন সই করে দিচ্ছি।

গুরুদেব দেখছেন পটলার বাবা সব ঠিকঠাক কাগজে সই করছেন। গুরুদেব বলেন, জয় শিবশম্ভু! তাহলে কালই পটলাকে দীক্ষা দিয়ে ওকে নিয়ে চলে যাব আমার আশ্রমে। কাল মস্তক মুণ্ডন হবে পটল বাবাজির।

পটলার বাবা বলেন, তাই হবে, গুরুদেব।

পটলা সব শুনে কেঁদে বলে, কাল আমার জন্মদিন, কাল আমি ন্যাড়া হব না।

ঠাকমা বলেন, সত্যিই তো, কাল ওর জন্মদিনে ওইসব হবে? গুরুদেব বলেন, ঠিক আছে। মঙ্গলবার অমাবস্যা। শুভদিন। ওই দিনই মস্তক মুণ্ডন, দীক্ষা হবে। আর মনু, ওইদিনই পটলাকে নিয়ে হিমালয়ে যাত্রা করব। তুমি যাবার ব্যবস্থা করে দাও।

বাবা বলেন, তাই হবে, গুরুদেব।

গুরুদেব আজ খুশি। ওঁর শিষ্যদের নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে ধ্যানে বসেছেন। সারারাত ওঁরা নাকি তপস্যা করবেন। ফটিক-গোবরারা ওৎ পেতে ছিল। রাতে ওরা জানলা দিয়ে দেখে গুরুদেব তাঁর দুই চ্যালাকে নিয়ে গাঁজা টানছেন। গুরুদেব বলেন, নিয়ে চল ছোঁড়াটাকে, তারপর এদের ভিটেমাটি দখল করে নেব। জয় বাবা শিবশম্ভু! সব হাতে এনে দাও বাবা। এখানেই তোমার মন্দির বানাব।

আমরা জানলার বাইরে থেকে শুনে চমকে উঠি।

সকালে আমরা সবাই ক্লাবে এসেছি। পটলা বলে, আমি চলে যাচ্ছি কালই সকালে।

আমরা শুধোই, কোথায়?

পটলা আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, ওপরে।

হোঁৎকা বলে, গোবরা, ন্যাপারে গিয়া ক, মাংসের হাড়গোড় যা বাঁচবে তা যেন না ফেলে সব রেখে দেয়।

আমি বলি, হাড়গোড় দিয়ে কী করবি?

হোঁৎকা বলে, দেখ না আমার খেল। তগো শুধু যা যা কমু সেই মত কাজ করবি।

গুরুদেব বেশ খুশি। তাঁর সব প্ল্যান ঠিকঠিক মত কাজ করেছে। রেলের টিকিটও কাটা হয়ে গেছে। গুরুদেব জানেন, পটলার বাবাকে দিয়ে দানপত্রও সই করে নিয়েছেন। এবার সব সম্পত্তি তিনি হাতের মুঠোয় আনতে পারবেন। আজ রাতভোর গুরুদেব শিবসাধনা করবেন তাঁর চ্যালাদের নিয়ে। তাঁর প্রধান চ্যালা উৎকৃষ্ট নেপালি গাঁজাও নিয়ে এসেছে, সঙ্গে রয়েছে উৎকৃষ্ট রাবড়ি।

গুরুদেব তাঁর ঘরে হোম শুরু করেছেন। সারাঘর ধোঁয়ায় ধোঁয়া। হঠাৎ মহাদেবের ছবিটা যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বের হয়েছেন জটাধারী স্বয়ং ভোলানাথ। বাঘছাল পরা বিভূতি মাখা হাতে ত্রিশূল। সঙ্গে ভীষণদর্শন দুই চ্যালা। ঘর ভরে ওঠে ওঁদের হুংকারে। আমি এসেছি

শীতলানন্দ। সঙ্গে নন্দী-ভিরিঙ্গিকে এনেছি। তোর প্রার্থনায় সাড়া দিতে। তোদের মত ভক্তকে এবার উদ্ধারই করব। শিবলোকে নিয়ে যাব তোদের তিনটেকে।

ত্রিশূল নাচাচ্ছেন শিব। আর তাঁর দুই চ্যালা এবার গুরুদেবের দুই চ্যালাকে পেটাচ্ছেন। ওঁরা ভয়ে কাঠ হয়ে গেছেন। স্বয়ং শিব এসেছেন, ওদের শিবলোকে নিয়ে যাবেন সেটা ওঁরা ভাবেননি। এত সম্পদ-প্রাচুর্য ফেলে ওঁদের শিবলোকে যেতে হবে? ওঁরা কাতর আর্তনাদ করে ওঠেন কিন্তু শিব নাছোড়বান্দা। এবার শিব এবং নন্দী-ভৃঙ্গী ওঁদের তিনজনের হাত-পা বেঁধে ফেলে। ওঁরা তখন নেশার ঘোরে আর্তনাদ করছেন। বাড়ির সব লোক, অন্যান্য ভক্তরাও এসে জোটে। আমরাও পটলার ঘরেই ছিলাম, এসে পড়ি। দেখি গুরুদেব মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন আর আর্তনাদ করছেন, বাবা মহাদেব নিজে এসেছিলেন। মনু, পটলকে বাবা নিজে দয়া করেছেন। জয় বাবা।

ওদিকে ঝুলি থেকে সেই কাগজপত্র ছিটকে পড়েছে। হোঁৎকাই দানপত্রখানা পটলার বাবার হাতে তুলে দিয়ে বলে, এসব কী কাগজ, মেসোমশাই?

দানপত্রে নিজের সই করা দেখে পটলার বাবাও চমকে ওঠেন।

—এ কী! এ যে আমাদের সর্বস্ব দান করা দলিল। এ মিথ্যে দলিল, কেউ কৌশলে আমাকে দিয়ে সই করিয়েছে।

ঠাকমা বলেন, এসব কী?

দেখা যায় খাটের নীচে বিরিয়ানি আর মটনকষার অবশিষ্ট হাড়গোড়। ঠাকমা নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে নাকচাপা দিয়ে বলেন, এসব কী অনাছিষ্টি কাণ্ড! গুরুদেব মানুষ এসব অখাদ্য খায়? ভণ্ড—ধান্দাবাজ—জোচ্চুরি করে সব দখল করতে চায়!

পটলার কাকা বলেন, ডেঞ্জারাস লোক। দাদা ওর ঝুলি তল্লাশি করো। আরও অনেক কিছু বেরোতে পারে।

এবার দেখা যায় ঝুলির মধ্যে লাল কাপড়ে মোড়া বেশ কিছু সোনার গহনা। ঠাকমা চমকে ওঠেন, সাধুর ঝোলায় এত গহনা? নির্ঘাৎ ডাকাতির মাল। পুলিশকে ফোন কর। হাতকড়ি পরিয়ে নিয়ে যাক।

এর মধ্যে ভক্তরাও এসে গেছে, পুলিশও এসে পড়ে। ওরা গুরুদেব আর তাঁর কয়েকজন চ্যালাকে থানায় ধরে নিয়ে যায় মালপত্র সমেত। পরে জানা যায় যে ওরা এসব গহনা কোন ভক্তের সিন্দুক ভেঙে বের করেছে।

পটলাকে আমরা ক্লাবের মধ্যমণি করে মাঠে এনে বসেছি। গুরুদেবের হাত থেকে পটলাকে মুক্ত করতে পেরে আমরাও খুশি। হোঁৎকাই সেদিন স্বয়ং মহাদেব সেজে বিশু আর মদনাকে নিয়ে গুরুদেবকে ভয় দেখিয়েছে। তাই আজ পটলার মিঠুন মার্কা চুলটাও বজায় রয়েছে। তবে তার মাথা থেকে সিরিয়ালের ভূতটা আমরা নামাতে পেরেছি।

পটলার সঙ্গীত সাধনা

ইদানীং পটলা আমাদের কাছে একজন বিশেষ ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। অবশ্য গুণপনার অভাব ওর নেই। আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের পঞ্চজনের মধ্যে ওকেই ভগবানও সব থেকে বেশি ভালোবাসেন। দেখতেও বেশ সুন্দর ছিমছাম চেহারা, মাথার চুলগুলোকে ইদানীং একটু বাবরির স্টাইলে বাড়িয়ে তুলেছে তাতে ওকে দেখে শিল্পী-টিল্পী মনে হয়। আর গুণও আছে। কবিতা লিখতে ওস্তাদ।

স্কুলের গেটের ধারে আধমরা কামিনীগাছটাকে নিয়ে দেড় ডজন কবিতা ফুটিয়েছে, বাজপড়া তালগাছের জন্য একবার দু'পাতা জুড়ে হাহাকার করেছিল, সেবার বাংলার মাস্টারমশাইকে নিয়ে একটা বাইশপদী কবিতা লিখে—থার্ডমাস্টারের হাতে নাক কেটে রক্তপাতও ঘটেছিল তার।

অবশ্য পটলা বলে, ক-কবিতার জন্যে শ-শহিদও হতে পারি।

রক্তপাত তো...তু...তু—

আমিই পাদপূরণ করে দিই—তুচ্ছ ব্যাপার।

পটলা অভিনয়ও করে সুন্দর, তবে সংলাপ-টংলাপগুলো থাকলে মুস্কিল। দিনটা কখন আইসে যাবে কে জানে। তাই কাটা সৈনিক নীরব সভাসদ ইত্যাদি করে থাকে দারুণ। সেবার দূতের পার্ট করতে গিয়ে এমন গিয়ার মেরেছিল যে রাজামশাইও ঘায়েল। সেই থেকে নীরব ভূমিকাগুলো ওর বাঁধা।

ইদানীং পটলার চলেছে সঙ্গীত সাধনা। ভোর থেকে উঠে বার-বাড়িতে বসে তা-না-না-না করে চিৎকার করে। অবশ্য কালোয়াতি গানে ওই জিব আটকাবার কোনো ব্যাপার নেই। সাদা কথা তা-না-না-তুম্ না-না, গা-ধা ইত্যাদিতে ব্রেক ফেল করার মত কিছু নেই। ভট্টাচার্য পাড়ার ওস্তাদ ভীম ভট্টাচার্যের কাছে তালিম নিচ্ছে।

হোঁৎকা বলে—পটলা গান শিখবো, ওস্তাদ হইবো। মাথা খারাপ হইয়া গেছে গিয়া ওডার।

আমি জানাই—সেদিন স্কুলের ফাংশানে কেমন গাইল দেখেছিস? আহা—

পটলা গান এক-আধটু গাইতে পারে। ওদের বাড়িতেও গানের চর্চা আছে। সেসব রাগপ্রধান না হয়, ভজন দু'চারটে, রবীন্দ্রসঙ্গীতও থাকে।

কিন্তু এবার পটলা নাকি বন্দেজি গাইয়ে হয়ে উঠবে। ভীম ভট্টাচার্য কালোয়াৎ ওকে এখানের তালিম দেওয়া শেষ করে বেনারসে নিয়ে যাবে কোনো বড় ওস্তাদের কাছে। খোদ সরকার থেকে গান শেখার জন্য মাস মাস আড়াইশো টাকা বৃত্তির ব্যবস্থাও নাকি করে দেবে ওই ওস্তাদ।

ভীম ভটচায এদিগরের একটি নাম। দশাসই বিরাট চেহারা, তাই আসল নামটা চাপা পড়ে

গিয়ে ওই ভীম নামটাই বহাল হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে জমিদার বাড়ির হলঘরে কালোয়াতি গানের আসর বসে, ভীম-এর হুঙ্কার শোনা যায় বাইরে থেকে।

কে জানে আজ তেমনি কোথাও আসর বসেছে বোধহয়। অবশ্য সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু পটলাকে দরকার—তিন-চারদিন পরই ওর পিসির বাড়িতে বেড়াতে যাব। আমের সময়—আম-লিচুর বাগান আছে ওর পিসির, আমাদেরও বার বার করে যেতে বলেছে।

কিন্তু পটলার দেখা নেই। সব ব্যবস্থা কখন করা যাবে তাই ভাবছি। তাছাড়া পটলাকেও এখান থেকে কিছুদিন সরে যেতে হবে তার নিরাপত্তার জন্য।

বন্ধু হয়ে তাই পটলাকে বাঁচাবার জন্যই ওকে নিয়ে চলে যাব আমরা। কারণ সন্ধ্যা না হলে পটলার বেরুবার উপায় নেই ইদানীং।

হোঁৎকা নুন ঝালটা আঙুলে লাগিয়ে চুষছে, চানাচুরগুলো ফুরিয়ে গেছে আগেই, হঠাৎ ফটিক খবরটা নিয়ে আসে—বড় তরফে পটলাকে আটকেছে ভীম ভটচায।

অর্থাৎ আজও ভীম ভটচায ওকে ওস্তাদ গাইয়ে করে তোলার জন্য বড় তরফের কালোয়াতি গানের আসরে নিয়ে গেছে। হোঁৎকা বলে—ওটারে শ্যাষ করবে ওই ভীমটা কয়ে দিলাম, যা চেল্লায়—কানের পর্দা আগেই বার্স্ট কইরা কালা হইবো। তারপর সা কইরা রাম চেল্লান চিল্লাইতে গিয়া লাংস খান তিন টুকরা হইয়া তোগোর পটলা এক্কেবারে পটল 'প্লাক' করবো।

হঃ—হোঁৎকার কথায় চমকে উঠি—বলিস কি? পটলা মরে যাবে?

ফটিক বলে—যা দেখে এলাম আজই কিছু না হয়ে যায়। সপ্তরথীতে ঘিরে ধরেছে ওরে। ও নাকি ধামার গাইবে—পাখোয়াজ-এর শব্দ তো নয় মেঘের গর্জন। পটলারে সত্যিই বিপদে ফেলেছে ওরা।

পটলার উপর এমন আক্রমণ হতে দেওয়া ঠিক হবে না। তাই গদাইও বলে—চল তো, দেখিগে।

আমি জানাই—কিন্তু ঢুকতে দেবে কি হলঘরে?

ফটিক জানায়—ঢুকতেই হবে। না হলে একটা পথ করে নেব। চল। টাকপড়া-দাঁতনড়া চাল্‌সেধরা সব মোটা সরু সিঁটকে লোকগুলো হাজির হয়েছে। বুনোট করা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ওদিকে বসে ন'তরফের গির্দা বাবু। বিরাট তাকিয়ার মত মোটা—বড়কত্তা। ধরে নাড়াচাড়া করতে হয়, ওপাশে কপিল ভটচায—লগির মত লম্বা আর টিকটিকির মত দেহ, উনি ত গানটান। ওই শীর্ণ দেহ থেকে যে এমন বাজখাঁই আওয়াজ বের হয় তা ভাবা যায় না।

আরও অনেকে আছে। নতুন আমদানি হয়েছে শহরের ধানকল মালিক হরদেও লালা। গোলাব জল ছিটানো হচ্ছে। আর মাঝে সমাসীন ভীম ওস্তাদ। লাল টকটকে চোখ—বিরাট হাঁড়ির মত মুখ, ইয়া গর্দান। পরেছে কলকাতার বেনারসী ঢং-এর চিকন পাঞ্জাবি। যেন ডাকাতসর্দার তরোয়াল ফেলে এসে বসেছে ওই বেশে। আর দুপাশে দুটো জহর তানপুরা—গোদামতো পাখোয়াজ আর একদিকে নেংটি ইঁদুরের মত অসহায় অবস্থায় বসে আছে পটলা। যেন একপাল দানব একটা দেবশিশুকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে নুন-টুন দিয়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে আর কি!

বইঘর.কম

আমরাও গিয়ে হাজির হয়েছি। ভিতরে ঢোকার উপায় নেই। হোঁৎকা-গদাই ওদিকের বারান্দায় উঠে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। তানপুরায় রিনি রিনি শব্দ ওঠে।

আমিও ব্যাপারটা দেখার জন্য ছটফট করছি। ওদিকে পথ নেই, তাই ফটিক আর আমি বাইরে থেকে জানলা দিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করছি। ফটিক-এর কাঁধে উঠে জানলা দিয়ে উঁকি মারা মাত্র যেন একটা বোমা ফেটে পড়ল সগর্জনে। আর লাল দুটো চোখ—বিরাট মালসার মত মুখগহ্বর থেকে নাদ বের হয়—এ্যাও—তা ও—ও—

যেন বিরাট একটা রাক্ষস হাউমাউ-কাঁউ করে এবার তেড়ে আসছে, ঘপ্ করে ধরেই গপ্ করে মুখে পুরে চিবিয়ে হাড়গোড় গুঁড়ো করে দেবে।

ওই প্রচণ্ড গর্জনে হাতের মুঠি খুলে যায় আর হড়কে পড়েছি রাস্তায়। ফটিকও ওই বিকট ব্যাপার দেখে দৌড়োচ্ছে।

ওদিকে হৈ-চৈ পড়ে যায়। চোর—চোর।

এক কণ্ঠের চিৎকার হাজার কণ্ঠে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। বড়বাবু বিরাট দেহ নিয়ে তাকিয়ায় পড়ে পড়ে গর্জন করে—আমার বন্দুক—অ্যাই বন্দুক লাও।

বারান্দায় হলঘরেও হৈ চৈ পড়ে যায়। বৈকালে ডাকাত ঢুকেছে এখানে। দৌড়াদৌড়ি, হাঁকাহাঁকি চলেছে। কে হুকুম দেয়—পাকড়ো।

কিন্তু কে পাকড়াবে, দারোয়ান রাম সিং একটা ঘরে ঢুকে চিৎকার করে—পাকড়ো ডাকু। বোমা মারেগা—হুঁশিয়ার।

আমরা তখন ভাঙাবাড়ির এদিক ওদিক দিয়ে ফিরে এসেছি আমাদের পার্মানেন্ট রকে। হোঁৎকা-গদাইও এসে বলে—দিলি তো ব্যাটাদের গান শেষ করে। ভীম ভটচায বোধহয় চিনে ফেলেছে।

গর্জে উঠি—তবু পটলাটা পালিয়ে এল না এই মৌকায়?

'ওই যে আসছে বোধহয়।' গদাই বলে ওঠে—ইদানীং পটলার আসার খবরটা আমরা আগেই পেয়ে থাকি। সারাপাড়ার কাক তাকে ঘিরে কলরব করে কা-কা-কা।

দু-একটা ডাকাবুকো গুণ্ডাগোছের কাক আবার ছোঁ মেরে নেমে এসে ওর মাথাতেই টোক্কর দেবার চেষ্টা করে। এখানের কাকের জগতে পটলা ইদানীং সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। বের হবার উপায় নাই।

দু'একবার ঠোক্করও দেবার চেষ্টা করে। এখানে কাকের জগতে পটলা ইদানীং সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। বের হবার উপায় নাই।

দু'একবার ঠোক্করও খেয়েছে। তবু মাথার বাবরি চুল থাকার জন্য সে আক্রমণ তেমন প্রাণঘাতী হয়নি, কিন্তু তার কাকবাহিনীই তাকে বিব্রত করে তোলে। আর এর জন্য দায়ী পটলাই—আর ওই সঙ্গীতসাধনা।

কোন পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপন দেখে পটলা কলকাতা থেকে আজব পুস্তক একখানা আনিয়েছিল। তাতে নানা কিছু অদ্ভুত সব ব্যাপার আছে। ওতেই পড়েছিল শকুনের ডিম গোবরে তিন দিন ডুবিয়ে রাখার পর হীরাকষ-এর জলে ধুয়ে পঞ্চমী তিথিতে মুখে পুরে রাখলে নাকি অদৃশ্য হওয়া যায়। তুমি সবাইকে দেখতে পাবে—কিন্তু কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। আমরাও সন্ধান করেছিলাম সকলে, যদি শকুনের ডিম পাওয়া যায়। তাহলে অঙ্কের ক্লাসে নিরাপদ থাকা

Boighar & MAH
যাবে। আর চৌধুরীদের আমবাগানে আম-লিচুর অস্তিত্বও থাকবে না। কেউ দেখতে পাবে না—আমরা অদৃশ্য হয়ে সব শেষ করে দেব। না হয় খেলার মাঠে পকেটে করে ডিম নিয়ে যাব, পায়ে বল পেলেই টপ করে ডিমটা মুখে পুরে অদৃশ্য হয়ে সিধে গোলে ঢুকে গিয়ে আবার দৃশ্যমান হব।

কিন্তু শকুনগুলো হাড়-পাজি—ওরা কোনো পাহাড়ে গিয়ে ডিম পেড়ে আসে পাছে আমরা পেয়ে গিয়ে কাজ হাসিল করি, তাই ওই ডিম না পেয়ে ওই পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়।

কিন্তু ওই বই-এ লেখা ছিল কোকিলের ডিম-এর কথা। ওই কোকিলের ডিম সংগ্রহ করে চুন দিয়ে কুসুমটা মাখিয়ে গলায় প্রলেপ দিলে গলা দিয়ে নাকি কোকিলের মত স্বর বের হবে। পটলা কিছুদিন থেকে ওদের বাড়ির রাখাল ছেলেটাকে নিয়ে কোকিলের ডিমের সন্ধান করেছে, কোকিলের নিজের বাসায় ডিম থাকে না, কোকিল কাকের বাসাতেই ডিম পেড়ে পালিয়ে যায়, সুতরাং পাড়ার আমগাছে, জামগাছে দত্তদের বাগানের তাবৎ গাছে কাকের বাসা ভেঙে কোকিলের ডিমের সন্ধান করছে পটলা। কিন্তু 'অরিজিন্যাল' কোকিলের ডিম একটাও পায়নি, ভয় আছে ভুল করে যদি কাকের ডিম-এর ওই ওষুধ দিয়ে গলায় মাখায়—তাহলে কাকের মত কা-কা কর্কশ শব্দ বের হবে গলা দিয়ে।

তাই ভরসা করে পটলা ওই ওষুধ লাগাতে পারেনি, কিন্তু তামাম কাকগুলো ওকে চিনে ফেলেছে, তাই পথেঘাটে বের হবা-মাত্র তারাও দলবেঁধে ঠোকরাতে আসে। স্কুলে গিয়েও রক্ষে নেই, কাকগুলো ডালে ডালে যেন ওর জন্য ওৎ পেতে থাকছে ইদানীং।

পটলা কোনরকমে মাথা বাঁচিয়ে এসে খবর দেয় আমাদের—ভীম ওস্তাদ তোদের চিনে ফেলেছে। সবে সপাট তান ধরেছিল—আর চোরের দলে মিশে তোদের জানালা ভাঙা দেখে তানটাই ছুটে গেল, সমে ফিরতে পারেনি। তাই বলেছে—ধরে পুঁতে ফেলবে কালীসায়রের কাদায় তোদের দুটোকেই।

তাই নাকি রে। ঘাবড়ে যাই! ভীম ওস্তাদকে বিশ্বাস নেই। ও সব পারে। এর আগে কোনো শাগরেদের তিনটে দাঁত এক চড়ে উড়িয়ে দিয়েছিল সা ঠিকমতো লাগাতে পারেনি বলে।

কাকগুলোর একটা সাঁ করে নেমে একেবারে পটলার মাথাটা ট্যানজেন্টের ভঙ্গিতে ঠোকরাবার চেষ্টা করে উড়ে গেল। পটলা সামলে নিয়ে বলে—ব-বড় তরফের গির্দা বাবুও দেখেছে তোদের দারোয়ান নাকি পেলেই ধরে নে যাবে!

গদাই বলে—পটলার জন্যেই এসব। তাই বলছি পটলা দিনকতক তোর পিসিমার ওখানেই যাই। চেঞ্জও হবে আর এ্যাই—ধা—।

কাকটা আবার ধেয়ে এসেছে, এবার পটলার মাথাতে বেশ মোক্ষম ঠোক্কর মেরেছে। পটলা আর্তনাদ করে বলে—তাই বল—কাক অবধি পিছু লেগেছে।

আমাদের পিছনে লেগেছে ওই ভীম ওস্তাদ আর গির্দাবাবু। অমন গানের গুঁতোয় আছড়ে পড়ে হাত না ছড়েছে। এবার পিঠে ফোস্কা না পড়ে। বাড়িতে জানতে পারলে রেহাই নেই। তাই পলায়নই শ্রেয়। বলি—তাই চল। আম এখন ঠিক পেকেছে।

পটলা বলে—ওস্তাদ যদি রেগে যায়।

হোঁৎকা বলে—তর ওস্তাদের বন্দোবস্ত আমিই করুম। ওর লোক তাড়ানো চেল্লা-মেল্লি থামাইমু, কয়ে দিলাম। এহন চল তালে কালই।

বইঘর.কম

পাঁচজন রওনা হয়েছি। মাইল পাঁচেক হেঁটে গিয়ে বাস ধরতে হবে। সেখান থেকে সদর শহরে ট্রেন ধরে তিন-চারটে ইস্টিশন পার হলে তবে পিসিমার বাড়ি।

বাস-এ উঠে মনে হল এবার যেন মুক্ত পুরুষই হয়ে গেছি। ভীম ওস্তাদ নেই—গির্দাবাবুরও ভয় নেই। স্কুলের ছুটি আর পটলাও বেঁচেছে। দিনভোর কাক তাড়াতে হচ্ছে না।

ইস্টিশানে নেমে বেশ নিরাপদেই পায়চারি করছে পটলা প্লাটফর্মে। এখানের কাকগুলো জানে না যে ওদের অনেক বংশধরকে ডিম অবস্থাতেই নিকেশ করেছে পটলা, কোকিলকণ্ঠ হবার জন্য।

তবু পটলা বাবরি চুল নেড়ে হাত ঘুরিয়ে প্লাটফর্মের বেঞ্চে বসে সুর ভাঁজছে—সৈয়া—ভু একবার আ যা—ওরে সেঁ-ই-য়া—আ-আ-আ—

ধমকে ওঠে হোঁৎকা—ফের ওই স্বরবর্ণ ব্যনন্ বর্ণ লইয়া চেল্লাবি, ত-তর গল্লা মটকাই দিমু। ব্যাটা—ওই গানের গুঁতোয় দেশত্যাগী হইলাম—এখনও গান! এ্যাঁ! পটলা চুপসে গেছে। গদাইও সায় দেয়—ঠিক বলেছিস। হোঁৎকা এবার জজের মতো শাস্তির বিধান দেয় পটলাকে—অষ্টআনা পয়সা ছাড়—চিনাবাদাম কিনবার লাগবো, অই বাদামওলা।

পটলা কিছু বলার আগেই হোঁৎকা এক ঠোঙা বাদাম আর গোটা চারেক বাদাম তৎসহ নুন-লঙ্কা ফাউ হস্তগত করে উদাসভঙ্গিতে পটলাকে দেখিয়ে বলে—ওই বাবুর কাছে ল পয়সাটা। ধর—

দু-চারটে করে বাদাম হাতে ধরিয়ে হোঁৎকা পুরো ঠোঙাটাই দখল নিয়েছে। এমন সময় দেখা যায় প্লাটফর্মে কর্মব্যস্ততা নেমেছে। বাঁকের মাথায় ট্রেনটা ধোঁয়া উড়িয়ে স্টেশনের দিকে আসছে।

ভগবানপুর ওর পিসিমার গাঁয়ের নাম। ওই নামেই স্টেশন। পথের দু'ধারে আমবাগানের লিচু গাছের সবুজ পাতাগুলোর উপর কে যেন সিন্দুর ছিটিয়ে দিয়েছে। গাছে জাল টাঙানো। বাদুড়ের ভয়ে টিন বেঁধে রেখেছে দড়ি দিয়ে, দড়ি টেনে টিনটাকে ডালে ঘা মেরে শব্দ তুলে পাখি তাড়ানো হয়।

পিসিমাদের বাড়ি পৌঁছে যেতে সাড়া পড়ে। নদীর ধারে চকমিলানো বাড়ি। সামনে নাটমন্দির। বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থই বলা যায়। পিসেমশাই—পিসতুতো ভাই বোনরাও এসে পড়ে। পিসিমাও খুশি হয় আমাদের দেখে—এসেছিস, খুব খুশি হয়েছি।

পটলার পিসেমশাইও বেশ শৌখিন লোক। ফর্সা নাদুস-নুদুস চেহারা। জমিদার-জমিদার ভাবটা আছে আর মেজাজও তেমনি। বাইরের ঘরে তানপুরা-পাখোয়াজ-হারমোনিয়াম-তবলাও রয়েছে। পিসেমশাই বলেন পটলাকে। —শুনেছি ভালো ক্ল্যাসিকাল ভজন গাস। ভালোই হল, রাসু ওস্তাদকে এবার একহাত দেখিয়ে দিতে হবে। পিসিমাও বলেন—কি ছাই গায় রাসু। যেন বমি করছে। পটলের গান তো শোননি যেন কোকিলের মত সুর ফোটে ওর গলায়।

পরক্ষণে পিসিমা নিজের পিতৃকুলের প্রশংসা শুরু করেন ফলাও করে—হবে না? বড়দা কেমন ওস্তাদ ছিল জানো তো? কেমন বংশ দেখতে হবে। সুর ওখানের মাটিতে রয়ে গেছে।

পিসেমশাই বলেন—তাই তো বলছি, পটলা দুচারদিন জিরো, তারপর রাসুর দ্যামাক ছুটিয়ে দিতে হবে। ও বলে কিনা আমি পাখোয়াজের বোল তুলতে পারি না? তালে ছোট! এবার দেখিয়ে দেব তাদের।

আমি গদাই-এর দিকে চাইলাম। ভাবনায় পড়েছে গদাই, পটলার মুখ যেন চিমসে মেরে গেছে। অভ্যাসমত মাথায় হাত বুলিয়ে একবার শূন্যপানে চেয়ে কাকদের পজিশনগুলো দেখে নেয়, পরক্ষণেই খেয়াল হয় এখানের কাকগুলো ওকে চেনেনি। তবু মনে হয় ওই রাসু ওস্তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার ব্যাপারটা তার ভালো লাগেনি। পিসিমা বলেন—ওসব এখন থাক। তেতেপুড়ে এল বাছারা। নেয়ে খেয়ে ঘুমোক।

খাওয়াটা সত্যিই অপূর্ব। অনেকদিন পর শান্তিতে খেতে বসেছে তারা। পিসেমশাইও আমুদে লোক—সার বেঁধে বড় বারান্দায় খেতে বসেছেন। হোঁৎকা আর গদাই যেন পাল্লা দিয়ে খেয়ে চলেছে।

পিসেমশাই বলেন—মাছ নাও হে! নদীর টাটকা পাবদা আর ইলিশ।

পাতের উপর নধর সাইজের পাবদা মাছ গোটাদুয়েক তখনও রয়েছে। ইলিশের পেটি দাগা একত্রে ইয়া গাবদা সাইজের টুকরোগুলো যেন রসে টস টস করে।

হোঁৎকা বলে, নিমু।

আর রকমারি পাকা আমও রয়েছে বালতিতে ভেজানো। বোম্বাই—ল্যাংড়া—পেয়ারাফুলি—ভবানী রানীপসন্দ। সঙ্গে ঘরের গরুর দুধ।

পিসেমশাই বলেন—ও বেলায় লিচুগুলো দিও মনুর মা। আর রাত্রে করবে ক্ষীর আর আম, সঙ্গে গলদাচিংড়ির তরকারি আর লুচি, ব্যস।

হোঁৎকা খাওয়া দাওয়ার পর সটান মেঝেতে টানটান হয়ে শুয়ে বলে—হঃ খাইলাম বটে। তাই তো কইছিলাম, পটলা চল পিসিমার বাড়ি। কদিন এমনি খাওয়ান খাইলই—দেকস্ চেনা যাইব না।

গদাই বলে—খাবি আর কদিন। কালই শোনলাম রাসু না ফাসু ওস্তাদ কে আসছে। তার সাথে পাল্লা দিতে হবে পটলাকে। কী হবে কেসটা বুঝছিস? স্রেফ কিচাইন হয়ে যাবে।

আমিও বলি—কী আর হবে? রাসু জিতে যাবে। আমাদেরও কাট মারতে হবে। হেরে গেলে আর এমন যুতের খ্যাট জুটবে র‍্যা? তখন পালানো ছাড়া পথ থাকবে না।

ভাবনার কথা। হোঁৎকা চিৎ হয়ে পড়েছিল। সে গর্জে ওঠে—রাসুকে আইতে দে তখন দ্যাখা যাইব। এহন শো দিন, নিদ্রা আইতেছে আমার।

বিকালে পটলার পিসতুতো ভাই মহীন ওদের বাগানে নিয়ে যায়। সারবন্দি কলমের আমগাছে ডালপাতা দেখা যায় না। আম ঝুলছে। কোনোটা পেকে হলুদ হয়েছে। কোনোটা লাল টকটকে নানা সাইজের আম। বাগানের একটা কুঁড়ে ঘরে গাদা বন্দি আমে আঁশশেওড়া পাতা চাপা দিয়ে রেখে ঝুড়ি বোঝাই করে চট দিয়ে মুখ সেলাই করা হচ্ছে। গাড়িবন্দি করে ওরা ট্রেনে, না হয় ট্রাকে চালান দেবে। বাতাসে পাকা আমের মিষ্টি গন্ধ।

ছায়াঘন আমবাগানে বসে আমই খাওয়া গেল। হোঁৎকা বলে—দুচার দিন থাকলি গায়ে গত্তি লাগবো গদা।

অবশ্য সেটার অভাব গদাই-এর নেই। ভীমের গদার মত গোল চেহারা ওর। পটলা বলে—তাতো থাকতাম রে। ওই রাসু ওস্তাদ—

ফটিক বলে—ওই ওস্তাদগুলোর জন্যেই পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

ভীমের ভয়ে গাঁ ছাড়লাম, তা এখানে এসে সেই ওস্তাদ! জান কয়লা করে দিল রে।

বইঘর.কম

বাগান থেকে ফিরছি। পটলার পিসতুতো ভাই মহীনও রয়েছে। সন্ধ্যায় বেশ জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে নদীর ধারের চাতালে।

কিন্তু বাড়ি ফিরেই চমকে উঠলাম। বৈঠকখানায় বেশ কিছু লোকের ভিড় করে বাজখাঁই গলার হুঙ্কার শোনা যায়। মহীন বলে—গদাই রে! রাসু ওস্তাদ এসে গেছে। গণ্ডেপিণ্ডে গিলবে আর চিৎকারের চোটে বাড়ি ফাটিয়ে দেবে।

—রাসু ওস্তাদ! আমরাও ঘাবড়ে গেছি। পটলাও মিন মিন করে। এমন সময় পিসেমশাই-এর হাঁক শোনা যায়—তোমরা এসেছ, এসো এসো।

পায়ে পায়ে ভিতরে গেলাম। পিসেমশাই পরিচয় করিয়ে দেন—ওই পটল আমার আত্মীয়। আপনাকে ওর কথাই বলছিলাম। সুন্দর গায়। ওখানের ভীম ভট্টাচার্য কণ্ঠসুধাকরের ছাত্র।

বিকট জালার মত দেহটা কলকাতার পাঞ্জাবির পেটটা মৈনাকের মত ঠেলে উঠেছে। হঠাৎ সিংহনাদ বের হয়—ভীম! উতো তাম্বাকু সাজতো ওস্তাদের। ফর্দ খাঁ সাহেবের নোকর ছিল। আর সাক্সাৎ চেলা হামি। হায় হায়। বেটা সব গলদ শিখালো তোকে। ফর্দু খাঁয়ের গানা—আহা!

—ক্যা বাবুজি!

তারপরেই হুলো বেড়ালের ল্যাজ-এর গোঁফ জোড়াটাকে উত্তর দক্ষিণে তখন আন্দোলিত করে কুলোর মত হাতের চেটো আসমানে তুলে, দুই হুলো বেড়ালের ক্লাইমেক্স ঝগড়ার মুখে যেমন ম্যাঁওতে করে গমক ছাড়ে, তেমনি কটা আওয়াজ বের করতে ঘরশুদ্ধ সকলে যেন রসে টইটম্বুর হয়ে ফেটে পড়ে—আহা! ক্যা বাৎ! লা জবাব ওস্তাদ!

এই হবে পটলার প্রতিপক্ষ। আমরা ঘরে এসে বসেছি। আড্ডার মানসিকতাও নেই। পটলা বলে—ও তো ভীম ওস্তাদের ডবল রে।

ফটিক বলে ওঠে—না! দিব্যি ভাবছিলাম খেয়ে-দেয়ে শান্তিতে দুদিন থাকব। তাও হল না। আবার ফিরে যেতেই হবে।

পটলা বলে—কাকগুলো আবার ঠোকরাবে। গান যা হল তাতে বুঝছি এখন প-প্রাণ বাঁচানো দায়।

আদরে কিছুটা ভাটা পড়েছে বুঝলাম। একসঙ্গে খেতে বসেছি রাতের বেলায়। বিরাট বারান্দায় আসন পড়েছে। পিসিমাও তদারক করছেন। তপস্বী মানুষ তাই সকলের সঙ্গে একাসনে বসেন না।

বিরাট খাগড়াই বগিথালার থাকবন্দি ঘৃতপক্ক লুচি, এক বাটি সোনামুগের সোনাবরণ ডাল, ওদিকে ভাজাভুজি, জামবাটিতে ঘনাবর্ত দুধ, সন্দেশ গোটাচারেক ইয়া সাইজের। আর একটা প্লাস্টিকের বালতিতে বোঁটাকাটা সরেশ আম ভেজানো। ওস্তাদজির জন্য মাংসও রয়েছে।

তার পরিমাণ প্রায় কিলোখানেক হবে। উনি আহারে বসেই ডালের বাটিতে আঙুল ডুবিয়ে পরখ করে দেখে গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন—ঘিউ কমতি কাহে মুখারজি?

ডালে ঘি কম হলে উনি নাকি সেবাই করতে পারেন না। এক বাটি ঘি আনা হল, উনি সেবাপর্ব শুরু করলেন। বলেন—ওস্তাদ বোলা গানা তানাকউব এসব মেহনত-এর কম বেটা। খানে হোগা! নেহিতো দম্ আয়েগা ক্যায়সে। হ্যাঁ লুচি বোলাও।

বইঘর.কম

দিস্তে দেড়েক লুচি, ওই জামবাটির মাল সব খালাস করে এবার দুধ সন্দেশ আমের বালতি নিয়ে বসেছেন।

পিসিমা বলেন—তোরা খাচ্ছিস না কেন? খা—। হাত পা পেটে সেঁধিয়ে গেছে ওই খাবার বহর দেখে।

কোনরকমে খেয়ে উঠলাম। আহারে সেই তৃপ্তি শান্তি আর নেই।

পিসেমশাই বলেন—কাল বিকালে তাহলে একটু আসর বসানো যাক ওস্তাদজি।

রাসু ওস্তাদও ঘাড় নাড়ে—হ্যাঁ। পরশু বহরমপুরে বড়া আসর আছে। কাল ছাড়া টাইম হোবে না।

পটলা মিইয়ে গেছে। হোঁৎকা বলে—তরা শুইয়া পড়। আমি আইতেছি। জোর খাওয়া হই গেল, দুডো হজমের বড়ি লাগবো। আইতেছি।

পটলার ঘুম আসে না। ও বলে—কা-কাল সকালেই চলে যাই। ওই ওস্তাদের সঙ্গে সমানে গান গাইতে হবে ওরে বাবা।

গদাই বলে—তবে গান গান করে পাগল হইছিলি কেন? কী শিখেছিস ভীমটার কাছে?

পটলা জানায়—ন-নেভার গান গাইবো। এই ন-নাক ক-কান মলছি।

হোঁৎকার দেখা নেই।

হলঘরের ওপাশের ঘরে ওস্তাদ শয়ন করেছেন। অবাক হয়ে দেখি হোঁৎকা ওই রাসু ওস্তাদের সঙ্গে রীতিমত ভাব জমিয়ে তার তালগাছের মত গোদা গোদা পা দুটো টিপছে, আর পাহাড়ের মত পড়ে আছে রাসু! হুঙ্কার ছাড়ে—জোরসে—আউর জোরসে দাবাও বেটা। হাঁ—থোড়া পানি তো পিলাও!

বশংবদ চাকরের মত হোঁৎকা খাবার জল এনে দেয় গ্লাসে। গর্জে ওঠে রাসু—উল্লু, গ্লাস ক্যা হোগা! সোরাই লাও।

অর্থাৎ গ্লাসে নয় পুরো কুঁজোটা তুলে বিশাল মুখগহ্বরে ঢক ঢক করে এক কুঁজো জল শেষ করে শূন্য কুঁজোটা ওর হাতে ফেরত দিয়ে বলে, দাবাও!

আবার দলাই-মলাই শুরু হয়।

দেখেশুনে পটলা বলে—দ্-দেখছিস হোঁৎকা ক্যামন ম-মীরজাফর। ওই ওস্তাদকেই খুশি করছে। ও ছ্-ছাড়বে আমাকে?

আমরাও হোঁৎকার এই বিশ্বাসঘাতকতায় অবাক হই। গদাই বলে—ওই-ই বোধহয় গান শিখবে ওস্তাদের কাছে। পটলা গর্জায়—হ জাহান্নামে যাক। ক্-কালই আমি চলে যাব। স্-সিওর!

ও চলে গেলে কোনো সুবাদে আর থাকব এখানে। এমন আম লিচু মাছ দুধ ছেড়ে গ্রামেই ফিরতে হবে ওই ভীম ওস্তাদ আর গির্দাবাবুর পাল্লার মধ্যে।

হোঁৎকা ফিরে এসে বলে—শুইয়া পড়।

আমরাও ওর সঙ্গে নন্‌কোঅপারেশন করে কথাই বললাম না।

কোথায় গভীর বনে হারিয়ে গেছে। বন কাঁপিয়ে গর্জন উঠছে। থরথর কাঁপছে চারিদিক। একটা বাঘ গর্জাচ্ছে আর সেই হুঙ্কারটা এবার সামনে এসে পড়েছে! চিৎকার করার চেষ্টা করি—দমবন্ধ হয়ে আসে। ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি তখনও সকাল হয়নি, ভোর হয়েছে। আর

ওই সিংহনাদ উঠছে ওদিকের ঘরে। পটলা, ফটিক জেগে উঠেছে। রাসু ওস্তাদ গলা সাধছে। যেন একপাল হুলো বেড়াল ঘরের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়েছে। মাঝে মেঘ গর্জনের শব্দ ওঠে।

পটল বলে—ওই গ-গান।

হোঁৎকা উঠে বসে ওই সিংহনাদ শুনে অবাক হয়ে বলে—হালায় এহনও চেল্লায় এত জোরে? এ্যাঁ।

...রাসু ওস্তাদ যেন পুরুষ-সিংহ।

সকালে গলা সাধার পর্ব শেষ করে এবার প্রাতরাশ নিয়ে বসেছে। গরম লুচি গণ্ডা পাঁচেক। গোটা আটেক ডিম—হাফ ডজন সন্দেশ আর দুই মগ চা।

এরপর তিনি নাকি সকালের রাগ 'বিলাসখানি তোড়ি' শোনাবেন। এরপর বিকালে বসবে আসল গানের আসর। হোঁৎকা গজগজ করছে। এদিকে আমাদেরও বেরুবার পথ নেই। আটকে গেছি। পটলা একবার বাড়ি যাবার কথা বলতে পিসেমশাই অবাক হন।

—সেকি! গান-টান হোক। এখন তো ছুটি—রাসু ওস্তাদও কাল রাত্রেই আবার ফিরে এসে এখানে কদিন থাকবে। কিছু আসলি জিনিস ওর কাছ থেকে নিয়ে নে পটল।

—দেখলি ক্যামন রেওয়াজি গলা! মেঘরাগ যা গায়—

পিসিমা আড়ালে বলেন—বাড়িতে তিষ্ঠোন দায় হয় বাবা। যা চিৎকার করে। গোয়ালে গরুগুলো ওই হাঁকাড়িতে ঘাবড়ে গিয়ে দুধ কমিয়ে দেয়। সেবার ওর গানের গুঁতোয় দুটো ধলাই ভয়ে পালাল। আজ তো গুপীনাথকে ডাক্তারের কাছে পাঠালাম। ওর কানের পর্দা বোধহয় ফেটে গেছে, খুব বেদনা হচ্ছে। তোর পিসেমশাইকে ওর নামে কিছু বললে—লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে। চুপচাপ থাক—খা—দা ভালো। তা নয় একি গান রে বাবা। ওসব গান শিখিস নে পটল।

পটল এবার ওই যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়। কিন্তু পথ কই। বাইরের ঘরে তখন আবার চিৎকার শুরু হয়েছে। বিকট মুখখানা শূন্যে তুলে কুকুরের কান্নার মত তীব্রস্বরে এবার সকালের রাগিণী ধরেছে রাসু ওস্তাদ—ওরই নাম নাকি বিলাসখানি টোঁড়ি।

হঠাৎ রাসু ওস্তাদের বিরাট দেহটা মুচড়ে ওঠে। বারকতক মুখ বিকৃত করে চাপা যন্ত্রণাটা সামাল দিয়ে আবার পুরোদমে একটা হুঙ্কার তান ছেড়েছে—এরপর হবে বজ্রতান—বাজ পড়ার গুরু গুরু তার শব্দ!

কিন্তু পেটের ভিতরটা পাক দিয়ে ওঠে। সেই তান আর শেষ করতে হল না। মনে হয় কাণ্ডটা এখানেই ঘটে যাবে। তানপুরা ফেলে লাফ দিয়ে উঠে কানে পৈতেটা জড়াতে জড়াতে চিৎকার করে ওস্তাদ—পানি! পানি দেও!

হোঁৎকা রেডি ছিল, ওস্তাদের জন্য জলভর্তি গাড়ুটা এগিয়ে দিতে সেটা নিয়ে বিশাল দেহ সমেত টলতে টলতে হাতির মত দৌড়ল রাসু ওস্তাদ পায়খানার দিকে। পায়খানার দরজাটা আড়-ভেজানো মত ছিল, তাড়াতাড়ি ঢুকে গিয়ে বিশাল পেটটা আটকে গেছে, ছাড়ানো যায় না। ওদিকে অবস্থা তখন সাংঘাতিক। টানাটানি করতে একটা পাল্লাই ছিঁড়ে পড়ল, সেদিকে খেয়াল নেই—ওস্তাদ পায়খানায় সেঁধিয়ে গেছেন।

...গান-আসর রইল পড়ে। খাওয়া-দাওয়া করার মত অবস্থাও নেই ওস্তাদের। বিরাট দশাসই চেহারা—বার-পাঁচেক ওই পায়খানায় যাতায়াত করে একেবারে ঘটোৎকচের মত

হয়ে পড়েছে। ভূষণ ডাক্তারও এসে কিসব বড়ি-টড়ি দিয়ে বলেন—দু'তিনটে করে একত্রে খান! ডোজ একটু বেশি লাগবে। কী খেয়েছিলেন কাল?

চিঁ চিঁ করছে রাসু ওস্তাদ। সেই বজ্রকণ্ঠ কোথায় মিলিয়ে গেছে। মিহি গলায় জানায়—কুছ জ্যাদা তো খাইনি। মামুলি খানা!

...লোকজন এসে গেছে। গানের আসর বসাবার মত অবস্থা নেই। ওস্তাদ ঝিমিয়ে নেতিয়ে পড়েছে। সকলে তার কুশল সংবাদ নিয়েই ব্যস্ত। ওদের ভাবনার সময়, পিসেমশাইও ঘাবড়ে গেছেন। গান আর হল না। আমরা সকলে প্রাণপণে ওস্তাদজির সেবা করে চলেছি। হোঁৎকা গোড় দাবাচ্ছে, পটলা পাখা নিয়ে জোর জোর হাওয়া করছে। আমিও ওই ভলেন্টিয়ার বাহিনীতে যোগ দিয়ে রাসু ওস্তাদের গুণমুগ্ধদের ভিড় সামলাচ্ছি। রাসু মুখুজ্যের ভালো নাম রসময় মুখোপাধ্যায়। আগে পশ্চিমে থেকেছে বহুকাল, কুস্তি লড়েছে সর্বাঙ্গে মাটি মেখে আর ছোলা বাদাম খেয়ে গলার স্বর নিয়েও কুস্তি করেছে। মুখে হিন্দি বুলি ছোটে। কিন্তু একদিনের পটকানিতে এখন চিঁ চিঁ করছে। —ওরে আর বাঁচব না রে। ওরে বাবা!

খাঁটি দেশজ মাতৃভাষা বের হচ্ছে!

বৈকালের দিকে একটু সামলাতে পারে। তবে খুবই দুর্বল—এমন সময় মহীনের সঙ্গে আলখাল্লাধারী বাঁকা পাকানো লাঠি হাতে লোকটাকে ঢুকতে দেখে চাইলাম। একমুখ দাড়ি, সাদা পাকা দাড়িগুলো যা ওর চেহারায় একটা সৌম্য ভাব এনেছে। গলায় ফটিকের মালা। সকলেই ওর দিকে চাইল। মহীন বলে—হাজিপুরের পীরবাবা, মহাপুরুষ। এদিকে এসেছিলেন নিয়ে এলাম। এর জলপড়ায় নাকি সব রোগ সেরে যায়।

পীরবাবা চারিদিকে চেয়ে দেখছেন। রাসু ওস্তাদ চিঁ চিঁ করে।

—সুস্থ করে দাও বাবা। কাল সদরে মস্ত আসর, গাইতে পারলে দক্ষিণা কিছু মিলবে। নামযশ হবে।

পীরবাবা হুঙ্কার ছাড়েন—জিন-পীর-হুম্‌দো-মামদোর নজর পড়েছে তোর উপর। চমকে ওঠে রাসু—হুমদো-মামদোর নজর পড়লে আর যে বাঁচব না বাবা। কী হবে?

পীরবাবা বলেন—মৎ ঘাবড়াও বেটা। আজ রাতটা একটু হুঁশিয়ার থাকবি। খবরদার—ওদের চটাস্ নে। তোর ওপর ওদের খুব রাগ। আমি গণ্ডি কেটে দিলাম—জলপড়া দিচ্ছি, মাথায় দিয়ে খেয়ে নিবি, ব্যস সব ঠিক হয়ে যাবে। ওরা বহুৎ খারাপ আছে—তবে আমি আছি। ভয় নাই।

রাসু ওস্তাদ মিইয়ে গেছে ভিজে পাঁপড়ের মত। আর হাঁকডাক নেই। পীরবাবা চলে গেলেন মন্তর-টন্তর পড়ে। আর মহীন এক ঘটি জল এনেছিল সেটাও পড়ে দিয়ে গেলেন। সকলেই ওর দিকে চাইল। রাসু ওস্তাদ জলপড়া মুখে দিয়ে মুখটা বিকৃত করে বলে—এত গন্ধ—ঝাঁঝ কিসের রে?

মহীন বলে ওঠে—মন্তরের তেজ ওস্তাদজি! তাই জলও অমনি ঝাঁঝাল হয়ে উঠেছে। গায়ে জল ছিটিয়ে দিতে একটা বোট্‌কা গন্ধ ওঠে।

রাসু ওস্তাদ বলে—আজ রাতটা তোরা এখানেই থাক বাবা! শুনলি তো পীরবাবার কথা! মাম্‌দো-হুম্‌দো ওরা সব পারে।

হোঁৎকা বলে—আমরা তো আছি ওস্তাদজি, ঘাবড়ান ক্যান। মামদো-হুমদোর কাৎ করি

দেবানে। আপনি আমাগোর মাথার মণি, আপনার ক্ষতি করতি দিমু না। হক্কলে তৈরি থাকস। বুঝলি।

আমরা ভলেনটিয়ার বাহিনীও তৈরি। পিসেমশাই বলেন—ওসব পীরবারা-ফীরবাবার কথা ছাড়ুন ওস্তাদজি। এই তো সুস্থ হয়ে উঠেছেন। হঠাৎ পেটটা খারাপ হয়েছিল ওষুধপত্র খেতে ঠিক হয়ে গেছে। তাহলে রাতে একটু বার্লি—

রাসু গর্জে ওঠে—ওসব খাই না। ক্ষুধাও পেয়েছে চিড়া দই ইত্যাদিই খাব। অবশ্য ওর খাওয়ার ব্যাপারে খ্যাতি আছে। পিসিমাও অবাক হন।

—সারাদিন দাস্ত হল, আবার এক গামলা চিঁড়ে এক হাঁড়ি দই খাবে, ফের রাতে যদি কিছু হয়!

কিন্তু রাসুই বলে ওঠে—কুছ হোবে না আমার। ওর চেয়ে বেশি খেয়েছিলাম সেদিন। বহুৎ জোর ক্ষুধা লেগেছে, আনুন। ল্যাংড়া আম ভি দেবেন।

ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে বসে ফুল ফর্মে আবার ওই এক গামলা ফলার মেখে কপাকপ গিলছে। আমরাও ঘাবড়ে গেছি। মহীন ইতিমধ্যে আমাদের দলে মিশে গেছে। মহীন বলে—কিৎসু হয়নি ওর।

হোঁৎকা চুপ করে থাকে। পটলা বলে—ও কাল গান গেয়ে ফিরে এসে আবার এখানেই থাকবে। এমন যযুতে খ্যাঁট ছেড়ে যাবে? আবার যদি গাইতে হয় আমাকে? কালই চলে যাই—কি বল!

পটলা ওকে ঝেড়ে-পুড়ে উঠে ওইভাবে বসে খেতে দেখে ঘাবড়ে গেছে। গদাই ধমকে ওঠে—বেচারি খাচ্ছে আর তোরা নজর দিচ্ছিস! খাক্!

...রাত্রি নেমেছে। রাসু ওস্তাদ আহার সমাধা করে এবার তামাক টানছে। পিসেমশাইও খুশি। যা হোক সেরে উঠেছে ওস্তাদজি, তাঁর ভাবনা গেছে। পিসেমশাই বলেন—তাহলে সদর থেকে কাল রাতের ট্রেনেই ফিরছেন। কদিন এখানে থেকে সুস্থ হয়ে যাবেন। পটল উনি ফিরে এলেই আসর বসানো যাবে। আমি বাইরের দু-চার জনকে খবর দিচ্ছি।

অর্থাৎ একবার ফাঁড়া কাটলেও রক্ষে নেই। আবার চক্রান্ত শুরু হচ্ছে। পটলা জবাব দিল না। মিন মিন করে। রাসু ওস্তাদ বলে ওঠে—হ্যাঁ। তাই হবে। ভীম ব্যাটা ক্যা শিখায়া দেখাঙ্গে। পুরা 'সা' লাগানে কা তমীজ নেই—ওস্তাদ বন গিয়া!

য্যাসান গুরু—ত্যাইসান চেলাই হবো মুখারজি বাবু!

আবার সুস্থ হয়ে উঠেই লম্বা লম্বা বাত শুরু করেছে। হোঁৎকা ওর পা টিপছিল। অন্য পা দিয়ে যেন একটা লাথি মেরে ছিটকে ফেলে দেবার মত ভঙ্গিতে গর্জন করে রাসু ওস্তাদ—জোরসে দাবাও। উল্লু কাঁহিকা।

রাত হয়ে গেছে। পিসেমশাইও পীরবাবার কথাটা শুনেছেন। তাই বলেন—ওরাও হলঘরে এদিকেই শোবে আজ। একটু সজাগ থাকবেন ওস্তাদজি।

রাসুরও মনে পড়ে পীরবাবার কথা। মাম্‌দো-হুমদোগুলো বেজায় পাজি। তাই একটু ঘাবড়ে গেলেও বলে সে—ফালতু বাত নিয়ে ঘাবড়ে যাবেন না। বলছেন—বাছারা শোবে ওখানে, ঠিক আছে।

ঘুমিয়ে পড়েছি হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়, জানলা দিয়ে লম্বা একটা

হাত মত ঢুকেছে ঘরের মধ্যে। নড়ছে লগার মত হাতটা ঘরের মেজেতে। বিরাট দেহ নিয়ে রাসু ওস্তাদ ছোটখাটো রোলারের মত গড়াগড়ি খাচ্ছে আর চিৎকার করে—ওরে বাবারে। ওরে—

কে যেন হাঁড়ির মধ্য থেকে বের করা গম্ভীর খোনা খোনা স্বরে শাসায়—তোঁর গানের চোটে সামনের তেঁতুল গাছের বাসা ছেড়ে পালাতে হয়েছে। তাই গলা টিপে শেষ করব আজ।

...খট খট শব্দ ওঠে, যেন হাড় কঙ্কালের দুটো হাত ওকে ধরার চেষ্টা করছে। একটা ঝন্ ঝন্ গোঁ গোঁ শব্দ ওঠে। রাসু ওস্তাদ বলে—আর এখানে গান গাইব না। ওস্তাদের দিব্যি, মা কালীর দিব্যি!

—এ্যাঁও!...

ভূত-প্রেত কিনা—তাই ঠাকুর দেবতার নাম শুনে গর্জে ওঠে। শোঁ শোঁ ঝড় বইছে। বিচিত্র কাণ্ড দেখে খাটের তলায় ঢুকে ঠক ঠক করে কাঁপছি—ওদিকে রাসুর বিশাল দেহটা গড়াগড়ি খেতে খেতে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে একেবারে থেমে গেল।

পিসেমশাই, ওদিক থেকে গবু চাকর—মহীনও এসে পড়েছে হ্যারিকেন নিয়ে। ওদের দেখে খাটের তলাকার নিরাপদ আশ্রয় থেকে বের হলাম। পিসেমশাই বলেন—জল আন—পাখা কর। মুখে চোখে জল দে ওস্তাদের।

কোনরকমে একটু সুস্থ হতেই রাসু ওস্তাদ চোখ দুটো ছানাবড়ার মত করে এদিক ওদিক চেয়ে বলে—বাঁচান মুখারজি বাবু। একসাথে মাম্‌দো-হুমদো সব এসেছিল। ইয়া লম্বা হাত—হাড়-এর মত শক্ত! বলে কিনা—গলা টিপে শেষ করে দেবে, পাকড়ে ছিল প্রায়! উঃ—মা কালী রক্ষা করেছেন। এখানে আর থাকবো না বাবুজি। বলেছে—ফিন দেখলে এবার জানসে খতম করে দেবে। অফ্ বাপ্! পানি—থোড়া পানি।

এক ঘটি জল নিয়ে কোঁও কোঁও করে গিলে বিকট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসল। মহীন পীরবাবার জলপড়া ছিটিয়ে দেয় সর্বাঙ্গে। এর জামা কাপড়ও ভিজে গেছে সেই পুণ্য নীরে। ঝাঁঝাল তীব্র গন্ধ ওঠে।

রাসু ওস্তাদ রাতটা জেগেই বসে থাকে। ভয়ে যেন কাঁপছে সে। আমরাও ঠায় বসে আছি ওকে পাহারা দিয়ে যাতে আর মাম্‌দো-হুমদো না আসে।

...ভোরেই ফার্স্ট ট্রেন। রাসু ওস্তাদ বলে—এই ট্রেনেই চলে যাব মুখারজি বাবু। আয় বাপ্।

মাম্‌দো-হুমদোর সেই তর্জন-গর্জনটা মনে পড়তে ভয়ে সিঁটিয়ে যায় লোকটা।

মহীন, ওদের চাকর গবু, আমরা কজন মিলে ঘিরে নিয়ে চলেছি ওস্তাদকে ইস্টিশানের দিকে। তখনও ঠিক ফর্সা হয়নি। পাখিরা কলরব করছে। এদিকে ওদিকে সাবধানী দৃষ্টি মেলে চলেছে রাসু ওস্তাদ। যেন মাম্‌দো-হুমদোরা তাক পেলেই তার ঘাড় মটকাবে এবার।

ট্রেনে উঠে রাসু ওস্তাদ এবার দম ফেলে। এ যাত্রা যেন প্রাণে বেঁচে গেল। বাড়ি ফিরে আসছি। এবার হোঁৎকা বলে—পটলা যুৎ করে চা খাওয়া। তর জন্যে যা করছি ফ্রেন্ডের জন্য তা কেউ করেনি কইলাম।

ওর দিকে চাইলাম—কেন রে? কি এমন রাজকাজ করলি?

হোঁৎকা জবাব দিল না, মিটি মিটি হাসছে। পকেট থেকে কাগজের মোড়কটা বের করে বলে—এটা কি কদিন?

সাদা পাউডারটার দিকে চেয়ে থাকি। হোঁৎকা বলে ওঠে ম্যাগ্‌সালফ্। জোলাপ কয় এরে। হি-হি হেই রাতে ওস্তাদের জলের কুঁজায় এক খামচা ফেলি। পরদিন দেখলি খেল খান্। ছ-সাতবার পায়খানায় সেই বাছাধন কাৎ! তবুও সাঁঝবেলায় খাতি দেখি মতলবটা করলাম কি রে মহীন!

মহীনের দিকে চাইলাম। সেও ওস্তাদের গানের গুঁতোয় অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাই ওই পীরবাবা সাজিয়ে এনেছিল তাদের ক্লাবের মদনদাকে। হুম্‌দো-মাম্‌দোর বুদ্ধিটা ওরই। আর রাতের বেলায় বাকি কাজটা সেরেছিল গদাই আর হোঁৎকা। হুম্‌দো-মাম্‌দোর ভূমিকা দুটো তারা দুজন সুন্দর অভিনয় করেছে বাঁশের হাত তৈরি করে।

হোঁৎকা বলে—পিসেমশাইরে কোস না কিছু।

অবশ্য ব্যাপারটা পিসিমা কিছু শুনেছেন, অনুমানও করেছেন। তাই বাড়ি ঢুকতে বলেন মহীনকে—ঘটিতে কি ছিল? জলপড়া না অন্যকিছু! যা বোট্‌কা বিশ্রী গন্ধ। ওই খাওয়ালি ওস্তাদকে!

হোঁৎকা বলে ওঠে—গাড়োলের পেচ্ছাব পিসিমা। জ্বর-টুর হলে কবরেজ মশাই খেতে দ্যান, ভালো জিনিস। পিসিমা অবাক হয়ে চাইলেন।

—সে কি রে! তাহলে মাম্‌দো-হুম্‌দো এসব—

মহীন বলে—ওসব কথা থাক মা। ওই গাঁক-গাঁক আওয়াজে পাড়াশুদ্ধ লোক ক্ষেপে উঠেছিল। পড়াশোনাও করার যো ছিল না। তাই এদের নিয়ে ওস্তাদকে একটু টোটকা দাওয়াই দিলাম। এখন খিদে লেগেছে, খেতে টেতে দাও তো। কাল থেকে যা ধকল চলছে। উঃ!

খেতে বসেছি। হোঁৎকা বলে—দিনকতক যুৎ করি খাই ল পটলা। লাইন কিলিয়ার কইরা দিছি তর। অল কিলিয়ার!

কদিন পর আবার নিশ্চিন্ত মনে এবার খেতে বসেছি। পিসিমাদের গ্রামটা সত্যিই মনোরম। খাবার-দাবার মেলে, ঝামেলা নেই। ভীম ওস্তাদ গির্দাবাবুরা কেউ নেই এখানে। মায় এখানের কাকগুলোও বেশ ভদ্র, পটলাও নিরাপদে মাথা উঁচু করে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবছি দু-চারদিন থেকেই যাব এখানে।

পটলার দেবদর্শন

পটলা সেদিন ক্লাবের মাঠে বসে আগামী দিনের ক্লাবের শিল্ড ফাইনাল নিয়ে বেশ গভীর আলোচনায় বসেছে। আমাদের 'পঞ্চপাণ্ডব' ক্লাবের মধ্যমণি পটলা, বনেদি পরিবারের একমাত্র বংশধর। শহরে তার ঠাকুরমার অনেক বিষয়আশয়। বাবার একটা বড় কারখানা। পটলাই তাদের এই মাঠটা ক্লাবকে দিয়েছে। না হলে এতদিনে এখানে থাকত পটলার বাড়ি।

সবকিছু নিয়ে পটলার জন্য এই পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের এত রমরমা। ওর মাথায় কখন কী আইডিয়া গজগজ করে পটলা নিজেও জানে না। তার থেকেই হয় যত বিপত্তি। আর সেসব ঝামেলা সামলাতে হয় আমাদের ক'জনকে।

ফুটবল সেক্রেটারি হোঁৎকা বলল, "শিল্ড ফাইনালে এবার প্রেস, টিভির লোকজনদেরও আনতে হইব। ক্লাবের পাবলিসিটি চাই।"

পটলা বলল, "তার চেয়ে ভালো গঠনমূলক কাজও তো করতে হবে। সেই কাজের প্রোগ্রামটাই আমি করে ফেলেছি।"

পটলা উত্তেজিত হলে ওর জিভটা মাঝে-মাঝে আলটাকরায় সেট হয়ে যায়। তখন তোতলামি শুরু হয়।

গোবরা বলল, "কী প্রোগ্রাম?"

পটলা বলল, "খবরে শুনেছিস তো, এবার বন্যায় অনেক গ্রাম জলে প্লাবিত হয়েছে। কত ঘর-বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। মানুষ বানভাসি হয়েছে। নদীর বাঁধ, রাস্তাঘাট ভেঙে গিয়েছে। খাবার নেই, জল নেই, আশ্রয় নেই। তাই এই বন্যাত্রাণে আমরাও কাজ করব। করতে হবে। আর তোদেরও এর সঙ্গে থাকতে হবে!" পটলা বেশ আবেগতাড়িত হয়েই কথাগুলো বলে চলল। পটলা আরও বলল, "চল, এখন থেকেই আমাদের কাজে লেগে পড়তে হবে। জামা-কাপড়, চাল, টাকা, সব জোগাড় করতে হবে। আমি ঠাকুরমাকেও বলব, কিছু টাকা দেওয়ার জন্য।"

ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ফটিকও প্রস্তাবটা লুফে নিল। সে বলল, "আমি ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে একটা গান লিখে দল করে ত্রাণ সংগ্রহে বেরোব। দেখবি কী রকম সাহায্য পাবি।"

ফটিক ইতিমধ্যে গান লিখে দল তৈরি করে ফেলল। ক্লাবের ছেলেরা এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবাই মিলে ফেস্টুন হাতে শহরের পথে-পথে, পাড়ায়-পাড়ায়, অলিতে-গলিতে ত্রাণের জন্য কাজ শুরু করে দিল।

'ভিক্ষা দাও গো নগরবাসী
ভিখারি এসেছে দুয়ারে,
যাহা দিবে তাই হাসি মুখে নিব

আর্ত বন্ধু জানাবে প্রণাম
যারা ভাসছে আজ অকূল পাথারে।'

শেষ পর্যন্ত তাদের গানের গুঁতোয় হোক বা মানুষের ভালোবাসায়, বেশ ভালো ত্রাণই জোগাড় করল ওরা। ওদিকে পটলার ঠাকুরমাও বেশ ভালো টাকাই দিলেন।

পটলা বলল, "এবার শীতলপুরে যেতে হবে। ওখানে আস্তানা গেড়ে রিলিফের কাজ শুরু করতে হবে।"

শীতলপুর সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। পটলার চেনা এখানকার স্কুলের শিক্ষক মদনবাবুর সাহায্যে নৌকো করে ত্রাণের জিনিসপত্র নিয়ে বেশ খানিকটা জল, মাঠ-প্রান্তর পেরিয়ে শীতলপুরের গ্রামে এলাম। সারা গ্রামটাই জলের তলায় রয়েছে। বাড়ি, বিশেষ করে মাটির বাড়িগুলো ভেঙে গিয়েছে। কোথাও ঘরের চালা উপড়ে পড়ে আছে। যেখানে জমি একটু উঁচু, মানুষ সেখানেই আশ্রয় নিয়েছে। কেউ বা আশ্রয় নিয়েছে বাঁধে। কোনওরকমে ছেঁড়া চট, বস্তা, প্লাস্টিক টাঙিয়ে মাথার ছাদ বানিয়ে রয়েছে। মানুষ, কুকুর, গোরুর সহাবস্থান।

মানুষের এই বেদনার ছবি আমাদের মনেও বেদনা জাগাল। অবশ্য যা এনেছি তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। তবে পটলা বলল, "আরও জিনিস আসবে কয়েকদিনের মধ্যে।"

পটলা ও তার টিম এখানে এসে মদনবাবুর সব রকম সাহায্যই পেয়েছে। শীতলপুরের এই অঞ্চলে প্রায় সব মাঠ-জমিই মদনবাবুর দখলে। তিনি যেন এই অঞ্চলের জমিদার।

চারদিকে শুধু জল, দূরে বাঁধ। রাস্তায় পড়ে আছে শত শত মানুষ। এদিকে বিশাল মন্দির, মন্দিরের পাশেই একটি যাত্রীনিবাস। সেখানে ভক্তদের জন্য এলাহি থাকার বন্দোবস্ত। কিন্তু এখানে বানভাসি জনতার প্রবেশ নিষেধ।

আমরা কয়েকজন পটলা, হোঁৎকা, ফটিক, গোবরা, মদনমাস্টারের দু'-একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয়ে থেকে কাজ শুরু করেছি। দিনভর ধকল গিয়েছে, তাই আজ একটু বিশ্রাম নিয়েই কাল থেকে কাজে লেগে পড়তে হবে।

পাশেই মন্দির, সন্ধে থেকেই ভক্ত সমাগম শুরু হল। মন্দিরে আরতির সময় হয়েছে। এখানে দরিদ্র, বানভাসি জনতার কোনও চিহ্নই নেই। ওদিকে সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। পাশে গৌর-নিতাই। সুগন্ধী ধূপ জ্বলছে। মন্দিরে নিত্যদিন নাম-সংকীর্তনের ব্যবস্থাও রয়েছে।

মন্দিরের অধ্যক্ষ ওদিকে বিশেষ আসনে বসে আছেন। বেশ নধর দেহ, চাকচিক্যও রয়েছে চেহারায়। মন্দিরে যারা রয়েছে সবাই চোখ বুজে নাম জপ করছে। তাদের চেহারাও বেশ চিকন। ওদিকে বড়-বড় পাত্রে রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশে ভালো মানের প্রসাদ চড়ানো হয়েছে। কোনও পাত্রে বেশ ফোলা-ফোলা লুচি-তরকারি, কোনওটায় রসগোল্লা, মিষ্টি, কোনওটায় বেশ প্রমাণ সাইজের ফলমূল।

আরতির পর একজন ভক্ত আমাদের বলল, "মহারাজ আপনাদের এখানে থাকতে বারণ করেছেন।"

দিনভর আমাদের ধকল গিয়েছে। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, খাওয়াদাওয়াও ঠিকমতো হয়নি। আমাদের মধ্যে গোবরা একটু ভোজনবিলাসী। সে এর মধ্যেই সব দেখে এসেছে।

গোবরা বলল, "যা খুশবু উঠেছে প্রসাদের, আর সামলানো যাচ্ছে না। পেটে ইঁদুর দৌড়চ্ছে। চল, ঠাকুরের দয়ায় প্রসাদ ভালোই জুটবে।"

প্রসাদ নেওয়ার জন্য আমরা যখন গেলাম, দেখি দু'-তিনজন মহারাজ সেখানে রয়েছেন। আমাদের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপাদমস্তক জরিপ করে এক মহারাজ বললেন, "এই পবিত্র দেবভূমিতে, এই অচেনা মানুষদের অযথা ভিড় করা ঠিক নয়। তাতে দেবতার শান্তি বিঘ্নিত হয়। ওরা কাল থেকে এখানে যেন ভিড় না করে, তা হলে ওদের এখানে ঠাঁই হবে না।"

মহারাজের কথা শুনে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। দেবতার নাম করে এঁদের পাষণ্ডের মত ব্যবহার।

পটলা বলল, "আসলে আমরা এখানে এসেছিলাম ত্রাণের কাজে। পাশে মন্দির দেখে তাই...!"

মহারাজ পটলার কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "তোমরা জিনিসপত্র নিয়ে ওই বাঁধে, না হয় পথের ধারে গিয়ে বিলিয়ে দাও। এখানে বেশি ভিড় কোরো না।"

এবার হোঁৎকা তার বাঙাল ভাষায় কী যেন বলতে গেল, মহারাজ বললেন, "বেশি কথা বোলো না। যা বললাম, তাই করো। না হলে বিপদ হতে পারে। জয় গুরু, জয় নিতাই, জয় গৌর!"

আমরা দেখলাম, ঠাকুরের নামে নিবেদন করা প্রসাদের পাত্রগুলো আমাদের চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে চলে গেল। একটা লুচির টুকরোও আমাদের দেওয়ার কথা কেউ ভাবল না।

আমরা চলে এলাম। হোঁৎকার ব্যাগে শুকনো মুড়ি ছিল, তখন সেটাই আমাদের খাদ্য। বাধ্য হয়েই পেটের জ্বালা মেটাতে লুচি, মালপোয়া সাঁটাতে না পেরে শুকনো মুড়ি চিবোতে-চিবোতে আমাদের আস্তানায় ফিরে এলাম। রাতে একটা চালার ঘরে কম্বল পেতে আমাদের বিছানা।

পটলা বলল, "মন্দিরের ওই মহারাজদের দেখলি? এঁরা রাধাকৃষ্ণের পুজো করেন, এই এঁদের ব্যবহার? যারা অসহায়, বানভাসি মানুষদের সাহায্য করতে এসেছেন, তাদেরকেই বলেন কিনা পাপী? এখানে তাদেরই আসা বারণ?"

গোবরা বলল, "নিজেরা খেয়েদেয়ে সুখে আছেন, আর আমাদের বলেন কি না পাপী, প্রসাদ দেওয়া যাবে না?"

হোঁৎকা বলল, "মহারাজই এক নম্বরের বদমাশ। ভণ্ড গুরু সেজে চ্যালাদের কাছে ভগবান হতে চান।"

পটলা বলল, "মহারাজকে একটা শিক্ষা দিতে হবে।"

গোবরা বলল, "গ্রামের হাজার-হাজার মানুষ বানভাসি হয়ে উপোসে মরছে, আর নিজেরা মণ্ডা, লুচি খাচ্ছেন!"

এর পর দুঃখ-কষ্টে, মশার কামড়ে আমাদের কয়েকদিন কেটে গেল। আমরা মন্দিরের সেসব তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে রিলিফের কাজে লেগে পড়লাম।

ক্রমশ বানের জল নামছে। মানুষও যে যার ঘরে ফিরছে। মানুষ আবার নতুন করে মাথার ছাদ তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সারাদিনের ক্লান্তি, পরিশ্রমের পর সেদিন রাতে ঘরে ফিরেছি। সারাদিন ত্রাণের কাজে এদিক-ওদিক থেকে বেশ কিছুটা চাল-ডাল জোগাড় হয়েছে।

বইঘর.কম

ওদিকে মদনবাবুও সদরে গিয়েছেন কী কাজে। অগত্যা আমাদেরই রান্না করে খেতে হবে। সেদিন রাতে আশপাশ থেকে খড়কুটো জোগাড় করে চালে-ডালে একসঙ্গে রান্না করে কোনওরকমে মশার কামড় খেয়ে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

পরের দিন সকালে বেশ দেরিতেই সকলের ঘুম ভাঙল। পাশেই মন্দির, কিন্তু আমাদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। মন্দিরের বাবাজিরা দেবতার পুজো করলেও দরিদ্রনারায়ণ সেবার ধার ধারেন না। ওঁরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। এদিকে আমাদের পেটে ছুঁচো ডন মারতে শুরু করেছে।

পটলা বলল, "সঙ্গে চাল-ডাল তো আছে, কিন্তু এমন জলের রাজ্যে শুকনো কাঠ কোথায় পাওয়া যায়? কাঠ না হলে তো খিচুড়িও বসানো যাচ্ছে না।"

এদিকে খিদেও পেয়েছে জোর। ওদিকে মন্দিরে বাবাজিরা দুপুরের পরমান্ন খেয়ে সুখনিদ্রা দিচ্ছেন। আমাদের মধ্যে হোঁৎকা এসে খবর দিল, "কাঠ আছে, তবে মন্দিরের রান্না করার কাঠ।"

আমরা সকলে খুব সাবধানে মন্দিরে ঢুকে দেখলাম, উপরে কাঠ সংগ্রহ করে রাখা আছে। কিন্তু কিছুতেই লাফিয়েও আমরা সেই কাঠের নাগাল পেলাম না। হঠাৎ দেখি, পটলা একটা লাঠি তুলে ধরে খোঁচাতেই কালি-ঝুলি মাখা বেশ কিছু কাঠ ঝরঝর করে ঝরে পড়ল।

গোবরা বলল, "ছেড়ে দে পটলা, এতেই হবে।"

আমরা চারদিকে তখনও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি। পাছে কেউ ধরা না পড়ে যাই! পটলা দেখল, দু'হাত তোলা গৌরাঙ্গের মুখে-মাথায় কাঠে লেগে থাকা ঝুল-কালি লেপ্‌টে গিয়েছে।

এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি, কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। গোবরা বলল, "মহারাজরা লুচি-মণ্ডা খেয়ে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন। চল, আমরা কেটে পড়ি।"

এর পর আমরা রান্নার কাজ শুরু করলাম। হাঁড়িতে খিচুড়ি ফুটছে। ক্ষুধার্ত আমরা এর মধ্যে কলাপাতা পেতে বসে পড়েছি। এমন সময় বাবাজিদের দু'জন এদিকে এসে সেই কাঠগুলো দেখেই গর্জে উঠলেন, "দেবতার ভোগের জন্য কাঠ তোমরা কোথায় পেলে? পবিত্র অশ্বত্থ কাঠ?"

ওঁদের চিৎকারে তখন মঠ থেকে আরও দু'-তিনজন এসে হাজির হলেন। তাতে গর্জনও বেড়ে গেল। এদিকে খিচুড়ি তখন তলায় ধরে গিয়েছে। পোড়া-পোড়া গন্ধ ছড়াচ্ছে, সেদিকে কারও নজর নেই।

একজন বললেন, "মন্দিরের পাশে এসব অবিচার? এখনই এখান থেকে বেরোও।"

চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে প্রধান মহারাজ এসে হাজির হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এ কাঠ পেলে কোথায়? জবাব দাও।"

পটলা বলল, "কাঠের অভাবে রান্না করতে পারিনি। উপোস করে থাকতে হবে। এমন সময় একজন সুন্দর দেখতে তরুণ এসে বলল, 'কাঠ পাচ্ছ না? চলো, আমি কাঠের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' "

মহারাজ বললেন, "সুন্দর দেখতে তরুণ!"

পটলা বলল, "হ্যাঁ, সেই ছেলেটিই তো নিজে এসব কাঠ আমাদের এনে দিয়ে বলল, 'নাও

কাঠ, রান্না করো।' কাঠগুলো রেখে দিয়ে সে ওদিকে চলে গেল। বেশ সুন্দর চেহারা। লম্বা চুল, পরনে ধুতি, গলায় চাদর।"

মহারাজ বললেন, "থামো তুমি। এখানে এমন তরুণ কেউ নেই।"

পটলা বলল, "তা জানি না। তবে ওদিকে চলে গেল...!" পটলা মন্দিরের দিকে হাত তুলে দেখাল।

মহারাজ বললেন, "মন্দিরের দিকে চলে গেল? চলো তো!"

সাধুরা আমাদের নজরবন্দি করে নিয়ে চললেন। ওদিকে কিছু দূরেই নিতাই-গৌরের দু'হাত তোলা মূর্তি। সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিও রয়েছে।

আমরাও যেন গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলাম। দেখি, কাঠের কালি-ঝুলি গৌরাঙ্গের মূর্তির সারা শরীরে, এমনকী মুখেও লেপ্‌টে আছে। সেই মূর্তিটার দিকেই আঙুল তুলে পটলা বলল, "ঠিক ওইরকম দেখতে।"

সবাই স্তব্ধ। মহারাজ একবার আমাদের দেখছেন, আর-একবার গৌরাঙ্গের মূর্তির দিকে...।

এদিকে আমাদেরও ভয় করছে। কে জানে, মহারাজ কী বলবেন!

হঠাৎ মহারাজ সেই ঝুলমাখা মূর্তির সামনে সটান গড়িয়ে পড়ে আর্ত কণ্ঠে বললেন, "ওরে, তোরা সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন পেয়েছিস! প্রভু এই অধমকেও দর্শন দাও, দর্শন দাও প্রভু!"

মহারাজ একবার সেই ঝুলমাখা গৌরাঙ্গের পায়ে মাথা ঠেকাচ্ছেন, আর আমাদের বলছেন, "তোরা ভাগ্যবান! তিনি নিজে তোদের সেবা করেছেন। ওরে, আমি তোদের চিনতে পারিনি, অবজ্ঞা করেছি! আমাকে ক্ষমা করো প্রভু! মহা ভুল হয়ে গিয়েছে। জয় নিতাই-গৌর, রাধেশ্যাম।"

ওদিকে অন্য মহারাজরাও ততক্ষণে ছুটে এসেছেন। তাঁরাও মহারাজের ভাবাবেগ দেখে ভগবানের নামে নাচতে শুরু করলেন। আমরা ওঁদের নাচ দেখে হতবাক।

ওদিকে তখন খিচুড়ি পোড়ার গন্ধ বেরোচ্ছে।

মহারাজ সঙ্গীদের বললেন, "ওরে, তোরা দেখছিস কী? বাবাদের সেবার ব্যবস্থা কর। জয়-নিতাই!"

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পরই দেখি, আমাদের সামনে দেবতার সেই পরমান্ন এনেছেন বাবাজিরা। এতদিনের দেখা সেই ফুলো-ফুলো লুচি, মণ্ডা, ভালো ছানার রসগোল্লা, সন্দেশ।

আমাদের সেবার কোনও ত্রুটি হল না অতিথিবাসের ঘরও খুলে দেওয়া হল।

মহারাজ এবার অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'নাও, এবার তোমরা মঠের অন্নসেবা করো!"

আমাদের থাকার জন্য অতিথিশালা, নরম বিছানা সব ব্যবস্থাই পাকা। পটলা বলল, "তা হলে অসাবধানে গৌরাঙ্গের শরীরে ঝুল-কালি লেগে ভালোই হল!"

হোঁৎকা বলল, "কালই কাইট্যা পড়। নাইলে বাবাজি যদি কেসটা জাইনা ফেলেন, প্রবলেম হইব। রক্ষা নাই।"

আমরা অবশ্য পরের দিনই শীতলপুর থেকে চলে এলাম।

পটলাকে নিয়ে প্রবলেম

সেদিন কুলেপাড়ার আমাদের ক্লাব-এর মাঠে প্রতিদিনের মত আমরা সাগ্রহে পটলার প্রতীক্ষা করছি। কিন্তু পটলার দেখা তখনও মেলেনি।

পটলা মাঝে মাঝে ডুমুরের ফুলের মতই অদৃশ্য হয়ে যায়। কারণও আছে।

পটলা মস্ত বড় ঘরের ছেলে। তার বাবা, কাকাদের নানা কারখানা, করাতকল, তেলকল, মস্তবড় ওষুধের দোকান, কি নেই। বড় রাস্তার ওদিকে তাদের বিশাল বাড়ি—ওদিকে পুকুর, তার ঘাটও বাঁধানো, পাশে মন্দির তার মেজেতে মার্বেল পাথরে মোড়া, একদিকে রকমারি ফলের বাগান।

বাড়িতে কর্ত্রী বলতে তার ঠাকমাই।

আর পটল সেই বড় বাড়ির একমাত্র সন্তান, শুধু সন্তানই নয়, বংশধর—অর্থাৎ কুলপ্রদীপই।

সুতরাং পটলার দাম এমন হবেই। তবে আমাদের পাঁচজনের মধ্যে খুবই মিল, যদিও অবস্থার অনেক ফারাক তবুও আমাদের বন্ধুত্বের বাধা হয়নি।

আর তাই কুলেপাড়া-বেলেঘাটার তামাম মানুষ আমাদের পঞ্চপাণ্ডব বলেই জানে। আর আমাদের ক্লাবের নামও রেখেছি ওই 'পঞ্চপাণ্ডব' নামে।

আর পটলা তার ক্যাশিয়ার কাম প্রেসিডেন্ট। অবশ্য সেক্রেটারি আমাদের মধ্যে কেউ হয়, দলে আমরা কুল্যে পাঁচজন।

পটলা আমাদের মধ্যমণি।

তারপরই দলের সেক্রেটারি এখন বৃষকেতু ঘোষ, আমরা তাকে হোঁৎকা বলেই জানি। ওই বিকট নামটা স্কুলের খাতাতেই আছে।

ওর পিতৃদেব কোনোকালে পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে এই মুলুকে আসছিলেন জীবিকার সন্ধানে, তারপর দেশবিভাগের পর দেশ জুড়ে এখানেই রয়েছেন সপরিবার। হোঁৎকার জন্মকর্ম কলকাতাতেই।

কিন্তু বাড়িতে মা-ঠাকুমারা পূর্ববঙ্গের ভাষাতেই কথা বলে, তাই হোঁৎকার মাতৃভাষা এই খাঁটি বাঙাল ভাষাই।

ওই ভাষাতেই বাক্যালাপ করে সে। ইদানীং তাকেই সেক্রেটারি করেছি, বেশ হাট্টাকাট্টা চেহারা আর মাথায় নানা রকম ফন্দি, বুদ্ধি যেন কিলবিল করে। যে কোনো বিপদ সমস্যা হোক হোঁৎকা ক্লিন বের হয়ে আসবে।

মনে হয় সৃষ্টিকর্তা ওকে সৃষ্টি করার সময় ভিতরের খোলটা বেশ বড়সড় করে ফেলেছিলেন। সেই খোল ঠিকমত ভর্তি না হলে হোঁৎকার মেজাজ বিগড়ে যাবে। আর তাই

আহার এবং আহার্যের প্রতি হোঁৎকার সহজাত আকর্ষণ বেশিই রয়ে গেছে।

আমাদের কেন পটলাকেও ওই হোঁৎকার বিশেষ জলযোগের ব্যবস্থা রাখতেই হয়, না হলে ওর পকেটে একটা পদত্যাগপত্র সব সময়েই মজুত থাকে। সেটা পেশ করে ক্লাব থেকে চলে যাবার ভয় দেখায়।

ওকে ছাড়াও যাবে না—তাই ওর জন্য পটলা সব ব্যবস্থাই রেখেছে। ঝালমুড়ি-ফুচকা-আলুকাবলিওয়ালাও বাঁধা আছে। আর আছে নকুলের দিলখুশ কেবিন।

নকুল পটলাদের একটা বাড়ির নীচে ভাড়া নিয়ে ওই চায়ের দোকান চালায়। পটলার সেখানে নিজস্ব অ্যাকাউন্ট আছে। চা-চপ-কাটলেট-টোস্ট এসবের যোগান আসে ওখান থেকেই। আমরাও ভাগ পাই।

আমাদের মধ্যে গোবর্ধনই সবচেয়ে বেশি শক্তিধর, বিরাট বাহু—মাসলগুলোও গুলির মত, কালো গোলগাল চেহারা।

ওর মামার এখানে বিশাল কুমড়োর আড়ত। এখানে খালের ধারে টিনের প্রকাণ্ড গুদাম। সেখানে থরে থরে সাজানো খোল থাকে ফুটবলের সাইজের বিশাল কুমড়ো। আর ওদিকে গাদা করা আছে নধর পুরু চালকুমড়ো—তাও নানা সাইজের।

কুমড়োর এত সাপ্লাই আসে তারকেশ্বর-জাঙ্গপাড়া, বর্ধমান এসব জায়গা থেকে। সারা বছর ধরেই স্রেফ কুমড়ো সাপ্লাই করে গোবরার অর্থাৎ আমাদের শ্রীমান গোবর্ধনের মামা লাল হয়ে গেল।

আর অন্যতম সভ্য ফটিক। শীর্ণ চেহারা—মাথায় বাবরি চুল, পিছন থেকে দেখলে ছেলে কি মেয়ে চিনতে ভুল হবে। ক্লাবের দরমার ঘরে বসে হারমোনিয়াম নিয়ে গলাই সাধে। কোন্ ওস্তাদের কাছে নাকি ক্লাসিকাল গান শিখছে। সেই গানের একটা কলিই বছরখানেক ধরে সাধছে ফটিকচন্দ্র।

—সইয়া না মারো গুলারিয়া-

এই সইয়া আর ওই লাইনটাকে নিয়ে ফটিক যেন চচ্চড়ি বানিয়ে ফেলেছে। বলে সে—রাগসঙ্গীত, চর্চা না করলে হয় না।

ওর গান শুনলেই রাগে আমাদের হাড়পিত্তি জ্বলে ওঠে, পটলা বলে—র-রাগ হয় বলেই তো ওকে বলে র-র—

পটলার ওই দোষ।

মাঝে মাঝে ওর জিভটা 'বিট্রে' করে। কেমন বেমক্কা আলটাকরায় আটকে যায় আর বেশ কিছুক্ষণ ধরে রেকর্ডে 'পিন' আটকে গেলে যেমন একটা শব্দই বারবার বেজে ওঠে তেমনি সেই কথাটাই 'রিপিট' করতে থাকে। কোনোমতে জিভটা ফ্রি হলে আবার অন্য কথায় আসে। তবে, গোঁত খাওয়ার চান্স থেকেই যায়।

আমিই ওই দলের মধ্যে নিরীহ বৈচিত্র্যহীন। তার জন্যই পটলার বিশেষ প্রিয়পাত্র।

সে দিন ক্লাবের ফুটবল টিম গড়া নিয়ে জরুরি মিটিং আছে আমাদের।

অবশ্য মিটিংয়ের আগেই ঝালমুড়ি আলুকাবলির ইটিং হয়ে গেছে।

হোঁৎকা ফুটবল টিমের চার্জে। প্রতিবার আমাদের টিমই এই এলাকার মধ্যে সেরা টিম হয়।

আর লোকাল সব ট্রফি আমরাই পাই।

তবে ওর জন্য চর্চাও বেশ করতে হয়।

ইদানীং, ওদিকে গজিয়ে উঠছে সেভেন বুলেট ক্লাব। তারাও এই বাজারের ব্যবসায়ীদের কাছে জোর করে মোটা টাকা চাঁদা তোলে। পিছনে কোনো পাড়ার কোনো তাবড় কর্তাও এসে জুটেছে। তার ভোটের সময় ওই ছেলেগুলো খুব খাটাখাটুনি করেছিল। তাতে দাদা জিতেও যায়।

ফলে দাদাই এখন তাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আর তার মত খুঁটির জোরে সেভেন বুলেটস এখন বাজারে তোলা তুলে দারুণ ফুটবল টিম গড়েছে।

আর তারাই প্রচার করে, এবার তারা নাকি পঞ্চপাণ্ডবকে এক এক বুলেট দিয়ে উড়িয়ে দেবে। তাতেও তাদের দুটো বুলেট বেঁচে যাবে।

সব ট্রফিও জিতে নেবে তারাই।

প্লেয়ারও পেয়েছে অনেক। তাদের সবাইকে নতুন বুট কিট ব্যাগ, জারসি সব 'ফ্রি' সাপ্লাই করবে আর টিফিনও দেবে দারুণ।

হোঁৎকা বলে—ওরে টিমে আমাগোর তিনচারজন প্লেয়ারও নাকি যাইব কইছ।

গোবরা বলে—তাদের নাম বল, ব্যাটাদের টেংরি খুলে নেব। খেলা জন্মের শোধ ঘুচিয়ে দেব তাদের। আমরা কি কম দিই তাদের। বল—কে কে যাবে? হোঁৎকা বলে—

তা জানি না, শুনত্যাছিলাম, হালায় পটলা এহনও আইল না। সমী, ডিমের মামলেট দিতি ক নকুলারে তার সঙ্গে খানকয় টোস্ট। ক্ষুধা পাইছে।

হোঁৎকার আবার ঘন ঘন খিদে পায়।

গোবরা বলে—মামার আড়তে যেতে হবে। কুমড়োর চালান আসবে দু ট্রাক। মাল দেখে নিতে হবে।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—ওদিকে পটলার দেখা নাই—তুই যা গিয়া কুমড়োর চালান দ্যাখ। আমি হালায় রেজিকনেশানই দিমু, থো ফেলাই তর কেলাব। পকেট থেকে ফস্ করে সেই রেডিমেড রেজিগনেশান লেটারই বের করে হোঁৎকা।

সব গোলমাল হতে চলেছে।

আমি বলি বোস। ডিম টোস্ট আনি। খা—তারপর ভাবা যাবে।

ফটিকও তার অবস্থা গড়বড় দেখে তার সঙ্গীতসাধনা থামিয়ে বলে—

তোরা বোস। চা-পানি খা, আমি পটলাকে দেখে আসি।

আমি বলি দেখে আসা নয়, ধরেই আনবি তাকে। এদিকে সব গোলমাল হতে বসেছে।

ফটিক একটা ব্রেক বেলবিহীন মান্ধাতার আমলের সাইকেলই ব্যবহার করে। ওটা বোধ হয় ওর বাবা বাল্যকালে চড়ত, এখন উত্তরাধিকার সূত্রে ফটিক সেটা পেয়েছে। ফটিক সেই ধ্যাড়ধ্যাড়ে সাইকেলে চেপেই দিগ্বিজয় করছে এখন। ফটিক যাত্রা করবে এ হেন সময় রিকশার হর্ন শুনে চাইলাম।

জায়গাটা অন্ধকারই।

হুড়মুড় করে একটা রিকশা এসে থামে আর তার থেকে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের বহু

আকাঙ্ক্ষিত সেই পটলচন্দ্র বলে ওঠে দ-দ দেরি হয়ে গেল।

হোঁৎকা বলে—কেন! দেরিটা হইল ক্যান?

পটলা বলে ওঠে—পিসিমা এসেছে—ওর দেওরের নাকি খু-খু—

গোবর্ধনই পাদপূরণ করে খুব বিপদ?

হ্যাঁ। পটলা এবার শোনায়।

ওদের দেশের বাড়িতে সব নাকি কেড়ে নেবে কে একজন!

এত বড় অনাচার অত্যাচার ঘটবে পটলার লতাপাতার সম্পর্কের কারও উপর, এটা যেন আমাদেরই অপমান। পটলা বলে।

পিসিমার দেওর এসে হাজির।

বাবা তো বলেন কে-কে—

আবার জিভ আটকাচ্ছে। আমিই বলি—কেস করতে বলেছেন?

পটলা জানায়, হ্যাঁ।

হোঁৎকার অর্ডারি টোস্ট ওমলেটও এসেছে। আর সঙ্গে আমাদের ভাগের টোস্ট ওমলেটও এসেছে। হোঁৎকা এবার পদত্যাগপত্র পকেটস্থ করে বলে বিজ্ঞর মতো।

—কেস কাচারি কইরা কিছুই হইব না। আজকাল আইন আর নাই।

গোবরাও ওমলেট খেতে খেতে বলে—সত্যিই, তারকেশ্বরের মহাজন এক ট্রাক পচা কুমড়ো চালান দিল, মামা কেস করেও কিছু করতে পারেনি। জজ বলে কুমড়ো পচারই জিনিস। পচতেই পারে। ব্যস, মামলা ডিসমিস করে দিল।

পটলা বলে—এখন কী করা যাবে বলত। কিছু তো ক-ক-ক—

কোনোমতে জিভটাকে বন্ধনমুক্ত করে বলে—করতেই হবে।

হোঁৎকা এসব ব্যাপারে অনেক বুদ্ধি ধরে। সেই-ই এবার চা টোস্ট পর্ব শেষ করে বলে—ভাইবা দেখি। তর হেই পিসার ভাইয়ের সাথেই কথাবার্তা কইতে হইব। হকল ব্যাপারটা জানতি হইব, তয় কি করা যায় দেখুম। এদিকে ফুটবল টিম হইল না—পটলা বলে ওসব হয়ে যাবে। পি-পি-পিসা!

পটলা দম নিয়ে বসে—পিসার ভাই ওগোর প্রবলেম সলভ করতে পারলে মোটা টাকা ডো-ডো-কে বলে ডোনেশান!

হ্যাঁ তাই দেব। ক্যাশ।

ফটিক বলে—আর কালচারাল ফাংশান করতে হবে।

ওর নজর ওই ফাংশনের দিকে। নিজে জোর করে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে যাবে, কোনোমতে তুলে আনতে না পারলে ইঁট পড়বে, তাই আমরাই ফটিককে তুলে আনি অসময়ে পর্দা ফেলে।

ওর ওই ফাংশনের কথায় হোঁৎকা গর্জে ওঠে।

তরে মার্ডার করুম ফটকে। একজনের সমূহ ডেঞ্জার, বিষয় বাগান চইলা যাইতেছে আর তুই গান গাইবি!

গোবরা বলে—হ্যাঁ, সেই সম্রাট নীরো, রোম পুড়ছে আর তিনি বেহালা বাজাচ্ছেন।

ফটিক চুপ করে যায়।

পটলার পিসিমার দেওরের বিপদ মানে আমাদেরই বিপদ।

হোঁৎকা বলে—কাল সকালেই যামু ওদের বাড়ি পটলা, তর হেই পিসার ভাইরে থাকতি কইবি।

হোঁৎকা কেসটা নিয়ে ভাবছে।

আমি বলি—কথায় বলে 'মামার শালা, পিসের ভাই তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই।'

কে না কে! তার জন্য আবার ঝামেলায় জড়াবি? পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার তেমন জানিস না।

হোঁৎকা বলে—তাই তো জানতে চাই। আর পরোপকারই পরম ধর্ম। বুঝলি সমী।

হোঁৎকা হঠাৎ এমন পরোপকারী হয়ে উঠবে তা ভাবিনি।

বলে হোঁৎকা—পটলা, ওই কথাই রইল, কাল সকালেই যামু ওগোর বাড়ি।

অর্থাৎ কাল সকালে হোঁৎকার ব্রেকফাস্ট হবে ওখানেই।

পটলার বাড়িটাও বিরাট।

তার ঠাকুর্দা তখন এই অঞ্চলে এসে জলাজমি হোগলা বাঁশের বনঘেরা জমি কিনেছিলেন প্রায় দশবিঘে স্রেফ জলের দরেই। এখন এই অঞ্চলে তার সোনার মত দাম। একসঙ্গে এতখানি জায়গা কারোরই নেই।

পটলাদের তিন কাকার তিনখানা গাড়ি। সবার নিজস্ব গাড়ি একটা আর একটা গাড়ি রয়েছে পটলার মা-ঠাকুমায়ের জন্য। ঠাকমা বেশিরভাগ সময় মন্দিরেই থাকেন।

পুকুরের ঘাটটা বাঁধানো, সিঁড়িগুলো জল থেকে উঠেছে, এদিকে তুলসীমঞ্চ, ওপাশে মার্বেল বসানো মন্দিরের মেজে, পিছনে নানা রকম ফুল-ফলের গাছে সাজানো বাগান।

গ্রীষ্মের দিন, ওপাশে পাঁচিলঘেরা আমবাগানে গাছগুলো আমে যেন নুইয়ে পড়েছে।

এদিকে বিরাট তিনতলা বসতবাড়ি। নীচে অফিসঘর, মা লক্ষ্মী যেন দুহাত ভরে ওদের দিয়েছে।

হোঁৎকাও যথাসময়ে এসে হাজির হয়। সবে গরমের ছুটি পড়েছে। স্কুলও নাই। তাই আমরা বাকি তিনমূর্তি ঠিক সময়েই এসে হাজির হয়েছি।

ওই বাড়িতে আমাদের যাতায়াত রয়েছে। পটলা মাঝে মাঝে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। নিজেও বিপদে পড়ে আর সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই আমাদেরও কাজে নামতে হয়।

এ নিয়ে অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে।

তোমরাও তার অনেক কিছু জানো, তাই পটলার মা-ঠাকমা আমাদের তো চেনেনই আর পটলার বাবা-কাকারাও চেনে এই বাকি চারজনকে।

মেজকাকা আমাদের দেখে বলেন—আবার কী হল? সামার ভেকেশানে নতুন কোনো প্রোগ্রাম হচ্ছে বুঝি?

গোবর্ধন বলে—তা নয়, পটলা ডেকেছে, পিসেমশাইয়ের ভাই এসেছেন—

মেজকাকু গাড়িতে উঠতে উঠতে বলেন—স্ট্রেট মন্দিরে চলে যাও, দেখা পাবে তার, ওই পিসের ভাই তো মন্দিরেই ধরনা দিয়েছে দেখলাম। দ্যাখ—যদি তার প্রবলেম সলভ করতে

পারো ইয়ং মেন, সত্যি ও খুব বিপদে পড়েছে হে।

পটলার দর্শন পাওয়া গেল নাটমন্দিরেই, ওর ঠাকমাও রয়েছে, বুড়ি আমাদের খুবই স্নেহ করে। আমাদের দেখে একগাল হেসে ঠাকমা বলে—এসে গেছিস তোরা! আর ভয় নেই।

হোঁৎকা এখানে ভক্তির অবতার, মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম করে ঠাকমাকেও সভক্তি গড় করে, দেখাদেখি আমরাও প্রণাম করি।

ফটিক প্রণামের পর সাধা গলায় শুধোয়,—ভালো আছেন ঠাকমা?

হ্যাঁ তা তোমার কেত্তন কবে শোনাচ্ছ? যা গাইলে সেদিন। ফটকে এখানে আমাদের না জানিয়ে একা একা এসে ঠাকমাকে কেত্তন শোনায়, তা জানা ছিল না।

অবশ্য আমরা দলবেঁধেই আসি ঠাকমার কাছে, কারণ পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের ফাংশন, ফুটবল টিম চালানোর বড় খরচটা জোগায় ঠাকমা।

বুড়ির নাকি অঢেল টাকা।

ওর নামে একটা কারখানা চলে, আর কোম্পানির কাগজ ব্যাঙ্কের টাকার যা সুদ আসে সেটা নাকি মাসে লাখের কাছাকাছি। অবশ্য ঠাকমার দান-ধ্যানও অনেক আছে। কিন্তু ফটিকের আমাদের না জানিয়ে এখানে কেত্তন গাইতে আসাটা ঠিক মেনে নিতে পারি না।

ঠাকমা বলে—বসো তোমরা, প্রসাদ আনি। আর কেশবকেও ডেকে পাঠাই, ওর কাছেই সব কথা শুনে যা হয় করো, বসো। ঠাকমা চলে যায় ওই পিসের ভাইকে খবর দিতে আর আমাদের ব্যবস্থা করতে।

ঠাকমা চলে যেতেই হোঁৎকা গর্জে ওঠে—ফটকে তুই একখান ট্রেটার। বিশ্বাসঘাতক।

ফটকে এবার বলে—আমার গান তোরা কেউ শুনিস? কুকুরের ডাক দিয়ে তুলে দিস। ঠাকমা আমার রাধে কেষ্টর গান কত মন দিয়ে শোনেন। শোনাব না? তুই বল সমী?

আমাকেই সালিশি মেনে বসে সে।

হোঁৎকা বলে—আর কিছু আনসান কসনি তো আমাগোর নামে।

না—না। বরং বলেছি তোরা খুব ভালো ছেলে—তবু হোঁৎকার ভরসা হয় না।

ঠাকমা আমাদের ক্লাবের রসদদার। ভালো কাজ করি ভালো ছেলে বলেই জানে। হোঁৎকা বলে—এবার অঙ্কে নয় আর ইংরাজিতে পাঁচ পাইছি কসনি তো।

হোঁৎকা অবশ্য পড়াশোনাতে অমন লাট খায় আর গোবর্ধন তো কুমড়ো মার্চেন্ট মামার দয়ায় আবার টেনেটুনে প্রমোশন পেয়েছে।

ফটকে বলে—না না তোদের ওসব কথা বলিনি। সমী ফার্স্ট হয়েছে সেইটাই বলেছি।

হোঁৎকা বলে—হঃ ব্রাইট সাইডের কথাই কবি। আমাগোর ওইসব আসলি খবর এহানে ছাড়ছ শুনলি ওই সারেগামা লাইফের মত সাধা বন্ধ কইরা দিমু। গলা টিইপা দমবন্ধ কইরা ফিনিস করুম। হোঁৎকারে চেনস নাই।

এমন সময় বাড়ির ঠাকুরকে পাতা ঝুড়ি বালতি ভর্তি নাশ প্রসাদ আনতে দেখে হোঁৎকার মেজাজটা খুশ হয়ে যায়। বলে সে—নে, প্রসাদ খালি, কইরে পটলা তুইও বোস। ঠাকুর মশায় গরম আনছে তো।

ঠাকমা তো এসেছে হাতে বড় এক বাক্স সেন মশায়ের সেরা সন্দেশ। হোঁৎকা তখন ডবল

বইঘর.কম
কচুরিতে গোটা আলুর দম পুরে বদনে চালান করছে। খাঁটি ঘিয়ের গরম কচুরি তৎসহ কাশ্মীরী আলুর দম। আহা।

কাশ্মীরের লোকরাই এই আলুর দম খায়।

স্বাদে গন্ধে মনোরম কচুরির সঙ্গে খেতে ত খাসা। হোঁৎকা তখন নিবিষ্টচিত্তে প্রসাদ গ্রহণে ব্যস্ত। জলখাবার মাত্র; তাতেই দিস্তে অর্থাৎ পঁচিশ পিস পার করে এখন সে রাজভোগ সেবনে ব্যস্ত। গোটা চারেক রাজভোগ, এরপর উৎকৃষ্ট কেশর ভোগ।

নাহ। দেবতারা সুখে থাকুন তাদের এরকম উৎকৃষ্ট প্রসাদ পেলে তাদের ভক্ত হতে বিন্দুমাত্র বাধা নেই।

প্রসাদ পর্ব শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে মন্দিরের থামে হেলান দিয়ে হোঁৎকা বেশ তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। এমন সময় দেখা যায় সেই পিসার ভাই কেশব দত্তকে।

ধীরে ধীরে মন্দিরে এসে কেশব দেবতার সামনে কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়ে গড়াগড়ি খেতে থাকে আর কাতর কণ্ঠে আবেদন জানায়—রক্ষা কর দেবতা। দয়াময়, দয়া করো অধমকে।

ওর কাতর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় কেসটা বেশ জটিলই।

ওখানে এক প্রস্থ গড়াগড়ি দিয়ে উঠে এসে কেশব ঠাকমাকেও প্রণাম করে।

ঠাকমা বলে—এই ছেলেদের ডেকেছি তোমার জন্যই কেশব। খুব কাজের ছেলে এরা। আমি এদের চিনি। তোমার সব কথা বলো এদের। হয়তো এরা তোমার সেই দুধে জমিদারনন্দনকে সংযুক্ত করতে পারবে।

কেশব দত্ত দেখছে আমাদের।

লোকটার গ্রাম্য চেহারা। তাতে একটা বিষণ্ণ ভাবই ফুটে উঠেছে। মনে হয়, সত্যি বিপদে পড়েছে সে। কেশব বলে—পারবে তোমরা আমাকে বাঁচাতে?

আমরা ভাবছি, কেশব বলে—পটলার বন্ধু তোমরা। অনেক কিছুই করেছ তোমরা শুনেছি। আমার সর্বস্ব গ্রাস করতে চায় ওই হাড়ভাঙা হলুদপুরের জমিদার ধনকেষ্ট বাবু। ডেঞ্জারাস লোক—ওর অত্যাচার থেকে যদি বাঁচতে পারো? সারা এলাকায় ও একটা শয়তানের ডেরা গড়ে তুলে সকলের সব কিছু গ্রাস করতে চায়।

হোঁৎকা বলে—কেসটা কি জানান, দেখি যদি কিছু করা যায়।

এবার কেশব দত্ত তার কাহিনিটা ব্যক্ত করে। বেশ গুছিয়েই বলে সে অনেক কথা। অনেক খবরই দেয় ওই অঞ্চল সম্বন্ধে।

কেশব দত্তের একটা সুন্দর বাগান আছে। তাতে একটা পুকুর আছে বিরাট আকারের। মাছও রয়েছে এক একটা আট-দশ কেজি সাইজের। জলে মাছে সমান। মাছ বিক্রি করেই বৎসরে তার আয় পঞ্চাশ-ষাট হাজারের বেশি। আর প্রায় ষাট বিঘের সরেস জাতের আমবাগান। ল্যাংড়া, বোম্বাই, গোলাপখাস, হিমসাগর, চৌষা কি জাতের আম নেই? কলাবাগানেও রকমারি কলার চাষ করে সে। মর্তমান এক একটা ইয়া সাইজের, কাঁঠালি—সিঙ্গাপুরি এসব তো আছেই।

লিচু গাছও আছে চল্লিশটা। খাস মজঃফরপুর থেকে কলম এনে লাগানো। গাছ ভর্তি লিচুও

হয়। আর কাঁঠালগাছও অনেক। এক একটা কাঁঠালের সাইজ, মন্দিরে কেত্তন করার সময় বাজানো হয় সেই খোলের মত। রস কাঁঠাল, খাজা কাঁঠাল সবই আছে। ওই বাগান থেকে কেশববাবুর আয় বছরে লাখ টাকারও বেশি।

এই বাগান পুকুর সব কিছু কোন্ মিথ্যা দলিলবলে ওই ধনকেষ্টবাবু গ্রাস করতে চায়। তার টাকার জোরও আছে আর লোকজনের অভাব নেই। সদরেও তার যাতায়াত আছে। চেনাজানা আছে মাতব্বরদের সঙ্গে।

তাই এই এলাকার যা কিছু ভালো জমি বাগান সব সে নানা ছলছুতোতে দখল করতে চায়। কেশববাবুর ভাই এখন মারা গেছেন। এতদিন পর ধনকেষ্টবাবু নাকি একটা দলিল বের করেছেন তাতে নাকি কেশববাবুর ভাই ওর কাছ থেকে ওই বাগান পুকুর বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছিল।

কেশববাবুকে শোনাই—সত্যিই কি টাকা নিয়েছিলেন তিনি?

কেশববাবু বলে—না-না, সে বর্ধমানের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। তার টাকার কোনো দরকারই ছিল না। ওসব বাজে কথা। ওই দলিল জাল।

মামলাও করেছি স্যার। কিন্তু ওই ধনকেষ্ট এর মধ্যে সাক্ষী-সাবুদও যোগাড় করেছে। যদি হেরে যাই সর্বস্ব চলে যাবে। এখনই পুলিশ ওই বাগানে আমার যাওয়া নিষেধ করে হুকুমজারি করেছে। কি হবে বাবা।

ধনকেষ্ট একা আমারই নয়, ওই এলাকায় অনেকের সর্বনাশ করেছে, আমাদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে ওই অঞ্চল একা দখল করতে চায়।

মনে হয়, প্রতিপক্ষ খুবই শক্ত ধাতের মানুষ।

হোঁৎকা সব শুনে কি ভাবছে। পটলা বলে—কি কিছু একটা বল। পিসের ভাই কি কোনো সাহায্য পাবে না?

গোবর্ধন বলে—ওই ধনকেষ্টার নাম শুনেছি, ওদিকের থেকে মামার কুমড়োর অনেক চালানদার আসে।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে। তর ওই কুমড়োর কথা ছাড় দেহি। ব্যাটা চেনে কেবল কুমড়ো। এহন একখান প্রবলেম সলভ করার কথা ভাবছি। ও কয় হেই এক কথা। গোবরা চুপ করে যায়।

স্কুলে জ্যামিতির প্রবলেম সলভ করার কথা হোঁৎকা ভাবতেও পারে না। ওসব তার মগজে ঢোকে না। কিন্তু বাস্তব জীবনের অনেক সমস্যাই সে সলভ করতে পারে, তা জানি।

ফটিক বলে—কেসটা খুবই সিরিয়াস।

হোঁৎকা এবার মন্তব্য করে—পটলা ওই ফিল্ডে যাতি হইব। যা করবার সেখানেই ভাইবা করতি হইব। এখানে বসে ওই কেসের কোনো সুরাহাই হইব না।

কেশব দত্তও তাই চায়।

সেও বলে—ঠিক কথাই বলেছ তুমি, ওখানে না গেলে সব না দেখলে কিছু করা যাবে না। তাহলে এসো তোমরা।

তারপরই বলে—গাছে এত আম কাঁঠাল—পুকুরে রকমারি মাছ। খয়রা বাটা—মৌরলা ইয়া সাইজের, এসব থেকেও এখন খাওয়াতে পারব না তোমাদের।

হোঁৎকা বলে—তার জন্যই যাইত্যাছি, দেখবেন সব ঠিক হই যাইব।

কেশব দত্ত বলে—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বাবা। হোঁৎকা যে ফুল-চন্দনে আদৌ আগ্রহী নয়, তা কেশব দত্ত এখনও টের পায়নি।

পটলা বলে—এখন তো গরমের ছুটি। চল, দেশভ্রমণও হবে আর পিসার ভাইয়ের—কাজটা যদি উ—উ—

ওর জিভ বিট্রে করছে। মাঝে মাঝে ওটা হয়। আমি বলি, যদি উদ্ধার হয়।

পটলা ততক্ষণে ফ্রি হয়ে বলে—হ্যাঁ। তাহলে চল ওই পিসার ভাইয়ের দেশে।

ঠাকমা বলে হ্যাঁরে, ওই বটকেষ্ট।

না, ধনকেষ্ট, কেশব শুধরে দেয়।

ঠাকমা বলে—ওই ধনকেষ্ট শুনি সাংঘাতিক লোক। কোনো বিপদ আপদ হবে না তো। এসব লোক খুব বদবুদ্ধি ধরে।

কেশব দত্ত চুপ করে থাকে।

পটলাই বলে—ভয় পেয়ো না ঠাকমা। মেজকাকার বন্ধু ওই হুগলির এখন এস-পি তা জেনেছি।

হোঁৎকা অভয় দেয়—কোনো ভয় নেই ঠাকমা।

ফটিক গেয়ে ওঠে—দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

কেশব বলে তাহলে তোমরা এসো এই সপ্তাহেই। আমি কাল বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। আর পথ খরচা বাবদ—

কিছু টাকা বের করতে যাবে সে, ঠাকমা বাধা দেয়।

ওসব থাক কেশব। ওরা যাবে তার ব্যবস্থা সব আমিই করে দেব। তোমাকে ভাবতে হবে না। কোন্ পথে কীভাবে যাবে তুমি সেই সব বলে দাও। তোমাদের গ্রাম তো বহু দূরে, সভ্য জগতের ম্যাপে তার লেখাজোখাও নাই। তুমি কথা বলো—আমার পূজাপাঠের সময় হয়ে গেছে, উঠছি।

ঠাকমা চলে গেল। এবার স্নান করে পুজোয় বসবে। সেও ঘণ্টা কয়েকের ব্যাপার।

কেশব দত্ত আমাদের তার গ্রামে যাবার পথ—যান-বাহনের কথা বলতে শুরু করে।

ক'দিন পরই আমরা বের হবো।

এর মধ্যে ক্লাবে আমাদের বেশ কয়েকবার মিটিং-ও হয়েছে। শরৎ উকিলের কে সম্বন্ধী চুঁচড়ো কোর্টের উকিল তার নামেও চিঠি নেওয়া হয়েছে। মেজকাকাও এর মধ্যে ফোনে চুঁচুড়ার পুলিশের বড় সাহেবের সঙ্গেও কথা বলেছেন। আমাদের হাতে একটি চিঠিও দিয়েছেন তাঁকে।

এর মধ্যে হোঁৎকা তার কিছু চটপট ছদ্মবেশের সাজসরঞ্জামও নিয়েছে। নাইলন দড়ি, টর্চ, কিছু জরুরি ওষুধপত্রও সঙ্গে নিতে হয়েছে। পল্লীগ্রাম-হুট করে ডাক্তারও মিলবে না। তাই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা দরকার।

ঠাকমা আমাদের প্রায় হাজারখানেক টাকা দিয়ে বলে, টাকাটা কাছে রাখবি।

হোঁৎকা বলে—এত টাকা! গাড়ি ভাড়া তো মাত্র পঁচিশ টাকা। যাতায়াত পঞ্চাশ—

ঠাকমা বলে—বিদেশ বিভুঁই জায়গা। ওটা কাছে রাখ। আর সাবধানে থাকবি পটলা।

পটলা বলে—এ নিয়ে তুমি ভেব না।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের দরজা ক'দিনের জন্য বন্ধ থাকল। আমরা মাঝে মাঝে এমন অভিযানে বের হই, তাই সকলেই জানে এটা—যে আবার বের হয়েছি।

পথটা যে এত জটিল তা জানতাম না।

চুঁচুড়া স্টেশনে নেমে বাসে করে যেতে হবে পতিপুর। সেখানের হাটতলায় ওই বাস ছেড়ে দিয়ে আবার সেখান থেকে হাড়ভাঙা হলুদপুরের বাস ধরতে হবে।

অবশ্য বাস হাড়ভাঙা হলুদপুর অবধি যাবে না, ওখান থেকে একটা খাল পার হয়ে ওপারে পঞ্চায়েতের রাস্তা। সেখানে ভ্যান রিকশা মেলে—ওতে চেপে না হয় হেঁটে মাইল তিনেক গেলে তবেই সেই হাড়ভাঙা হলুদপুর পৌঁছানো যাবে।

হোঁৎকা বলে—তর পিসা আর গাঁ খুঁজে পায় নাই নাকি রে পটলা? ওহানে মানুষ থাকে?

ফটিক বলে—ওই তো আদর্শ গ্রাম। প্রকৃতির আদর্শ কোলে মুক্ত বায়ু।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—কাব্যি করিস না ফটিক! তার চেয়ে বাদাম টাদাম পাস তো দ্যাখ, মুখে কিছু দিতি হইব। লং জার্নি।

গোবরাও শোনায়—দুর্গম গিরি কান্তার মরু—দুস্তর—

আরও শোনাতো সে, হোঁৎকার চাহনিতে থেমে গেল। আর এই সময় বাদামওয়ালাও এসে পড়ে ট্রেনে। হোঁৎকা শুধোয় এক ডজন প্যাকেট ও বাদামের ওইই দাও গিয়া। তা ফেরেস হইব তো?

বাদামওয়ালা একডজন প্যাকেট বাদামভাজা খানেওয়ালা পার্টি বিশেষ দেখেনি, আর সাতসকালেই এমন রসাল খদ্দের দেখে বলে—একেবারে খোলা থেকে নামিয়ে আনছি বাবু, হাতে গরম। দেখুন।

হোঁৎকা এক ডজন বাদামের প্যাকেট নিয়ে জলযোগ শুরু করে ট্রেনেই, ট্রেন তখন শ্রীরামপুর ছেড়ে এগিয়ে চলেছে, চুঁচুড়া স্টেশন আসতে তখনও অনেক দেরি।

চুঁচুড়া স্টেশনে নেমে ওদিকে রেললাইনের নীচে অপেক্ষা করতে একটা পোলবার বাস এসে গেছে, হোঁৎকার ইচ্ছা ছিল স্টেশনের ওদিকের দোকানে গরম কচুরি ভাজছে—সেখানে বসে প্রাতরাশ সারার।

বলে—সমী, কচুরির খাসা গন্ধও উঠতাছে।. গরম কচুরি খানকয় করি খাই ল। ওই পোলবায় কি পাইব কে জানে।

ফটিক বলে দীর্ঘ পথ, কিছু—

এমন সময় বাসটা এসে পড়ে, কনডাকটার হাঁকছে পোলবা পোলবা। খালি গাড়ি—

পরের বাস আধা ঘণ্টাখানেক পর।

ওখান থেকে অনেক গোলমালের পথ। তাই বলি—কচুরি এখন থাক। যতটা পারিস এগিয়ে চল, পোলবাতেই খাবি।

পটলাও বলে—ওখানের পরোটা দারুণ। উইথ ছোলার ডাল। এখন বা-বাসে ওঠ।

অগত্যা মুখবুজে হোঁৎকা বাসে উঠল। গোবর্ধন উঠেছে। কনডাকটার হাঁকছে—খালি গাড়ি—খালি গাড়ি—

ফটিকের মেজাজটা ভালো নেই।

খাবারও জোটেনি, এমন গরম কচুরির লোভ ছাড়তে হয়েছে, সে বাসে উঠে বলে কনডাকটারকে খালি গাড়ি হাঁকছ, খালি কোথায়?

ফটিক গর্জায় সব সিটই তো ভর্তি।

এর মধ্যে সব সিট বোঝাই। ভিতরে দাঁড়াবার উপায় নেই, চুঁচড়োর এত মানুষ যে পোলবার দিকে যাতায়াত করে জানা ছিল না।

কনডাকটার বলে—এখনও ফাঁকা? দেখছেন না। দাঁড়াবার জায়গা তো দিব্যি রয়েছে। দাঁড়িয়ে যেতে পারছেন এই বাপের ভাগ্যি। ঝুলতে তো হয়নি। অর্থাৎ ঝুলে যাওয়াই এখানের রীতি।

বাস চলেছে। আর দিল্লীরোড পার হয়ে যত গ্রামের দিকে চলেছে তত ভিড় বাড়ছে। পোলবার আজ হাট, তাই দুনিয়ার ব্যাপারী তাদের মালপত্তর নিয়ে ঠেলে উঠছে, কে আবার দুটো ছাগল, মায় বাচ্চা নিয়ে উঠেছে।

বাসটায় আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই। আকণ্ঠ বোঝাই বাসটা টালমাটাল খেতে খেতে চলেছে। খানাখন্দে বোঝাই রাস্তা, মনে হয়, যে কোনো মুহূর্তে উলটে পড়বে, আর ভিতরে গুড়ের নাগরীর মত ঠাসা অবস্থাতেই দমবন্ধ হয়ে মারা পড়তে হবে।

ঘেমে নেয়ে উঠেছি।

শেষ অবধি বাসটা এসে পোলবাতে নিরাপদে পৌঁছাল আমাদের ভাগ্যের জোরেই। নেমে যেন ধড়ে প্রাণ পাই।

একে একে আমাদের পুরো টিমই নেমেছে মালপত্র নিয়ে, অবশ্য জামাগুলো ঘামে ভিজে তখন লাটপাট হয়ে গেছে। যেন হাঁড়ির ভেতর থেকে বের করে ওসব পরা হয়েছে।

হাটতলা বিশাল এলাকা জুড়ে।

আর লোকজন—পসারীর দল জুটেছে অনেক। বিকিকিনি চলেছে।

এই ভিড় থেকে বের হয়ে ওপাশে একটু ফাঁকা মাঠের ধারে বটগাছের নীচে একটা খাবারের দোকানের বাইরে মাচায় বসে দম নিতে থাকি।

এদিকটা কিছু ফাঁকা—পিছনে একটা বড় দিঘি, তার থেকে কিছুটা ঠান্ডা হাওয়া আসছে। ওখানে বসে একটু দম নিয়ে এবার দোকানীকে জানাই—হাড়ভাঙা হলুদপুরের বাস কোথায় পাব?

দোকানদার তখন আলুর চপ আর বেগুনি ভাজতে ব্যস্ত। তার সহকারী ঠোঙায় করে মুড়ি আর তেলেভাজা উইথ কাঁচালঙ্কা সাপ্লাই করছে খদ্দেরদের।

ছেলেটাই বলে—সে তো এই পুকুরের ওপারে ছাড়ে। তা এখনও দেরি আছে। আধঘণ্টা তো হবেই।

দুটো লোক ওদিকে বসে গব গব করে আলুর চপ আর মুড়ি খাচ্ছিল। কড়াই থেকে তোলা সদ্য ভাজা চপগুলোকেই গবাগব এভাবে কেউ গিলতে পারে জানা ছিল না। তাদের বোধহয়

আগুন খাওয়াই অভ্যাস। ওরা আমাদের দিকে চাইছে।

হোঁৎকার পেটে তখন আগুন জ্বলছে, ফটিকও বলে বাসের দেরি রয়েছে। দুপুরে কখন পৌঁছব ঠিক নাই, এখানেই কিছু খেয়ে নে পটলা।

হোঁৎকা বলে—না কচুরি! হালা মুড়ি চপ আর রসগোল্লাই দাও হে—একটু বেশি কইরাই দিবা।

হোঁৎকা গণ্ডা তিনেক চপ আর ছোট একহাঁড়ি রসগোল্লা আর এক সানকি মুড়ি নিয়ে বসেছে জলযোগে। আমরা ভয়ে ভয়ে কিছু খেয়ে নিই। এরপর শুরু হবে যাত্রা, হাড়ভাঙা না মাথাভাঙা কোন্ গ্রামে কে জানে?

বাসটাকে দেখা যায় না।

একটা যেন মালপত্রের স্তূপ। বাইরে দুদিকে উপরে আর নীচে একটা করে বাঁশ বাঁধা।

গাড়ির ভিতরে আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

ছাদে আনাজপত্রের বস্তা, ঝুড়ি, মুরগির চ্যাঙাড়ি তার উপর সারবন্দি মানুষ বসেছে, আর এবার গাড়ির দুপাশে ওই বাঁশের উপর দাঁড়িয়ে আর একটা বাঁশ ধরে দুদিকে তা প্রায় জনা তিরিশ লোক ঝুলন্ত অবস্থায় যাবে।

আমরা ভিতরে ঠাঁই পাইনি, বাসের ছাদে দুটো বাঁধাকপির বস্তার উপর বসেছি।

ওপাশে দেখি দোকানের দেখা সেই দুটো লোকও রয়েছে। একজনের মাথায় চুল এক গাছিও নাই, প্রকাণ্ড টাক ঝকঝক করছে আর গোঁফজোড়াটা বেশ পুরুষ্ট। বিড়ালের ল্যাজের মত। অন্যজন জীর্ণ তবে নাকটা বড় যেন শকুনির মত।

সে-ই শুধোয় হাড়ভাঙা হলুদপুর যাবে কার বাড়িতে? যেন কৈফিয়ত চাইছে সে।

আমি দোকান থেকেই লোক দুটোকে দেখছি, কেমন ভালো লাগে না ওদের চাহনি।

গোঁফওয়ালা লোকটা শুধোয়—কুথা থেকে আসা হচ্ছে? এ্যাঁ কলকাতা থেকে?

লোকটা ঠিক বাঙালি নয়, তবে দীর্ঘদিন বাংলামুলুকে রয়েছে, বোধহয় তাই বাংলা কিছু শব্দ দেশওয়ালী ঢংয়ে বলতে শিখেছে।

আমি জবাব দিই না।

হোঁৎকা তখন এই একধামা মুড়ি আর দেড় ডজন চপ উইথ একহাঁড়ি রসগোল্লা সেবন করে ঝিমুচ্ছে, গোবরা বলে—হ্যাঁ।

—তা যাওয়া হবে কুথায়? কার বাড়ি?

ফটিক তখন ওই বাসের টংয়ে চড়ে গুনগুন করে সুর ভাঁজছে। বাসটাও বেশ তালে তালে ওই হাড়গোড় ভাঙা রাস্তায় নেচে কুঁদে চলেছে সর্বাঙ্গে মানুষের চাদর জড়িয়ে।

চৈতমাসের মাঝামাঝি এর মধ্যেই দুপুরের রোদ যেন অগ্নিবৃষ্টি শুরু করেছে। বাতাস তো নয় যেন আগুনের হল্কা। বাসের ছাদে বসে রোস্ট হতে হতে চলেছি। এই পথের যেন শেষ নাই।

বাসটা থামছে, দু চারজন নামছে তো পাঁচজন ঠেলে উঠছে। যে যা পাচ্ছে তাই ধরে ঝুলে পড়ছে। একজন তো গোবরার ঠ্যাং ধরেই ঝুলছিল। কোনোমতে গোবর্ধন বলেই সামলে নিয়েছে। ওদিকে টাকওয়ালা তখনও জেরা করছে—কুথায় যাবে, কার বাড়ি?

বইঘর.কম

আমিই বলি—থাম তো, রোদে গরমে মরছি ওকে জবাব দিতে হবে, চুপ করে বোস।

লোকদুটো আমার জবাবে খুশি হয় না।

একজন বলে—কোই বাত পুছলে তার জবাব দিতে হয় খোকাবাবু। না দাও দিবে না।

লোকটা আমাকে যেন শাসাচ্ছে।

হোঁৎকা চোখ খুলে দেখে আবার শিবনেত্র হয়ে ওই বাসের দোলানিতে ঝিমুতে থাকে।

ঘণ্টাদেড়েক অন্তত রোদে পুড়েছি। উঃ, কি যাত্রা রে বাবা! পটলাকে শুধাই আর কতদূর রে?

পটলা বলে, এসে গেছি। ওই তো বাস থেকে ওখানে নামতে হবে ওটাই হাড়ভাঙার স্টপেজ।

শেষ অবধি এই যাত্রার পর্বও শেষ হয়।

রাস্তার ধারে কয়েকটা চালাঘর। দু-চারটে পুরোনো বট অশ্বত্থ গাছ জায়গাটাকে ছায়াঘন করে রেখেছে মাঠের মধ্যে। মরুভূমির মধ্যে এটুকু যেন মরূদ্যানই।

এখানে নেমে এবার ধড়ে প্রাণ ফিরে পাই। দুটো বাস জার্নি করে অর্ধেক প্রাণ যেন শেষ হয়ে গেছে। বাস থেকে নেমে দেখি যাত্রীরা এক জায়গায় ভিড় করেছে। যেন সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। হইচই চলছে।

পরে দেখি সাংঘাতিক কিছু নয়। একটা টিউবওয়েলকে ঘিরে জলপানের প্রতিযোগিতা চলেছে। বাসটা বেশ কিছুক্ষণ এখানে এর জন্যই দাঁড়ায়। কনডাকটার ওদিকের খাল থেকে এক বালতি জল তুলে এনে গাড়ির রেডিয়েটারে জল ঢালছে—তখনও ওর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

গাড়ির অবস্থাও আমাদের মত।

গাছতলার একটা চায়ের দোকানে বসে আমরা তখন ডাঙায় তোলা কাতলা মাছের মত খাবি খাচ্ছি।

হোঁৎকা বলে—তর পিসের ভাইয়ের সম্পত্তির দাম এখানে কানাকড়িও নয়। এখানে মানুষ থাকে?

চা দিক! সঙ্গে ওই বিস্কুট গণ্ডা দুই।

বলি—এত খেলি একটু আগে!

হোঁৎকা বলে—পথের ধকল দেখসনি? সব হজম হই গেছে গিয়া।

পটলা বলে—পিসের ভাইয়ের গাঁয়ে এসে গেছি।—গিয়েই তো ভাত খাবি।

দোকানদার বলে—কোথায় যাবেন আপনারা?

—হাড়ভাঙা হলুদপুর।

দোকানদার শুধোয়—কলকাতা থেকে আসা হচ্ছে বাবুদের? এর কণ্ঠস্বরে বিনীত ভাব। তাই বলি—হ্যাঁ।

এরপরই দোকানদার গলা তুলে হাঁক মারে—ওরে জগা, বেন্দা—এনারা এইসে গেছেন। এই যে—হেথায়। পিসের ভাই বোধহয় আমাদের নিয়ে যাবার জন্য কোনো লোকজনকে পাঠিয়েছে। হাজার হোক কুটুম বাড়ির লোক। মান খাতির তো দেখাতেই হবে।

ওই দোকানদারের ডাকে এর মধ্যে তিনচারজন ছেলে, একজন মোটকা দাঁত বের করা লোকও এসে হাজির হয়। একজন সাইকেল ঠেলেই চলে আসে।

মোটকা দাঁতাল বনশুয়োরের মত লোকটা বলে—আসুন, আসুন। আপনাদের জন্যই এসেছি। ওরে গুপী, চা বিস্কুট দে, জল খাওয়া।

অন্যজন গদগদ হয়ে বলে—পথে কষ্ট হয়নি তো?

ওদের কথায় গোবরা বলে, যা ভিড় বাসে।

একজন বলে, আজ তবু বাসে উঠতে পারছেন, অন্যদিন তো কাছেই যাওয়া যায় না। আমাদের জোর বরাত আপনারা এসে পড়েছেন।

ফটিক তখন চায়ের কাপ তুলে মুক্ত প্রকৃতির ওই ঝলসানো সৌন্দর্যে মাতোয়ারা হয়ে খুব জোরসে কালোয়াতি গানের সেই কলিটা গেয়ে চলেছে।

—সইয়া-না মারো—

মাচার উপর তখন সুর নিয়ে জোর মারামারি চলছে। উপস্থিত ওই মানুষগুলো যে কালোয়াতি গানের এত ভক্ত তা জানা ছিল না।

তারপর ওরাই আমাদের চা বিস্কুটের সব খরচা দেয়। একজন দৌড়ল ওপারে ভ্যান ঠিক করতে। পিসের ভাই আমাদের আপ্যায়নের এমনি ব্যবস্থা রেখেছিল তা জানতাম না।

এর মধ্যে ওই চার-পাঁচজন পিছনে আরও বেশ ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। আমাদের দিকে চেয়ে দেখছে তারা সম্ভ্রমপূর্ণ চাহনিতে।

কলকাতা নামক এক আজব জায়গা থেকে আমরা কটি বিচিত্র প্রাণী যেন ওই জগতে অবতীর্ণ হয়েছি নেহাত দয়া করেই।

ওই টাক আর গোঁফওয়ালা আর সেই প্যাকাটির মত লম্বা ওর অনুচর দু'জনে ওদিকের একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চেতে বসে আমাদের দিকে নজর রেখেছিল।

ওরা পোলবা থেকেই আমাদের সঙ্গে রয়েছে, নানা প্রশ্নও করেছে। টাকওয়ালা লোকটা তো রীতিমতো শাসানিই দিয়েছিল, কেন এখানে এসেছি তা বার বার জানতে চেয়েছিল। এবার আমাদের ওই দলপরিবৃত হয়ে যেতে দেখে ওরাও আমাদের পিছু ছেড়ে চলে গেল।

দোকানগুলোর পিছনেই একটা খাল। খালে জল যত না রয়েছে কাদা আর কচুরিপানা রয়েছে তার তুলনায় অনেক বেশি। আর সাঁকো বলতে আড়াআড়িভাবে দুখানা বাঁশ ফেলা আর ধরার জন্য রয়েছে একটা আলগা বাঁশ।

ওই দুখানা বাঁশের উপর দিয়েই ভারী বোঝা মাথায় নিয়ে গড়ের মাঠে ভেল্কিওয়ালাদের দড়ির উপর হাঁটার খেলার মত হেসে খেলে পার হয়ে চলেছে।

আমাদের ত ওই বাঁশবাজি দেখিয়ে পার হতে হবে ওই খাল। নড়বড় করছে খাঁচা, আর পিছলও। পা ফসকালে ওই কচুরিপানার দামে কাদার মধ্যে পুঁতে যেতে হবে। খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হাড়ভাঙা হলুদপুর আসার যে এত দুর্ভোগ তা জানতাম না। গোবরা বলে—এর চেয়ে গৌরীশঙ্কর পর্বতের চূড়ায় ওঠা যে সহজ রে?

তবু ওই বাহিনী হাত ধরে কোনোমতে পার করে আমাদের। শুধোই—আর কতদূর?

একজন আঙুল দেখায়, দূর দিগন্তে লি লি করছে গ্রামসীমা—মাঠের বুক চিরে পঞ্চায়েতের তৈরি ইট পাতা একটা ফিট আষ্টেক পথের ইঙ্গিত।

মোটকা লোকটা বলে—এই খালের উপর সাঁকো আর রাস্তা পাকা করার জন্য কয়েক লাখ টাকা স্যাংশন করা হয়েছিল। তা পঞ্চায়েত প্রধান ওসব না করে স্রেফ তিনখানা বাঁশ খরচা করে এই সাঁকো করেছে আর পিচ রাস্তার বদলে যা হয়েছে দেখছেন তো।

গোবরা শুধোয়, বাকি টাকা!

কে শোনায় ওসব। গেছে ধনকেষ্টবাবুর পকেটে। ওইই তো অঞ্চলপ্রধান।

ধনকেষ্ট নামটা চেনাই বোধ হয়।

এ সেই পিসের ভাইয়ের জমি পুকুর বাগান হড়কাবার পার্টি। অর্থাৎ ধনকেষ্ট তাহলে এখানে জমিয়েই বসেছে, সব দিক থেকেই লুটপাট করছে।

বলি—ওকে সরাতে পারছে না এখানের লোক?

লোকটা বলে—চেষ্টাতে তো আছি আমরা, বাদলদাও বেশ উঠে পড়ে লেগেছে, এখানের মাস্টার, দেখা যাক কি হয়।

চলুন! গাড়ি তৈরি।

গাড়ি বলতে দেখি একটা খোলা ভ্যান রিকশা। ওতে ধানের বস্তা, গুড়ের টিন, মালপত্র বওয়া হয়, অভাবে যাত্রীও বয়।

তক্তাপাতা। কে বলে।

—বাবুদের জন্য দুটো বস্তা ফস্তা আন, বাবুরা বসবে—কে দুটো ধান ঝাড়া বস্তা এনে পেতে দেয়।

এবার আমাদের যাত্রা শুরু হল।

গ্রামের নাম কে রেখেছিল হাড়ভাঙা তা জানি না, তবে এখানে আসতে গেলে হাড়গোড় যে ভাঙা খুবই সম্ভব তা বুঝেছি।

ওই ইটপাতা রাস্তার বহু জায়গায় ইট আর নেই, স্থানে স্থানে গর্ত হয়ে গেছে। ভ্যান রিকশায় আলুর বস্তা যায় আছাড় খেতে খেতে। তারা প্রতিবাদ করে না। কিন্তু মানুষ নামক জীব আর্তনাদ করে ওঠে।

কোমর যেন দেহছাড়া হয়ে যাবে, না হয় পাঁজরই ভেঙে দু-টুকরো হবে। আর মাথার উপর ওই রোদ। গ্রামসীমাও তেমনি অধরাই রয়েছে বেলা তিনটে বেজে চারটে হতে চলেছে। ভোরে কলকাতা থেকে বের হয়ে চলেছি এখনও পৌঁছবার নাম নেই।

গাড়ির সঙ্গে ওরাও দলবেঁধে আসছে।

এবার এসে পৌঁছলাম গ্রামে। বাঁশবন আর বাঁশবন। জমাট অন্ধকার নেমেছে বাঁশবনে।

পথের দুদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট বাড়ি—এদিকে ওদিকে শুধু ডোবা আর বনবাদাড়। ওপাশে একটা পুরোনো আমলের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঢোকাল।

এককালে বেশ বনেদি জমিদার বাড়িই।

এখন পড়ন্ত অবস্থা। কাছারি বাড়িটা শূন্য ওদিকে ভেঙে পড়েছে। লোকজনও নাই। এককালে এখানে নায়েব, গোমস্তা প্রজা পাটকের ভিড় ছিল।

আজ কেউ নেই।

কাছারি বাড়ি পার হয়ে একটা ঢাকা বারান্দা দিয়ে ওপাশে আবার অন্যমহলে গিয়ে চোরা সিঁড়ি দিয়ে দোতলার একটা ঘরে তুলল।

আশেপাশে কোনো অন্য বাড়ি নেই।

এখানেও লোকজন বিশেষ আছে তা মনে হয় না।

এই ক'জনই এল আর এবাড়ি থেকে একটা লোকও নীচে থেকে উঠে এল এ ঘরে।

মেঝেতে ঢালাও ফরাস পাতা—ওদিকে জলের কুঁজো গেলাসও রাখা আছে। অর্থাৎ আমাদের আসার খবর জানা ছিল তাই সব ব্যবস্থাও করেছে।

সেই কালো মুষকো লোকটার নামও জেনেছি এর মধ্যে। ওর নাম বংশীগোপাল বাগ। অবশ্য বাগ না বলে ওকে বনশুয়োর বললেই ভালো হত। কথা বলে যেন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে।

ওকেই শুধোই—কিন্তু কেশববাবুকে দেখছি না?

বংশীগোপাল বলে—দেখবে বইকী। সবাই আসবে। এর মধ্যে সেই বাড়ির লোকটা বলে—ওদিকে চানের জল রাখা আছে। চানটান করে নিন। ছেলেদের একজন বলে, হ্যাঁ, খুব ধকল গেছে। চানটান করে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করুন। সন্ধ্যার আগেই আসছি। ওদিকে সব ব্যবস্থা করতে হবে। ওরা তো চলে গেল।

তখন শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। তবু শুধোই—কিরে পটলা, তোর পিসের ভাইকে দেখছি না! হোঁৎকা তখন মাংসের খোশবু পেয়েছে বাতাসে, বলে সে, চান কইরা খাই ল। আইব এবার ওর পিসার ভাই।

হোঁৎকা জামা খুলে বাতাসে আর একবার ঘ্রাণ নিয়ে বলে—মাংসটা ভালোই জমবে মনে হয়। আমি চান কইরা আইত্যাছি।

কুয়োর ঠান্ডা জলে স্নান করার পরেই খিদেটা এবার যেন চড়চড়িয়ে ওঠে। আর আয়োজনও ভালোই করেছে। তখন আর অন্য কিছু ভাবার সময়ও নাই।

গরম গরম ভাত, পটল ভাজা আর মাংসের ঝোল। মাংসও বেশ অনেকটা করে। আমরাও তার সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করি না। আমের চাটনিটাও বেশ মুখরোচক করেছে। হোঁৎকা কেজিখানেক মাংস আর হাফ কেজি চালের ভাত শেষ করে এবার চিৎপাত হয়ে পড়ে সেই ঢালা ফরাসে।

একা হোঁৎকাই নয় আমরাও গড়ান দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

সেই মোটা টাকওয়ালা লোকটার বিড়ালের ল্যাজের মত গোঁফ দুটো ফুলে উঠেছে। আমার বুকের উপর বসে যেন গলা টিপছে আর ওই সিঁটকে লোকটা একটা দা হাতে গর্জাচ্ছে।

হঠাৎ ওদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে যায়। ধড়ফড়িয়ে উঠি, সেই টাকওয়ালা নয় বংশীগোপাল বাগ ডাকছে—দাদা! ও ভাইটি—এবার উঠে পড়ো। ওই যে গোবর্ধন বাবু—

ওদের ডাকাডাকিতে উঠে বসলাম। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘরে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। তার আলোয় দেখি একা বংশী নয় সঙ্গে আরও বেশ কিছু কিছু ছেলেপুলেই রয়েছে।

আর একজন একটা বড় জগে ধূমায়িত চা আর কয়েকটা মাটির গেলাস এনে চা-ও দেয়। আমরা চা খেতে থাকি।

বইঘর.কম

এবার খেয়াল হয় কেশব দত্তের কথা। পটলার সেই পিসার ভাইয়ের এখনও দেখা নেই। বাইরে কোথায় মাইকে ঘোষণা চলছে।

কোথাও কোনো অনুষ্ঠান হবে বোধহয়, তার জন্য সে মাইকে তারস্বরে ঘোষণা করছে।—কলকাতার নামিদামি শিল্পী, গায়করা এসে গেছেন। তাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে। তাদের অনুষ্ঠান দেখে জন্ম সার্থক করুন। এমন সুবর্ণসুযোগ হাড়ভাঙা হলুদপুরে আর পাবেন না। এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না। আসুন রিকশায় হেঁটে দৌড়ে আসুন। সঙ্গে চট আনতে ভুলবেন না। চট লিয়ে আসবেন, প্রবেশ মূল্য তিন টাকা—দু টাকা মাত্তর।

চট বগলে করে অনুষ্ঠান দেখার এদের আমন্ত্রণ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। তাহলে এখানেও এত দূরে শিল্পপ্রেমী মানুষ আছে। আরও সান্ত্বনা পাই যে কলকাতার নামিদামি শিল্পীরা এখানেও আসে টুপাইস আমদানির জন্য।

চা পর্ব শেষ হতে পটলাই বলে—পিসের ভাই মানে কেশববাবুকে খবর দিন। তার সঙ্গে জরুরি দরকার আছে।

বংশী বলে—দরকার আবার কিসের স্যার? পুরো ক্যাশ তো আগাম মিট্টে দে এসেছি আপনার ভাইয়ের হাতে—

কি বলছেন এসব? চমকে উঠি আমি।

বংশীর এক চ্যালা বলে।—দুনম্বরী করে এখান থেকে সটকাতে পারবে না ছোকরা। গাঁয়ের নাম জানো? হাড়ভাঙা হলুদপুর। হাড় ভেঙে হলুদ পুরে দেব।

এবার ব্যাপারটা আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে।

আমি বলি—এসব ভুল বলছেন—আমরা কেশব দত্তের বাড়িতে যাচ্ছিলাম। এখানে আপনারাই এনে তুলেছেন।

বংশী বলে—তাহলে আপনারা আমাদের ফাংশানের জন্য আসেননি?

না। কিছুই জানি না আপনাদের অনুষ্ঠানের কথা। কিছু বলতে দিলেন না। এনে তুললেন এখানে, ভাবলাম কেশব দত্তেরই লোক আপনারা।

এমন সময় একটা ছেলে হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে—সব্বোনাশ হয়ে গেছে বংশীদা!

বংশী বলে, কী হল? তুই তো গেছলি চুঁচড়ো স্টেশনে—

ছেলেটা বলে—কিন্তু ওখান থেকেই ওই ধনকেষ্টবাবুর লোকেরা গাড়ি নিয়ে গেছল, ওরাই আমাদের কলকাতা থেকে আসা শিল্পীদের তুলে নিয়ে আগে চলে এসেছে।

অন্যজন বলে।—এমনি কাণ্ড করবে ওই ধনকেষ্টর দল তা জানতাম। ওরা আমাদের ক্লাবের বেইজ্জত করবে। এদিকে বিবেক আর ভীম করার কেউ নাই, প্যানডেলে আগুন জ্বলবে।

বংশী বলে—সর্বনাশ হয়ে গেল। ভুল করে এদের তুলে আনলাম আর আসলি মালদের নে পালাল ওই ধনকেষ্টার দল। এখন কী হবে?

কে বলে—কেটে পড়ো দাদা গাঁ থেকে।

ওদিকে প্যানডেল জ্বলবে, লোকজন মারদাঙ্গা করবে। উঃ ধনকেষ্ট আর কত শত্রুতা করবে

Boighar.com MAH
আমাদের সঙ্গে। সব শেষ হয়ে গেল। এখন কি অনুষ্ঠান হবে।

কর্ণবধ পালায় নিয়তি ভীমই তো মেন পার্ট?

ওই নাটক আমাদের ক্লাবে এবারই করেছি। আর ফটিক নিয়তির রোলে ফাটাফাটি পার্ট করেছে, ভীম তো গোবর্ধন একেবারে অরিজিন্যাল। পটলাও ভালো গাইতে পারে। ওরা সত্যিই বিপদে পড়েছে ওই ধনকেষ্টর জন্যই। অনুষ্ঠান পণ্ড হলে সর্বনাশ হবে। ধনকেষ্টই তার লোকদের গোলমাল করতে পাঠাবে নিশ্চয়ই।

তাই ওদের বিপদের গুরুত্ব বুঝে বলি।—আপনাদের কর্ণবধ পালার নিয়তি, ভীম সবই পাবেন। একেবারে টপ।

ওরা যেন অকূলে কূল পায়। বলে—সত্যি!

—হ্যাঁ।

ফটিককে দেখিয়ে বলি—ও নিয়তি করেছে অন্তত কুড়ি নাইট। দারুণ গায়। আর ভীম ওই তো।

গোবর্ধনকে দেখছে ওরা। এবার ওদের মনে আশার আলো জাগে।

বংশী বলে—করবে ভাই? কোনোমতে রাতটা উদ্ধার করে দাও, বংশী বাগ তোমাদের জন্য জান লড়িয়ে দেবে।

কে বলে আজকের রাত পার হোক, তারপর ধনকেষ্টকে দেখব। আমাদের ক্লাবের পিছনে লাগা জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবো।

বংশী বলে, পরের কথা পরে। এখন বলি জোর জোর মাইকিং কর। ব্যাটা ধনকেষ্টর পাড়ায় মাইক ঘোরা। অনুষ্ঠান হচ্ছে। সবুজ সাথীর দলকে কেউ দমাতে পারবে না—আজকের পালা কর্ণবধ! ঠিক রাত্রি দশটায় শুরু হবে। সুরপার্টিকে টাইম থাকতে আসরে বসিয়ে কনসার্ট শুরু করতে বল।

গ্রামে ধনকেষ্ট যে নানা কাণ্ড ঘটায় তা এসেই জেনেছি। আমাদেরও ওই ধনকেষ্টর বিরুদ্ধে কার্যে নামতে হবে।

এখানে আমাদের চেনা জানা মদত করার মত কেউ নাই। কেশব দত্ত একা কি সাহায্য করতে পারবে তা জানি না। তাই এদের হাতে রাখতে হবে।

আর সেই সুবর্ণ সুযোগ এখন আমাদের হাতে এসে গেছে। হোঁৎকা বলে।

—তা বুদ্ধিটা মন্দ করিসনি সমী। ফটকে জান লড়িয়ে গাইবি, একটো করবি। গোবরা-ভীম যেন এক্কেবারে মার কাটারি ভীম হয়। পাট মুখস্থ আছে তো? ফটিক তো এমন সুযোগ পাবে গাইবার ভাবেনি। সে এর মধ্যে হারমোনিয়াম আর বাঁশিদারকে আনিয়ে সব গান ঝালিয়ে নিয়েছে। গোবরাও ভীমের পার্ট হাতে পেয়ে আর একবার সড়গড় করে নেয়।

কেশব দত্ত জানে আমরা আসছি, তার বাড়িতে সেও আমাদের পথ চেয়ে আছে। কিন্তু বেলা শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামে তবু আমাদের দেখা না পেয়ে হতাশই হয়।

বাড়িতে তার স্ত্রী বলে—এত দূরের পথ, হয়তো কাল আসবে। কিন্তু রান্নাবান্না করলাম ওদের জন্য। কিন্তু আমাদের দর্শনও পায় না। ওর স্ত্রী শুধোয়—হ্যাঁ গো, আসবে তো? না হলে কী হবে আমাদের? কেশব দত্ত তেমন কোনো সদুত্তরই দিতে পারে না।

বইঘর.কম

বলে—কলকাতার ছেলে। আমাদের জন্য বিপদের মধ্যে কেন আসবে?

তবু কেশবের বৃদ্ধা মা বলে, ওসব কেন বলছিস? যখন পটলার বন্ধু তারা ঠিকই আসবে। যা পথঘাটের অবস্থা কোথায় আটকে গেছে, না হয় কালই আসবে বাছারা।

বাছারা অর্থাৎ আমরা তখন সবুজসাথী দলের প্যান্ডেলের সাজঘরে। আমিও ইয়া দাড়ি লাগিয়ে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে কমণ্ডলু হাতে ঋষি সেজে বসেছি।

সে এক পেল্লায় কাণ্ড। ফটিক তো এখন লালপাড় শাড়ি পরে ফলস চুল লাগিয়ে একদম নিয়তি সেজে গুনগুন করে গানের কলি ভাঁজছে আর গোবরা গদা হাতে দাঁত কিড়মিড় করে ভীমের মত সাজঘরে পায়চারি করছে। কর্তৃপক্ষ হোঁৎকাকেও কি একটা পার্ট দিতে চেয়েছিল কিন্তু ওর ওই খাঁটি বাঙাল ভাষা শুনে আর সাহস করেনি।

কারণ মহাভারতে তেমন কোনো বাঙাল চরিত্র নেই। তাই হোঁৎকা পার্ট না করে ওদের ভলেনটিয়ারদের নেতাই সেজে গিয়ে যাত্রার আসর ম্যানেজ করতে শুরু করেছে।

প্যানডেল থইথই করছে। কলকাতার নামিদামি আর্টিস্টরা এসে গেছে। লোকজন যেন ভেঙে পড়েছে। আর যত জোরে কনসার্ট বাজছে ততই দর্শকরা টিকিট কেটে ঢুকছে। ঢোলেও চাঁটি পড়ছে আরও জোরে। গুরুগুরু শব্দ ওঠে, কর্নেটওয়ালা গাল ফুলিয়ে তত উচ্চগ্রামে কর্নেট বাজাচ্ছে।

ধনকেষ্ট এই দিগরের বিশিষ্ট ব্যক্তি। এককালে অবশ্য ওর পিতৃদেব হাড়ভাঙা হলুদপুরের জমিদার মিত্র চৌধুরীদের গোমস্তা ছিল। পাইক সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে মহালে গিয়ে খাজনা তুলে চেকমুড়ি দিত। জমিদারের হাটে গাছতলায় বসে পড়ে ব্যাপারীদের কাছে হাটের তোলা তুলত। সবই অবশ্য জমিদারের তহবিলে জমা পড়ত না। তার থেকে অনেক টাকাই নিজের ফতুয়ার পকেটে না হয় গোপনে কাছায় বেঁধে আনত।

এই নেওয়ার অভ্যাসটা বাড়তে বাড়তে ক্রমশ স্বভাবেই পরিণত হয়। টাকা থেকে সেটা উপরে উঠল, বেনামিতে জমিদারের খাস জমি, বাগান পুকুর এসবও গ্রাস করতে শুরু করল।

আর জমিদারবাবুও বৃদ্ধ হয়েছেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। জামাই কোথাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ফলে বাইরে থাকতে হয়। জমিদারবাবুর দেখাশোনা করার তেমন কেউ নেই।

ফলে ধনকেষ্টর বাবা হরেকেষ্ট দাশই সর্বস্ব গ্রাস করল।

আর ধনকেষ্টও বাবার যোগ্য পুত্র। যোগ্যই নয় বোধহয় বদবুদ্ধিতে বাবাকেও ছাড়িয়ে যায়। জমিদারবাবু মারা যেতে ধনকেষ্ট এবার এক দলিল বের করে, তাতে দেখা যায় জমিদারবাবু নাকি তার বসতবাড়ি বেশ কিছু বাগান ওই ধনকেষ্টকে বিক্রি করেছেন।

সেই খবর পেয়ে ডেপুটিগিন্নি অর্থাৎ জমিদারের মেয়ে আসে। ধনকেষ্টও এসে এবার তার দলিলের কথা জানিয়ে এসবের দখল চায়। নানা বাদ-বিতণ্ডার পর জমিদারের মেয়ে বন্দনা দেবীই স্বামীর চিঠি পেয়ে ফিরে যায়।

আর ধনকেষ্টই রাতারাতি এখানের জমিদার হয়ে বসে। এখন সেই জমিদারি চলে গেছে। কিন্তু ধনকেষ্ট ওই বিশাল বাড়ি সব সম্পত্তি দখল করে নানা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। টাকার

জোরে আর গ্রামের লোকদের নানাভাবে শাসিয়ে ভোটে জিতে এখানের প্রধানের পদ পরপর চারবার কায়েম করে রেকর্ড করতে চলেছে। সামনের বারও জিতবে।

ধনকেষ্ট ওই হলুদপুরের সবুজসাথী দলকেই তেমন কায়দা করতে পারেনি। ওখানে নেতা বাদলমাস্টার বেশ সৎ আর জনপ্রিয়।

তার ক্লাবের ওই অনুষ্ঠানকে পণ্ড করার জন্যই ধনকেষ্ট গোপনে সব খবর রেখেছে। তার চেলাদেরও গতি সর্বত্র। তারাও চায় হাড়ভাঙা হলুদপুরে বাদলমাস্টার অপদস্থ হোক। প্যানডেল এরাই জ্বালিয়ে দেবে। তাই ওদের অনুষ্ঠান পণ্ড করার জন্যই ধনকেষ্ট ওই তাপ সিং আর নন্দ মাতালকে পাঠিয়েছিলেন যাতে বাস থেকেই ওরা সেই যাত্রার দলের লোকদের বিদায় করে।

টাকমাথা তাপ সিং আর নন্দ ফিরে এসে বলে যাত্রার দলের লোক কেউ আসেনি। কটা ফচকে ছোঁড়াদের দেখলাম। কোনো পিসে না মেসোর বাড়িতে আসছে।

ধনকেষ্ট আরও সাবধানী ব্যক্তি। সে ওর আগেই স্টেশনেই লোক পাঠিয়েছে গাড়ি দিয়ে। তার বিশ্বস্ত অনুচর কালীচরণ নিজে গিয়েছিল আর চুঁচুড়া স্টেশনে ওই দলের পাঁচ-সাত জন সাজের বাক্স টাক্স নিয়ে নামতেই খপ করে তাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে এসেছে গোবিন্দপুর ঘাট অবধি।

গোবিন্দপুর বেশ বড় গঞ্জ। ধনকেষ্টর সেখানে ধানকল আড়ত এসব আছে।

আর গোবিন্দপুরের খাল বেয়ে জলপথে আসা যায় হাড়ভাঙা হলুদপুর। জমিদার বাড়ির পিছনেই সেই খাল। ধনকেষ্ট দুটো মজবুত নৌকায় ঘর বানিয়ে মোটর ফিট করে নিয়েছে।

সে ওই মোটর বোট হাঁকিয়ে যাতায়াত করে আরামে। তার ওই পথের কোনো দরকার নাই। তাই ওই পথের জন্য টাকা ফি বছর স্যাংশান হয় পঞ্চায়েত থেকে, ব্রিজও করানো হয় খাতায়-কলমে। আর লাখখানেক টাকা প্রতিবছর ওখান থেকেই তার পকেটে আসে। রাস্তা যেমন ছিল তেমনিই থাকে।

ধনকেষ্টর লোক কালীচরণ এর মধ্যে ওই পার্টিকে এনে হাজির করেছে ধনকেষ্টর বাড়িতে।

ধনকেষ্টকে তারা বলে—টাকা নিয়েছি, ওদের যাত্রার আসরে যেতেই হবে। কেন আটকে রেখেছেন? আমরা যাবই।

ধনকেষ্ট গর্জে ওঠে—কালী, ওদের বলে দে, যেন বের হবার চেষ্টা না করে। করলে লাশ পুঁতে দেব খালের বালিতে।

ওদের কালী বলে—বাবুরা, খান দান ঘুমোন। কাল ভোরে লঞ্চে করে গোবিন্দপুরে তুলে দেব। রা কাড়লে বিপদ হবে। লোকগুলোকে আটকে রেখে ধনকেষ্ট খুব খুশি হয়ে ঘন ঘন পা নাচাতে নাচাতে বলে—কালী এবার বিশ-পঁচিশজন ছেলেকে পাঠা। রেডি হয়ে যাবে। ওদের প্যানডেলে আজ যাত্রা হবে না। ওরা গোলমাল করে চেয়ার টেয়ার ভেঙে ওদের মাইক লাইট যা পাবে লুট করে নেবে। তেমন বুঝলে প্যানডেল জ্বালিয়েই দেবে।

কালীচরণ এসব কার্যে খুবই অভ্যস্ত।

সে বলে—এ তো সামান্য কার্য বাবু, হয়ে যাবে। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এতক্ষণ ওই পাড়ার যাত্রার আসরের মাইকও নীরব ছিল। বংশীগোপাল, বাদল মাজীরা

বইঘর.কম
সবাই চরম বিপদে পড়েছে। বেশ বুঝেছে ধনকেষ্ট তাদের এইভাবে সর্বনাশ করেছে। যাত্রা হবে না। টিকিটও বিক্রি করেছে।

লোকজন আসছে, জনতার ভিড় বাড়ছে তারপর যখন খবর পাবে কলকাতার অভিনেতারা আসেনি তখনই প্যানডেলে দক্ষযজ্ঞ শুরু হবে।

ঘাবড়ে গেছে ওরা।

মাইকের বাদ্যিও থেমে যায়। এমন সময় আমাদের আশ্বাস পেয়ে বাদলমাস্টার বলে—বাঁচালে ভাই।

বংশী বলে—তাহলে ভূষিমাল ধরে আনিনি। কেশবদাকেও খবর পাঠাচ্ছি। তোমরা সব মেক আপে বসো।

তারপরই গলা তুলে প্রচার পার্টিকে বলে—মাইকিং কর। ওই ধনকেষ্টর বাড়ির সামনে দিয়ে জোর জোর করে মাইক বাজাবি।

ধনকেষ্ট হঠাৎ একসঙ্গে এতগুলো চোঙা চারদিকে সরব হয়ে উঠতে অবাক হয়। ওরা ঘোষণা করছে কলকাতার দলের অভিনেতৃবৃন্দ এসে গেছেন। তাদের মনমাতানো অভিনয় দেখে ধন্য হন। আসুন—ধেয়ে আসুন—দৌড়ে আসুন—হেঁটে আসুন! সার্থক পালা কর্ণবধ দেখুন।

ধনকেষ্ট গর্জে ওঠে,—কারা আবার এল রে? ওদের যাত্রা হবে বলছে। কালী বলে—কে জানে হয়তো কালকেপুর থেকে দু-একজনকে ধরে এনে কলকাতার মাল বলে চালাচ্ছে।

কিন্তু কলকাতার নাম করছে, এদের ঠিক এনেছিস তো?

ব্যাটারা ভূষিমাল!

কিন্তু আমাদের ফটিক যে ভূষিমাল নয় তা পয়লা সিনেই জানিয়ে দিয়েছে, জানিয়েছেও চমৎকার আর গানও ভালোই গায়, বিশেষ করে কালোয়াতি ধরনের গান। নিয়তির ওই রাগ-রাগিণীর উপর গান একখানা গাইতেই আসর মাত।

জনতা হাততালিতে ফেটে পড়ে। অনেকেই বলে, আরে কলকাতার নামি গাইয়ে, গাইবে না? দ্যাখ গান কাকে বলে। আমি তো দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে দমভোর চিৎকার করে কর্ণকে হুঙ্কার দিয়ে চলেছি। দাড়িতে বোধহয় ছারপোকা বাসা বেঁধেছে, গালে আঠা আর ছারপোকার পিটপিটুনি তবু থামেনি। হাত-পা ছুঁড়ে দাপাদাপি করছি। তখনকার দিনে মুনিরা নাকি পান থেকে চুন খসলেই অভিশাপ দিত।

সেই মেজাজে হুঙ্কার ছাড়তে যেন আসরে পায়রা উড়ে গেল। আমিও হাততালি কুড়িয়ে আসর মাতিয়ে কলকাতার নাম বজায় রাখলাম।

আর কর্ণ অর্জুন এদের তুলনায় অভিনয় করছে আমাদের ভীম অর্থাৎ গোবর্ধন অনেক সেরা। হাতে পেল্লায় গদা। গোবরা নেচে নেচে কথা বলছে আর গদা হাতে রীতিমত ক্যারাটের পোজ দিয়ে স্টেজ মাতিয়ে অ্যাকটিং করে চলেছে।

রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সিনে তো ডবল অ্যাকশান পেল একা ওই গোবরাই।

ধনকেষ্টও এসেছে গোপনে।

তার দলবল আসরের এদিকে ওদিকে মজুত রয়েছে। কোনোরকম খুঁত পেলেই স্বমূর্তি

ধারণ করবে। তারা দু-একটা ফোড়ন কাটতে গেছল। কিন্তু পাশের লোকজনরাই তাদের থামিয়ে দেয়।

—চুপ করে বোস।

কেউ বলে, এমন জমাটি যাত্রা বহুকাল দেখিনি। ভালো না লাগে উঠে যা। গোল করলে বের করে দেব।

তারাও আর গোলমাল করতে পারে না।

যাত্রায় আমার নাম উঠেছে।

বাদলমাস্টার এখানের স্কুলের মাস্টার। সে ওই মিত্র চৌধুরী পরিবারেরই ছোট তরফের ছেলে। সেও চেনে ধনকেষ্টকে। বাদল এই এলাকা থেকে অঞ্চলের প্রতিনিধি, কিন্তু তার দল পঞ্চায়েতে বেশি নাই, তাই ধনকেষ্টকে সে ঘা মারতে পারেনি। তবু তার সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। এলাকায় ধনকেষ্টর প্রতিপক্ষ সেইই।

তাই বাদলকে জব্দ করার জন্যই ধনকেষ্ট এই করেছিল আজ। কিন্তু ধনকেষ্ট পারেনি। ওদের হাতে হঠাৎ কলকাতার ওই ক'টা ছেলে এসে গেছল। তারাই সব শুনে ওদের হয়ে আসরে নেমে বাজিমাত করেছে। বাদল দেখে হঠাৎ ধনকেষ্টবাবুকে, কালীচরণকে নিয়ে এদিকে এসেছিল সে, আর ধরা পড়ে যাবে ভাবেনি। বাদল সব জেনেও না জানার ভান করে ওকে আপ্যায়ন করে—আসুন, আসুন। যাত্রা দেখবেন না? ওরে দুখান চেয়ার দে। ডায়াসের পাশে।

বসতে হয় ধনকেষ্টকে, ধনকেষ্ট ছটফট করছে।

বাদল, বংশীও এসে জোটে। বংশী শুধোয়—কেমন দেখছেন কেষ্টবাবু?

ধনকেষ্টও অবাক হয়। নিয়তি দারুণ গাইছে। আসর মাতিয়ে দিয়েছে। আর ভীম তো ভীমই। সেজে গুজে গদা ঘুরিয়ে জোর অভিনয় করছে। বংশী বলে—কলকাতার অভিনেতা।

গজরায় মনে মনে ধনকেষ্ট। তাকে এভাবে উল্টে ফাঁসাবে। তার সব প্ল্যান বানচাল করে ওরা যাত্রা শেষ করল। হইহই পড়ে যায়।

ধনকেষ্ট কোনোমতে জ্বলতে জ্বলতে বের হয়ে আসে। গজরায়—এদের পেল কোত্থেকে? ওই ছোঁড়াগুলোকে? আমার নাকে ঝামা ঘষে দিল। কোনো কম্মের নোস তোরা। যে কটাকে ধরে এনেছিস ভোরেই পাচার করে দে। একটা কাজ যদি পারিস সঠিকমতো করতে।

যাত্রার পর এবার বাদল বংশীর দল আমাদের জড়িয়ে ধরে।

দারুণ বিপদ থেকে উদ্ধার করলে ভাই। এমন সময় কেশব দত্ত এসে হাজির হয়। সে এসেছিল যাত্রা দেখতে। অবশ্য আমি, ফটকে, গোবরা তো রীতিমত অন্য বেশে। চেনা সম্ভব ছিল না। তবে হোঁৎকা পটলার কোনো চান্স ছিল না। একজন খাস বাঙাল আর পটলার জিভ তো ব্রেক ফেল করে আটকে যায়। পটলারও বিপদ। সে এমনিই ছিল গ্রিনরুমে। কেশববাবু ভিতরে এসে ওকে আর হোঁৎকাকে দেখে অবাক।

—তোমরা এখানে?

তারপরই বাদলমাস্টার বংশীদের ওই কথা শুনে কেশবও ভরসা পায়, বলে সে—তা

বইঘর.কম

সত্যি। ওরা অনেকের বিপদ নিবারণ করে হে। আমার ওখানেই তো ওদের আসার কথা, তা তোমরা পেলে কোথা থেকে?

বংশীগোপাল বলে—পেয়ে গেলাম নয়, কেশবদা, ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন। না হলে ধনকেষ্টর দল আজ আমাদের প্যান্ডেলে আগুন ধরিয়ে দিত। ওরাই বাঁচিয়েছে।

বাদল বলে—শুধু বাঁচায়নি, ধনকেষ্টকে মুখের মত জবাবও দিয়েছে।

এবার আমরাও ধড়াচূড়া ছেড়ে আসি।

কেশব দত্তও খুশি হয়। তাহলে ফুল টিমই এসে গেছে? ভেরি গুড।

তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। বাদলমাস্টার বলে—কেশবদা, কাল সকালেই ওদের তোদের বাড়ি পৌঁছে দেব। আজ রাতে ওদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আমার ওখানেই হয়েছে।

কেশব দত্ত বলে—পটল, তাহলে কাল সকালেই চলে আসবে আমার ওখানে।

বংশী বলে—আমি নিজে পৌঁছে দেব।

রাতে খাবার দাবারের তোড়জোড় কম নয়। কর্মকর্তাদের দু একজনও খেতে বসেছে আমাদের সঙ্গে। রুটি, তার সঙ্গে মাছ আর মুরগির মাংস, শেষপাতে ইয়া সাইজের রাজভোগ। হোঁৎকা খেতে খেতে বলে—নাহ্, আজ দারুণ নাটক করেছিল ফটকে। গোবরা তরে আর কুমড়ো কইব না-রে মামার আড়তে কুমড়ো। দারুণ পোজ পশ্চার দিতে আছিলি।

পটলা বলে—ওরাই সে-সেভ করেছে।

হোঁৎকা মাংসের হাড় চিবুতে চিবুতে বলে তা সত্যিই। নালি আমাদের নামও খারাপ হইত। হালায় ধনার জন্যে।

যে করে হোক, ওরে, টাইট দিমুই।

বাদলমাস্টার শুনছে আমাদের কথাটা। বলে সে—পারবে তোমরা ওকে জব্দ করতে?

—দেখি।

বাদল বলে—যা সাহায্যের দরকার হবে বলবে। আমরাও চাই ওর মুখোশ খুলে দিতে। কেশববাবুরও সর্বস্ব গ্রাস করার মতলব করেছে শুনলাম।

পটলা বলে—তাই তো আসা। দেখি যদি কিছু করা যায়। বংশী বলে, কেস কাছারি করেছে, উলটে শাসাচ্ছে ওকে। বাদল বলে কত লোকের যে সর্বনাশ করেছে তার ঠিক নাই। এখন কি সব ব্যবসা করে কে জানে। রাতের অন্ধকারে লঞ্চে নানা মালপত্র আসে।

—কী মাল?

বংশী বলে কে জানে? ওর দাপট বেড়েই চলেছে। অঞ্চলপ্রধান। গোপালগঞ্জের থানার দারোগা তো ওর হাতের লোক।

হোঁৎকা সব কথা মন দিয়ে শোনে আর নীরবে মাংস ছেড়ে এবার রাজভোগের দিকে নজর দিয়েছে। বলে নাহ্, আপনাগোর এহানের রাজভোগ খাসা। ওর পাতে আর হাফ ডজন রাজভোগ এসে পড়ে। হোঁৎকাকে বলি—এবার থামা, পেট ছাড়বে।

হোঁৎকা বলে—ডিসটার্ব করস না।

গ্রামের সকালটা সত্যই সুন্দর। ভোর হবার সময় থেকেই আকাশে রংয়ের খেলা শুরু হয়।

Boighar.com

পাখিদের কলরব ওঠে। রকমারি পাখির ডাক সবুজ গাছপালা। এখন গ্রীষ্মের দিন। বেলা হলেই রোদ বাড়বে। তবু সকালটা মিষ্টিই।

ঘুম ভাঙায় চা আনে বংশীগোপাল।

এরা প্রথমে এনেছিল ভুল করে। কিন্তু তাদের ওই যাত্রা উতরে যেতে এখন খুবই ভদ্র ব্যবহার করছে।

পটল বলে—হোঁৎকা। বাণ্ডিল বাঁধ। এরপর কেশববাবুর বাড়িতে যেতে হবে। আ-আসল কাজই বাকি।

হোঁৎকা বলে—হইব। চা খাতি দে।

কেশববাবু সকালেই সাইকেল নিয়ে হাজির। আমাদের নিয়ে যাবার গরজ তারই বেশি। আর আমাদের এলেমের পরিচয় তো কাল রাতেই পেয়েছে সে। বাদলবাবু, বংশী বলে—গ্রামেই তো থাকলে, দেখা হবে।

বের হয়ে এলাম আমরা।

কেশব দত্তের বাড়িটা গ্রামের এদিকে।

আমাদের পথে পড়ে ধনকেষ্টর দখল করা সেই প্রাসাদ। একটু দাঁড়ালাম। পিছনেই খালটা বয়ে গেছে। এদিকে বেশ বাগান—তারপর বাড়িটা। একদিকে নতুন করে গড়ে বাস করে ধনকেষ্ট। বাকি ওদিকটার পুরানো বাড়ি এখন মেরামত অভাবে কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে।

কেদারবাবু বলে—এসবও জাল দলিল বলে দখল করা। লোকটার লোভও খুব।

কেশববাবুর বাড়িতে আমাদের জন্য ব্যবস্থা করাই ছিল। ওপাশে বৈঠকখানা বাড়ি, তার দোতলায় একটা হলঘর। লাগোয়া বাথরুমও রয়েছে। উঠানের কুয়ো থেকে পাম্প ফিট করে উপরে জল তোলার ব্যবস্থাও রয়েছে।

ওই হলঘরেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আর কেশববাবুর মা বলেন, কলকাতা থেকে এলে বাবা। এসময় পুকুরের মাছ, বাগানের আম, কাঁঠাল খাওয়াবো তার উপায় নেই। সব রাহুর গেরাসে যেতে বসেছে।

তবু ঘরের দুধ, পাশের পুকুরের মাছ ঠিকই জুটছে। সেইদিন দুপুরে খাবার পর এবার কেশববাবু তাদের উপর অত্যাচারের কাহিনি শোনায়।

এর মধ্যে মামলাও করেছে। ধনকেষ্টও বাগান পুকুর দখলের জন্য মামলা লড়ছে। সামনের সপ্তাহে দিন পড়েছে চুঁচুড়া কোর্টে।

জেলা জজের আদালতে যদি হেরে যাই সব ওর দখলে চলে যাবে।

বৈকালে বাগান পুকুর দেখতে গেলাম।

কেশব দত্ত অবশ্য কিছুটা সঙ্গে যায়। বলে সে, সামনেই বাগান, ওদিকে দেখবে বড় পুকুর।

ফটিক বলে আপনি যাবেন না?

কেশব বলে—কাছে যাব না। আমাদের উপর কোর্টের অর্ডার আছে। গেলে ধনকেষ্ট আদালতে জবরদখল, না হয় অনধিকার প্রবেশের কেস করে দেবে।

হোঁৎকা বলে যাবেন না। আমরাই যাইত্যাছি।

বইঘর.কম

বাগানটা দেখার মতো। বিশাল আর সুন্দর। গাছগুলোয় প্রচুর আম এসেছে। আম কাঁঠাল লিচু, নানা ফলের গাছ ভরে ফল এসেছে। আর পুকুরের জলে মাছের ঘাই দেখে মনে হয় বড় বড় মাছই রয়েছে।

এমন লাখ কয়েক টাকার সম্পত্তি স্রেফ ধমক দিয়ে দখল করে নেবে লোকটা।

বাগানের ওদিক থেকে ফিরছি। হঠাৎ সেই টাকওয়ালা গোঁফসমেত লোকটাকে দেখে চাইলাম। লোকটাও বাগানের আশেপাশেই নজর রেখেছিল। আমাদের ওখানে দেখে এগিয়ে আসে। শুধোয় সে, এখানে ভি এসেছো? কি করছিলে তুমলোক? হোঁৎকা বলে ওঠে—তুম কোনো আছস রে? আমাদের জবাব চাইত্যাছ?

লোকটা এমন বিচিত্র ভাষা শোনেনি। সে গর্জে ওঠে, ইধার আসবে না।

কে-ক্যা-ক্যান, পটলাও চটে উঠেছে। চটে উঠলে ওর জিভটা আগেই বিট্রে করে। লোকটা বলে—এ ধনকেষ্টবাবুর হুকুম। নয়া কেউ এলে খপর দিতে হোবে। গোবরা বলে—তোর ধনকেষ্টকে বলগে—তার বাপ এসেছে। ফোট বে।

গোবরার ওই গর্জনে একা ওই টাকওয়ালা ঈষৎ ঘাবড়ে যায়। আমরাও এগিয়ে আসি।

আর দেখি সেই টেকো লোকটা দূর থেকে আমাদের দিকে নজর রেখেছে। বোধহয় ও জানতে চায় কোথায় উঠেছি আমরা।

এর মধ্যে কেশববাবুও এসে পড়ে। সেও ওই ব্যাপারটা দেখেছে।

তাই শুধোয়, কি বলছিল ওই তাপ সিং?

ওর নামটাও জানতে পারি।

—তাপ সিং।

কেশব দত্ত বলে—হ্যাঁ। ব্যাটা ওই ধনকেষ্টর লোক। এখানে তোমাদের ঘুরতে দেখে সন্দেহ করেছে। হোঁৎকা বলে—করুক গিয়া। পিসা বাগান পুকুরখান সরেস।

—কিন্তু কী হবে কে জানে?

হোঁৎকা বলে—ওই ধনকেষ্টর দর্শন একবার পাওয়া দরকার। খবর দিতি হইব।

আমি বলি সে ঠিকই হবে। ব্যাটা আমাদের সব খবরই ঠিক পাচ্ছে।

ধনকেষ্ট কাল থেকেই বিগড়ে রয়েছে।

এমন প্ল্যানটা বানচাল হয়ে গেল। কাল থানায় খবর দিয়ে পুলিশও এনে রেখেছিল। সে তহবিল তছরুপ, পাবলিককে প্রতারণার দায়ে বাদল মাস্টারকে অ্যারেস্টও করাত, ক্লাবের সেক্রেটারি হিসাবে ওপাড়ার আরও কজনকে হাজতে পুরত, কিন্তু তা হয়নি।

ক'টা ছেলে কোথা থেকে উড়ে এসে তার বাড়া ভাতে ছাই দিল।

ধনকেষ্ট বৈকালে অফিসে বসে হিসাব করছে। তার গুদামে এখানে প্রচুর কেরোসিন তেল বেবি ফুড স্টক করা আছে। নামিদামি কোম্পানির বেবি ফুডের টিনভর্তি প্রচুর পেটি আনা হয়। সেগুলোয় সে আজেবাজে গুঁড়ো দুধ ময়দা মিশিয়ে পুরে চালান দেয় বিভিন্ন গঞ্জের পাইকেরি বাজারে। এছাড়া ইদানীং আরও সব কারবার শুরু করেছে। নিজের দুটো লঞ্চও খাল দিয়ে গঙ্গা নদী দিয়ে নানা রকম মাল আনা নেওয়া করে। তারই হিসাব করছে। সামনের সপ্তাহে ওই

Boighar & MAH

বাগান পুকুরের মামলার রায় বের হবে। তার আগেই সদরে যেতে হবে মামলার তদ্বিরের জন্য। জজ কোর্টে হেরে গেলে কেশব দত্ত হাইকোর্টে যেতে পারবে না। ওই সম্পত্তি তার দখলেই আসবে।

এমন সময় হঠাৎ তাপ সিংকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে শুধোয় সে—কী ব্যাপার?

তাপ সিং বলে—ওই কালকের ছোকরাদের দেখলাম বাবুজি বাগান, পুকুরের চারোতরফে ঘুমছে আর কি বলাবলি করছে। আমি পুছ করতে হামাকে বলে—তোর বাবুর বাপ আছি হামরা। পাঁচটো বাপ!

ধমকে ওঠে ধনকেষ্ট তার পাঁচ পিতৃদেবের খবর পেয়ে।

—চোপ! কি যা তা বলছিস?

তাপ সিং বলে আমি বোলছে না বাবুজি ঔরা বলছে। আউর দেখলাম ওই ছোকরা ওই কেশব দত্তের সঙ্গে ঘুরছে। ওর বাড়িতেই ভি রয়েছে।

এবার ধনকেষ্ট সজাগ হয়। তাপ সিং বলছে—ওরাই কাল বংশীবাবুদের সাথে ছিল। ওরাই রাতে নাচ করম ভি করেছে যাত্রার পালায়।

—তাই নাকি! ধনকেষ্ট বলে—তাহলে ওরা যায়নি?

—না। খুদ দেখলো কেশববাবুর বাহার বাড়ির দোতলায় ডেরা গাড়ছে।

ধনকেষ্ট চিন্তায় পড়ে। তাহলে কেশব দত্তই ওদের এনেছে কলকাতার কোনো আত্মীয় বাড়ি থেকে ওকে জব্দ করার জন্য। আর ছেলেগুলো এসে কালই ধনকেষ্টর একটা জবর প্ল্যান বানচাল করে এবার তার ওই বাগান পুকুরের দখলেও বাধা দিতে চায়।

ধনকেষ্ট বলে—কালীকে ডেকে আন এখুনি! বলবি জরুরি দরকার আছে।

তাপ সিং বুঝেছে একটা কিছু ঘটবে। তাই বলে সে—আভি যাচ্ছে আমি।

সন্ধ্যার পর চা আর গরম চপ সহযোগে মুড়ি এসেছে। জমিয়ে চায়ের আসর বসেছে। বাদলবাবু, বংশীগোপালও এসে জুটেছে। কেশববাবুর মামলায় ওই বংশীও সাক্ষী, মামলার আলোচনাও হচ্ছে।

কথায় কথায় জজসাহেবের কথাও আসে।

জজসাহেব বগলাকান্তবাবু খুব কড়া বিচারক। তার বিচারে যা হবে হাইকোর্টও তা নড়াতে পাড়বে না।

কিন্তু খুব কড়া লোক।

হোঁৎকা বলে তাকে সব ঘটনা বুঝিয়ে বলা যাবে না? কেশব দত্ত বলে, কোনো কথাই শোনেন না তিনি। সাক্ষ্য প্রমাণ দেখেই বিচার করেন। আর ধনকেষ্ট এর মধ্যে গাঁয়ের দুতিন জনকে কিনে নিয়েছে। তারাই সাক্ষী দেবে। সব মিথ্যা সাক্ষী।

খুব ভাবনার কথা।

রাতে খাওয়ার পর ভাবছি কী করা যায়।

ভাবনা করেও পথ পাই না। কখন ঘুমিয়ে গেছি জানি না।

বইঘর.কম

হঠাৎ রাতের অন্ধকারে কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে। কি যেন বুকের উপর চেপে বসে গলা টিপে ধরেছে। কাদের দেখছি ছায়ামূর্তির মত ঘরে।

আর্তনাদ করে উঠি।

ওদিকে গোবরা কাকে জড়িয়ে ধরেছে। আর আমাদের সকলেই জেগে উঠতে লোকটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বারান্দার দিকে ছুটে গেল। হোঁৎকার লাথি খেয়ে কে পটলাকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়াল।

গোবরা যে লোকটাকে ধরেছিল সে প্রাণপণে গোবরার হাতে কামড়ে দিতে গোবরা ছেড়ে দেয় তাকে। দুতিনজন লোক এইভাবে বারান্দা থেকে গোয়ালের চালে সেখান থেকে নীচে লাফ দিয়ে কোনোমতে দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আমাদের হইচইয়ের শব্দে ওদিক থেকে কেশববাবু, ওর মা-ও এসে পড়ে। চোরই ঢুকেছিল বোধহয়।

কিন্তু দেখা যায় একটা গামছা পড়ে আছে। এই চোরদের কেউ এটা ফেলে গেছে। চমকে উঠি। বলি—এ তো সেই তাপ সিংয়ের গামছা।

কেশববাবু বলে—তাই তো। ও ব্যাটা এখানে? ব্যাটা ধনকেষ্টর হয়ে কত খুন করেছে তার ঠিক নাই।

হোঁৎকা বলে—বুঝছস! ব্যাটা ধনকেষ্ট জানছে এর পিছনে লাগছি, তাই আমাদের শ্যাষ করতি পাঠাইছিল।

কেশব দত্তের মা চমকে ওঠে।

—মা গো! কি সর্বনাশই না হত। ওরে কেশব—বিষয় যায় যাক, ওই যমের সঙ্গে মামলায় কাজ নাই।

হোঁৎকা বলে—ভাববেন না ঠাকমা। ওই ধনকেষ্ট ভীমরুলের চাকে ঘা দিছে, ওর জবাব নি দিই যামু না।

শুধোই—কী করবি?

হোঁৎকা বলে—ভাবতি দেতো। কুল ব্রেনে ভাবতি পারলে পথ হইবই। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের আমাদের চেনেনি ধিনিকেষ্ট। ওরে নাচাই ছাড়ুম।

সকালে চা মুড়ি খেতে খেতে হোঁৎকা শুধোয় কেশবকে—আগেকার মামলার দিন কবে?

—এই বুধবার। আজ রবিবার।

হোঁৎকা বলে গোবরা তোর কুমড়োমামার বাড়ি ওই হুগলিতে না?

—হ্যাঁ।

হোঁৎকা বলে তিনচার দিন সেখানেই থাকতি হইব। কেসের তদ্বির করণের লাগবো।

গোবরা বলে—ও বাড়ি তো প্রায় খালিই থাকে। কুমড়োর গুদাম আর লোকজন আছে নীচের তলায়। উপরে থাকা যাবে।

হোঁৎকা বলে কেশবকে, আজই ওখানে যাইত্যাছি। আপনি মঙ্গলবার বৈকালে ওখানেই আসেন। বুধবার কেসে দেখি কি করা যায়।

খরচা নাও কিছু। কেশব দত্ত টাকা দিতে চায়। আমাদের ফান্ডে ঠাকমার দেওয়া হাজার

টাকা আমার ব্যাগেই রয়েছে। হোঁৎকা বলে—টাকা লাগবো না। আছে।

হোঁৎকা চুঁচুড়ায় গিয়ে কি করবে কে জানে। হয়তো চেনাজানা কেউ আছে, তাকে ধরবে। অবশ্য পটলার কাকার বন্ধু সেই পুলিশের বড়কর্তাকেও জানাতে হবে ব্যাপারটা। তাই বের হলাম আমরা।

বাদলদাও এসেছে। সে বলে—একি, চলে যাচ্ছ আজই।

হোঁৎকা বলে—না। কাম সাইরাই আসুম এই সপ্তাহেই। আসল কামই তো বাকি। ধিনিকেষ্টর নেত্য দেখুম তখন। বের হই আমরা আবার সেই পথ ধরে। বাদলবাবু, বংশী বলে—আসবে কিন্তু, আশা নিয়ে রইলাম।

খবর সবই রাখে ধনকেষ্ট। গত রাতে সে লোক পাঠিয়ে আমাদের উত্তম-মধ্যম দিয়ে ভয় দেখিয়ে এখান থেকে তাড়াতে চেয়েছিল। তাই সকালেই ওর লোক এসে খবর দেয়।

কর্তা কলকাতার বাবুরা এক রাতের ওষুধেই ভয় পেয়ে ল্যাজ তুলে পালাল।

তাপ সিংও বসেছিল। এসব যেন তার কেরামতিতেই হয়েছে। সে বলে, দেখুন হুজুর, তাপ সিংয়ের খেল।

ধনকেষ্ট খুশি। নগদ দশটাকা বকশিশ করে। তাপ সিং ওই বিশাল গোঁফে তা দিয়ে বলে—হমকো দেখেই এইসা ভয় পাইসে দেখেন বাবুজি।

ধনকেষ্ট বলে—আমার পিছনে লাগবে? এই বুধবার মামলার রায় বের হবে। সাক্ষী প্রমাণ যা নিয়ে যাব দখল পাবই। সেদিন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বাগান পুকুরের দখল নেব।

কালীচরণ বলে ওই ঢাক-ঢোলও মজুত রাখব। বৃহস্পতিবারই দখল নিতে যাব।

হ্যাঁ। সদরে যাবার ব্যবস্থা করো মঙ্গলবার।

কালীচরণ বলে লঞ্চ তো মাল আনতে যাবে। মাল ওদের রাতের অন্ধকারেই আসে। এখন ধনকেষ্ট কলকাতাতেই ব্যবসা শুরু করেছে। বলে সে—সাবধানে মাল আনবি। আর এখানের মালও কিছু যাবে। সিধে ডকের জাহাজে তুলে দিতে হবে।

ইদানীং ধনকেষ্ট এক নতুন ব্যবসা শুরু করেছে। দূর গ্রাম-গ্রামান্তরে বহু প্রাচীন মন্দির আছে—তাদের দেবমূর্তি ও বহু প্রাচীনকালের দ্বারবাসিনীর পুরানো কেল্লার জঙ্গলেও বহু পাল সেন যুগের মূর্তির সন্ধান পেয়ে ওসব লোক দিয়ে চুরি করিয়ে আনে।

প্রায়ই অনেক মন্দিরের প্রাচীন মূর্তি চুরি যাচ্ছে। পুলিশেও রিপোর্ট হয়। খবরের কাগজেও এসব খবর ফলাও করে বের হয়। শোনা যাচ্ছে এই সব পুরাতন মূর্তি লাখ লাখ টাকা দামে বিদেশে পাচার হচ্ছে।

কিন্তু পুলিশে কোনো কিনারাই করতে পারেনি। সদরের পুলিশের কর্তাও বিপদে পড়েছে।

এদিকে ওই কাজ সমানেই চলেছে।

ধনকেষ্ট অঞ্চলপ্রধান, সেও এখানের লোকদের চাপে পড়ে সদরে গেছে। কর্তাদেরও নালিশ করেছে।

কিন্তু আড়ালে সেই-ই এই ব্যবসা করে এখন প্রভূত রোজগার করছে, তার নিজস্ব দুটো লঞ্চ মাল বয়—আর গোপনে এসবও করে। অথচ বাইরে সেও আন্দোলন করে—এই জাতীয় সম্পদ চুরি বন্ধ করতেই হবে।

বইঘর.কম

আপাতত কিছু দামি মূর্তিও আসার খবর আছে। তার খদ্দের ঠিক করতে কলকাতায় যাবে ধনকেষ্ট—ফেরার পথে মামলায় বিজয়ী হয়ে এসে ওই বাগানের দখল নেবে।

কেশবকে হারাতে পারলে তারপর গদাধর মাইতির ধানকলও দখল করবে। লোকটা খুব বেড়েছে। ধনকেষ্ট তার পরিকল্পনা মতই এগিয়ে চলেছে।

আমরা হুগলিতে এসে গোবরার মামার কুমড়োর গুদামের উপর বিরাজ করছি। এখানেও ঠাট বাট, লোকজন সবই আছে। ওদিকের গোয়ালে জার্সি গরুও রয়েছে, আর আছে দাড়িওয়ালা বিশাল একটা পাঁঠা ছাগল। ইয়া দাড়ি আর দুখানা শিং-ও বেশ পাকানো।

ছাগলটা তেমনি শয়তান। তার অভ্যাস সামনের দু-পা তুলে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে সপাটে বডিওয়েট দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুঁতো মারা। ছাগল যে এত মারকুটে হয় জানা ছিল না। গোবরা ওকে আদর করতে গেছে আর গোবরাকেই নিপুণ বক্সারের মত এইসা হাঁটুতে ঝেড়েছে এক গুঁতো যে গোবরাও ছিটকে পড়ে।

আমি তো লাফিয়ে সরে আসি। আমাকে ওইসা গুঁতো ঝাড়লে ছিটকে পড়ব।

গোবরা উঠে ছাগলটাকে মারতে যাবে, হোঁৎকা বলে মারিস না। ওই আমাগোর ফ্রন্ড।

অবাক হই, বলি—তোর মতলব কি বলত হোঁৎকা? ছাগল, ওই শয়তান ছাগল হবে বন্ধু।

ওই ছাগলটাকে খোঁয়াড়েও নেয় না। সকালে বের হয়। বাজারের দিকে ঘুরে ফিরে এর কলা, ওর মুলো, তার আলু কপি খেয়ে বৈকালে হেলতে দুলতে ফিরে আসে এখানেই।

সেই দিন সন্ধ্যাতেই বাজারে গিয়ে হোঁৎকা আমরা কাছ থেকে শ তিনেক টাকা নিয়ে আম-আনারস-আপেল সরেস মর্তমান কলা—কিছু ফুল এসব কেনে। একটা নতুন ঝুড়ি। আর রঙিন কাগজ এসবও কেনে। শুধোই কি হবে এতে।

হোঁৎকা বলে, কাম আছে—যা কই কর।

বাড়িতে এসে রঙিন কাগজে একটা কালির খালি বোতলে জল পুরে মোড়া হল। আর সুন্দর করে ঝুড়িটাকে সাজানো হল—ফল, দু প্যাকেট মিষ্টি—ওই কাগজে মোড়া বোতল আর দুটো মুরগিও কিনে ঠ্যাংয়ে দড়ি বাঁধা হল আর ওই দাড়িওয়ালা ছাগলটাকে বাঁধা হল আজ রাতে—সকালে যাতে না পালাতে পারে।

এরপর বাজারে একটা কুলিকে ভাড়া করে তার মাথায় ওই সুন্দর ঝুড়ি ফুল চাপানো হল আর দড়ি বাঁধা সেই দাড়িওয়ালা বোকা পাঁঠাকেও কিছু পাতা দেখিয়ে কুলির সঙ্গে যেতে বাধ্য করে হোঁৎকা বের হল।

ও বলে তরা আমারে এহন চেনস না, দূরে দূরে আইবি।

কোথায় চলেছে হোঁৎকা কে জানে!

নীরব অচেনা দর্শকের মত আমিও চলেছি ওর পিছনে, বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে। পটলাও ওদিকে যেন পথ দিয়ে যাচ্ছে মাত্র।

জজসাহেবের বাংলোতেই সটান ঢুকেছে হোঁৎকা ওইসব মালপত্র আর ছাগলটাকে নিয়ে। বাবা, রামছাগলও কি ভেবে শান্তভাবে গুটি গুটি পায়ে গিয়ে ঢুকল ওই বাংলোয়!

জজ বগলাকান্তবাবু রাশভারী মেজাজের লোক। সকালে বাংলোর বসার ঘরে চা-পর্ব শেষ

করে কিছু কেসের নথিপত্র দেখছেন। চুরুট খাওয়া তার অভ্যাস। চুরুটও ধরিয়েছেন। কড়া মেজাজের বিচারক। একেবারে ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি। হঠাৎ হোঁৎকাকে ওইসব মালপত্র নিয়ে আর ওই ছাগল মুরগি নিয়ে ঢুকতে দেখে চাইলেন।

তার বাড়িতে ঢুকে এইসব ভেট দিতে পারে কেউ, এ তাঁর স্বপ্নেরও অতীত।

হোঁৎকা ওসব মালপত্র নামিয়ে প্রণাম করে বলে, আজ্ঞে হাড়ভাঙা হলুদপুরের অঞ্চলপ্রধান ধনকেষ্ট সাহা মশায় হুজুরের কাছে সামান্য ভেট পাঠালেন—তার একটা বাগান দখলের মামলা আছে, এই বুধবার আপনার এজলাসে। আজ্ঞে এই যে মামলার নম্বরও দিয়েছেন। যদি দয়া করে কেসটা জিতিয়ে দ্যান—ধনকেষ্টবাবু আপনারে খুশি কইরা দেবেন। কাগজটাও রেখে দেয় হুজুরের টেবিলে।

এবার বগলাকান্তবাবু বোম ফাটার মত গর্জে ওঠেন।

হোয়াট! ওই ধনকেষ্ট সাহার এতবড় সাহস, আমাকে ঘুষ দিতে চায়? জানো তোমাকে অ্যারেস্ট করাতে পারি। জেলে দিতে পারি?

চাষীর বেশে হোঁৎকা এবার কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে—আমি তার চাকরমাত্র স্যার। পেটের দায়ে একাজ করছি হুজুর—এবারের মত মাপ করে দিন।

জজসাহেব গর্জে ওঠেন।

এসব নিয়ে এখুনি বের হয়ে যাও। গেট-আউট। বেয়ারা—বেয়ারা এসে পড়ে। এর মধ্যেই কাণ্ডটা ঘটে যায়।

সেই রামছাগলটা এবার স্বমূর্তি ধরে বেয়ারাকে এসে লম্ফঝম্ফ করতে দেখে তার সামনে গিয়ে পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে শিং উঁচিয়ে হেলে বডিওয়েট দিয়ে বেয়ারার ডান হাঁটুতেই ঝেড়েছে একখানা মোক্ষম আপার কাট আর বেচারা বেয়ারা ওই আঘাতে ছিটকে পড়ে মেঝেতে। একটা টেবিল ল্যাম্প ধরে সামলাতে গেছে, সেটাকে নিয়েই পড়েছে বেয়ারা আর ছাগলও এবারে জানলা টপকে লাফ দিয়ে সিধে দৌড়েছে বাজারের দিকে। বেয়ারার কপাল-হাঁটুতে চোট। হোঁৎকাও বেগতিক দেখে ওই ঝুড়ি মাথায় করে দৌড়ে গেট পার হয়ে বের হয় রাস্তায়।

বের হতেই একটা চলন্ত রিকশাকে থামিয়ে মালপত্র নিয়ে সোজা একেবারে আমাদের ডেরায়।

এর মধ্যে আমরা ফিরে এসেছি। দেখি ব্যাক টু প্যাভিলিয়ান। শুধোই, কী হল?

হোঁৎকা হাতের মুরগি দুটো দেখিয়ে বলে—জমাট ফিস্ট হইব আজ রাতে। কাল দেখা যাউক কী হয়। চক্কর যা চালাইছি মনে হয় কাম হই যাবো।

এবার ওই ফল মিষ্টি আমাদেরই ভোগে লাগে।

শুধোই, কেনই বা এসব কিনলি?

হোঁৎকা বলে—ধনকেষ্টরে বাঁশ দিতি হইব না। কাল মামলা, চল গুপীনাথবাবুরে যাই কই গিয়া, কেশব পিসাও ওখানেই আইব।

পটলা বলে ক-কাজ হবে তো?

কাজের নমুনাটা দেখার জন্যই আমরাও আদালতে এসেছি। কেশব দত্তও এসেছে। তার

বইঘর.কম

উকিল গুপীনাথবাবু বলে—ওরা তো সাক্ষী, প্রমাণ, কাগজপত্র সব হাজির করেছে, যা কড়া জজসাহেব। কী যে হবে কে জানে।

এমন সময় দেখি ধনকেষ্টও গাড়ি থেকে নামছে। তার একপাশে কালীচরণ। দেখতে কাপালিকের মত চেহারা। ইয়া চুল, কপালে সিঁদুরের টিপ আর চোখ দুটোও সিন্দুরের মত লাল। ওদিকে সেই তাপ সিং। তার মাথায় এখন পাগড়ি তবে গোঁফ দুটো বেড়ালের ল্যাজের মত ঝুলে আছে তার বীরত্বের প্রতীক হয়ে।

হোঁৎকা আর পটলা ওদিকে চা খাচ্ছে—আমরাও রয়েছি। কেশব দত্ত গুপীবাবুর সঙ্গে কথা বলছে হঠাৎ ধনকেষ্ট যেতে যেতে দাঁড়াল। তাপ সিংহ আমাদের চেনে।

আর ওদের সঙ্গে গিলেকরা পাঞ্জাবি কুঁচি ধুতি, হীরের বোতাম লাগানো জামা দেখেই বুঝেছি ইনিই বিখ্যাত ধনকেষ্টবাবু।

একবার তিনি থেমে গিয়ে আমাদের দিকে চাইলেন।

ওই চাহনিটাকে মনে হয় হিংস্র সাপের চাহনির মত আর চাপা রাগে যেন হিস্-হিস্ করছে বলে ধনকেষ্ট চাপাস্বরে বলে—ওই হাড়ভাঙা হলুদপুরমুখো হলে শেষ করে দেব। দেবে তো বুঝেছি। হোঁৎকাও এসে পড়ে। সেই-ই বলে—ক্যান ওটা কি আপনার বাবার জমিদারি যে যামু না?

ধনকেষ্ট বলে, কে হে ছোকরা?

তাপ সিং গোঁফ মুচরে বলে,—মালিক বলেন তো ওটাকেই দিই খতম করে।

ওরা এই কাজ যে খুব ভালো পারে তা বুঝেছি।

গোবরাও পজিশন নিয়েছে। ইদানীং ক্যারাটেও ভালো শিখেছে সে। ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্টও পেয়েছে। ওর একটা লাথিতে তাপ সিং নিরুত্তাপ হয়ে যাবে তা জানি।

কিন্তু ব্যাপারটা গড়াল না বেশি দূর। আদালতের পেয়াদা হাঁক পাড়ে—কেশব দত্ত—ধনকেষ্ট সাহা হাজির—কেশব দত্ত-ও—

অর্থাৎ মামলার ডাক পড়েছে তাই শুনে ধনকেষ্ট ওই বোঝাপড়া মুলতুবি রেখেই দৌড়াল। কেশব দত্তও বিনীতভাবে এজলাসে গিয়ে হাজিরা দেয়।

জজসাহেব ওদিকের বারান্দায় তার খাস কামরা থেকে বের হয়ে আসছেন। পিছনে বেয়ারা। তার কপালে ব্যান্ডেজ, হাঁটুতেও বেশ জখম রয়েছে তা তার হাঁটা দেখলেই বোঝা যায়। কাল হোঁৎকার সেই শ্রীমান অজ ওই কাণ্ড বাধিয়েছে। জজসাহেব গিয়ে এজলাসে বসেন তখনও পেয়াদা হাঁকছে—

ধনকিষ্ট সাহা হা-জির—

জজসাহেব খুবই কড়া আর নিরপেক্ষ বিচারক। কালকের ঘটনাটায় তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। তাকে বাড়ি বয়ে প্রণামী দিতে আসার সাহস রাখে ওই ধনকেষ্ট। তিনি কেস নাম্বার, নাম, কার বিরুদ্ধে মামলা এসব কথাই মনে রেখেছেন। আর বেশ বুঝেছেন যে ওই ধনকেষ্ট একটা অসৎ লোক। তার মামলায় সাক্ষী প্রভৃতিতে প্রভূত গলদ আছে তাই সে ঘুষ দেবার কথা ভাবতে পারে। সমাজে এমনি অসৎ লোকদের তিনি সহজে ছাড়বেন না। না!

তাই ধনকেষ্টকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দেখে চাইলেন। লোকটা উদ্ধত তা বোঝা যায়। নমস্কার করতেও জানে না।

গুপী উকিলকে কাল রাতেই বলা হয়েছিল ওর সব সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষী দেবে। এদিকে কেশববাবুও বাদল মাস্টারকে এনেছে সাক্ষী হিসাবে।

গুপীনাথবাবু শুধোন ধনকেষ্টকে—

—পেশা!

—অঞ্চলপ্রধান!

গুপীনাথ হেঁকে ওঠে ধর্মাবতার, ইনি অঞ্চলপ্রধান হয়েই অর্থাদি রোজগার করেন। এই-ই ওর পেশা। সরকারি অর্থ তছরুপ করেন তা মহামান্য আদালতে দাঁড়িয়ে কবুল করেছেন।

ধনকেষ্টর উকিল শুধরে দেয়—না হুজুর! ব্যবসাদি করেন উনি। ধনকেষ্ট পয়লা জেরাতেই কিছুটা বিপর্যস্ত। গুপীনাথ জেরা করে।

—ধনপতিবাবু ওই পুকুর, বাগান আপনার?

ধনকেষ্ট বলে—আমার বাবার।

তিনি তো দশ বছর গত হয়েছেন। তিনি এর দখল নেননি। দশবছর চুপ করে থেকে হঠাৎ আজ আপনি এর দখলের মামলা করেছেন কেন?

ধনকেষ্ট ঘাবড়ে যায়। এসব কথা উঠবে তা ভাবেনি। ধনকেষ্ট এবারে চুপ করে থাকে। উকিল গুপীবাবু এবার এক এক করে সাক্ষীদের ডাকতে থাকে। ধনকেষ্টর প্রথম সাক্ষী নটবর দাশ। পেশায় নাপিত, হাটে ধনকেষ্টর দয়ায় ঘর পেয়ে সেলুন চালাচ্ছে।

নটবর বলে—আজ্ঞে ওই বাগান পুকুরের ফল মাছ বাবুর দয়ায় আমরাই খেয়েছি। ওসব বাবুরই অর্থাৎ বাবুর দখলেই ছিল।

গুপীনাথের জেরায় নটবর বলে আজ্ঞে হ্যাঁ। এখনও আছে।

গুপীনাথ বলে—হুজুর ধর্মাবতার, ওই ধনকেষ্টবাবু মামলা করার আগেই ওই বাগান পুকুর দখল করেছিলেন, সাক্ষী বলছে। অথচ ধনকেষ্টবাবু নিজে বলছেন—দখল পাবার জন্য এই মামলা করেছেন তিনমাস হল। এ সাক্ষী অসত্য বলছে আদালতে।

জজসাহেব নটবরের দিকে চাইতেই নটবর কেঁদে ওঠে—এসব জানি না হুজুর। ধনকেষ্টবাবুকে চটালে গাঁয়ের বাস উঠবে তাই যা বলতে বলেছেন তাই বলতে এসেছি। দোহাই হুজুর—

পরের সাক্ষী দোলগোবিন্দ কর্মকার।

তার নাম উঠতে তাকে আর পাওয়া যায় না। নটবরের মত ধুরন্দর লোকের কাঠগড়ায় মিথ্যা সাক্ষী দিতে এসে ওই হাল দেখে দোলগোবিন্দ আগেই সরে পড়েছে। উলটে বাদলবাবুই কেশব দত্তের হয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে এবার ধনকেষ্টর বিপক্ষে বেশ কিছু কথা বলে জানায়, ওই বাগান এতদিন কেশববাবুর দখলেই রয়েছে। ওসবের মালিক তিনিই।

জজসাহেব এমনি একটা ধারণাই করেছিলেন। তার মনে হয়, ধনকেষ্টবাবুর মত লোকদের অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি সবদিক বিবেচনা করে কাগজপত্র কেশববাবুর হালফিল খাজনার রসিদ পরচা দেখে এই মামলা ডিসমিস করে দেন। বাগান পুকুরের মালিক কেশববাবুর বলেই রায় দেন আর ধনকেষ্টবাবু আদালতে যে দলিল পেশ করেছেন তার তদন্ত করতেও নির্দেশ দেন। এই দলিল যে জাল সেটা সত্য কি না তদন্ত করা হোক।

ধনকেষ্ট এবার চমকে ওঠে।

বাগান পুকুর তো গেলই। মামলায় গোহারান হেরেছে সে। আর ধনকেষ্ট জানে এই দলিল জাল। বাবার সই, কেশব দত্তের বাবার সই এসব জালই। কোনো আগেকার দলিলে ওদের সইয়ের সঙ্গে মেলালে তা ধরা পড়বে। তাতে জালিয়াতির দায়ে পড়বে ধনকেষ্ট। জেলবাসই হয়ে যাবে।

ধনকেষ্ট কোনোমতে বের হয়ে এল কাছারি থেকে।

কালীচরণ ওদিকে বটগাছের নীচে পলাতক সাক্ষী দোলগোবিন্দ, নরহরিদের ধরে শাসায়—পুঁতে দেব।

আর নটরবকে তাপ সিং এর মধ্যে দুচার রদ্দা দিয়ে ধরাশায়ী করেছে। ওদের জন্যই যেন তাদের কর্তা মামলায় হেরে গেছে।

কেশব দত্ত আজ আদালত থেকে বের হয়ে এসে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরে।

তোমরা না এলে আজ গোহারান হেরে যেতাম। সর্বস্ব চলে যেত।

বাদলমাস্টার বলে, এবার বুঝবে ধনকেষ্ট। চলো—ফেরা যাক।

আমরা বলি—এক নম্বর ওষুধ দিছি, ধনকেষ্টরে এহনও পুরো ডোজ ওষুধ দিতি পারিনি। তাই চল ওখানেই। এবার আর ওই তিনটে বাস ধরে নয়—ঠাকমার দেওয়া টাকা এখনও সাতশোর মত আছে। তার থেকে দেড়শো টাকা কবুল করে একখানা ম্যাটাডোর ভ্যানে করেই এসে নামলাম আমরা সেই খালের ধারে।

ওদিকের মোড়ে তখন ধনকেষ্টর পাঠানো পঞ্চাশখানা ঢাকঢোল-কাঁসি, সব মজুত। তাপ সিং ওদের রেখে গেছে বিজয়ী ধনকেষ্টকে সাথে করে নিয়ে যাবার জন্য। এবার বাদলমাস্টার দেখে বংশীগোপাল হাজির।

কথাটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ধনকেষ্ট ল্যাজেগোবরে হয়েছে। হেরে গেছে মামলায়। আরও কি সব তদন্ত হচ্ছে ওর নামে।

সারা জনতা উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে। আর তারাই ওই ঢাক ঢোল বাজিয়ে এবার আমাদের নিয়েই গ্রামে ঢোকে নাচতে নাচতে। সারা গ্রামের আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে।

আজ বহুদিন পর তারা ধনকেষ্টকে বিপর্যস্ত করতে পেরেছে। লোকটার লোভ আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েছিল। কোনোরকম প্রতিকার করতে পারেনি।

যে ওর বিপক্ষে বলতে গেছে তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে মেরে ধরে তাকে গ্রামছাড়া করেছে। দু-তিনজনকে গায়েব করে দিয়েছে খুন করে। কোনো শাস্তিই হয়নি ধনকেষ্টর। আজ ন্যায়বিচারই হয়েছে।

বাদ্যিবাজনা বাজছে।

ধনকেষ্ট এসে গ্রামে নেমেছে চোরের মত মুখ লুকিয়ে। আর দেখে তার টাকায় পাঠানো ওই ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তারই পরাজয়ে ওরা আনন্দ উল্লাস করছে তারই বাড়ির সামনের রাস্তায়।

কালীচরণ বলে—মেরে হটাবো ওদের?

ধনকেষ্ট দোতলা থেকে দেখছে, মশালের অনেক আলো জ্বলছে। সেই আলোয় দেখে

আমাদেরও। ধনকেষ্ট বলে ওসব করিস না। ফৌজিদারিতে ফেলে দেবে। সময় খারাপ যাচ্ছে। গ্রহরাজকে কাল ডাক।

কালীচরণ বলে—বাড়ির সামনে নাচবে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে?

ধনকেষ্ট বলে নাচতে দে। পরে দেখা যাবে। আর ওই ছেলেগুলোর ওপর নজর রাখ। ওরাই যত নষ্টের দল। ওরা না এলে গাঁয়ের লোকদের দলে পেত না কেশব। আর ওই ছোঁড়াগুলোও বিচ্ছুর দল। উঃ—শোকে যেন ভেঙে পড়ছে ওই ধনকেষ্ট। এভাবে অপমানিত হয়নি সে জীবনে।

ধনকেষ্ট জানে এই অপমানের বদলা না নিতে পারলে তার গ্রামে আর সম্মান থাকবে না। আর ভোটে লোককে ভয় দেখিয়ে জিততেও পারবে না।

অঞ্চলপ্রধান সেজে নানাভাবে প্রচুর টাকা আয় তো হয়ই আর একটা সম্মানের আসনে বসে বহু লোককে নিজের তাঁবে আনা যায়।

এই পঞ্চায়েতেও তার প্রতিষ্ঠা চলে যাবে। লোকে আর কেউ তাকে সমীহ করবে না। ভোটও দেবে না।

তাই একটা কিছু করতেই হবে। ধনকেষ্ট ভাবছে কথাটা।

কেশব দত্তের বাড়িতে আনন্দের বন্যা নেমেছে। ওর মা আমাদের বলে—কি বলে আশীর্বাদ করব জানি না। ভাই, ভগবান তোদের অনেক কিছু দেন। আজ আমাদের তোরাই বাঁচালি।

কেশব দত্তও খুশি।

পরদিন সেই গ্রামের লোকেরা আজকের এই শোভাযাত্রায় আসা মানুষদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করে।

পরদিন সকালেই এবার সেই বড় পুকুরে জাল নামে। হ্যাঁ, মাছও রয়েছে ওখানে। এক একটা আটদশ কেজি সাইজের লালচে রুই। ইয়া সাইজের কাতলা। জালে পড়ে আকাশে লাফ মারে। তবু ধরা পড়ে।

মাছ ধরার আনন্দই আলাদা। মাছের ঝোল—মাছের মুড়োর মুড়িঘণ্ট আর ক্ষেতের কুমড়ো, আলুর তরকারি তৎসহ বাগানের পাকা আম।

বোম্বাই গোলাপখাসগুলোই পেকেছে। সেই সব আমই পাড়া হল। আর ভোজ।

গ্রামের ভোজের ব্যাপারই আলাদা। বংশীগোপাল দলবল নিয়ে এসেছে। রান্না করছে তারাই। বিশাল উঠানে বসে কয়েকশো লোক সেদিন খেল। সারা অঞ্চলের মানুষ আজ আনন্দ পেয়েছে।

সব খবরই আসে ধনকেষ্টর কাছে।

তার লোকজন সব নানা কাজে ব্যস্ত। রাতের অন্ধকারেই তার আসল কারবার চলে। লঞ্চের শব্দ ওঠে রাতেই।

আমরা কদিন এখানেই রয়েছি।

এখন হোঁৎকাও বেশ গেড়ে বসেছে। বলে সে—ইস্কুল খুলতে দেরি আছে। ক'দিন টাটকা আম-লিচু-পুকুরের ফেরেস মাছ খাই লই। আর এখানে দুধের স্বাদ দেখছস? তগোর

কলকাতায় হরিণঘাটা মাদার ডায়েরির কি ওসব দুধ র‍্যা? জল—স্রেফ ওয়াটার। দিনকতক রেস্ট লইয়া যামু।

অর্থাৎ এখন বাগানের ফল, পুকুরের মাছ আর বাড়ির দুধের লোভেই হোঁৎকা নড়বে না। বলে সে, গাঁখান ভালোই, এক ওই ধনকেষ্ট ছাড়া। পটলা বলে—রোজ রাতে লঞ্চ আসা-যাওয়া করে।

হোঁৎকা বলে—কেসখান জানতি হইব। হালারে দুনম্বর ডোজ দিতি হইব।

তাই রাতের বেলাতে আজ আমরা বের হয়েছি ওই খালের দিকে। গ্রামে কদিন থেকে ঘুরে পথঘাট কিছু জেনেছি। তবু ওদিকে যাবার জন্য বংশীগোপালও সঙ্গী হয়েছে আমাদের। ছেলেটা খুব সাহসী।

বলে সে—শুনি ধনকেষ্টর নানা কারবার। আর রাতে কি যে করে।

তার সামনেই বের হয়েছি আমরা। এদিকটা বেশ নির্জন। খালের ধার থেকেই ধনকেষ্টর দখল করা জমিদারবাড়ির পিছন দিক। ওখানেই লঞ্চঘাট।

রাতের বেলায় দেখি দুটো লঞ্চই এসেছে। তার থেকে কি সব মালপত্র নামছে। আর অন্য এক লঞ্চ থেকে নামছে দুজন প্যান্ট পরা লোক। দেখে মনে হয় বিদেশিই।

ধনকেষ্ট তাদের খাতির করে বাড়ির এদিকের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়।

আমরা খালের ধারে ঝোপের মধ্যে বসে মশার কামড় খাচ্ছি। দেখা যায় ওপাশের ঘরে বসে বিদেশিদের কিসব মূর্তি দেখাচ্ছে ধনকেষ্ট।

বিদেশি সাহেব দুজনও ব্রিফকেস ভর্তি টাকা এনেছে। কি একটা মূর্তি দেখে দরদামও হচ্ছে। মশার কামড়ে অস্থির হই। তবু মারতে পারি না। হোঁৎকা ইশারায় জানায়—চুপ করে থাক।

সে দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে কাছ থেকে ওদের কথা কান করে শুনছে। দেখি টাকার লেনদেন হয়ে গেল। খানাপিনার আয়োজনও হয়েছে। এর মধ্যে কালীচরণ খড়ের বেড় দিয়ে মূর্তিটা প্যাক করে একটা কাঠের বাক্সেও পুরলো।

এরপরই সাহেবরা লঞ্চে উঠে গেল, কাঠের বাক্সটাকেও তোলা হল লঞ্চে। লঞ্চ চলে গেল।

এবার হঠাৎ পায়ের নীচে একটা লম্বা বস্তুকে এঁকেবেঁকে যেতে দেখে পটলা চিৎকার করে ওঠে সব ভুলে। স-সাপ!

লাফ দিয়ে সরে আসি সেখান থেকে আর তখুনিই ওদিকের ছাদ থেকে ধনকেষ্টর গলা ভেসে আসে।

—কে! কারা ওখানে?

জোরাল টর্চের আলো পড়ছে এদিকে-ওদিকে। ধনকেষ্ট টের পেয়েছে আমাদের উপস্থিতি। কালীচরণ, তাপ সিং আরও দু একজন দৌড়ে আসে। ধনকেষ্ট চিৎকার করে, —ধর, যেন পালাতে না পারে।

এদিক ওদিক টর্চের আলো পড়ছে। আমরাও দৌড়াচ্ছি। দুএকবার টর্চের আলোও পড়েছে আমার উপর।

পিছনে ধেয়ে আসছে নেকড়ে বাঘের মত কালীচরণের দল। ধরতে পারলে শেষ করে দেবে।

লাফ দিয়ে এসেছে তাপ সিং, ধরবেই আমাকে।

আমিও দুহাত দিয়ে তাপ সিংয়ের সেই বিড়ালের ল্যাজের মত পুরুষ্টু গোঁফ জোড়া ধরে ঝুলে পড়েছি। তাপ সিংয়ের গোঁফ পড়পড় করে ছিঁড়ছে আমার ওজনে। ঝুলন্ত দেহটাকে চেপে ধরেছে তাপ সিং। পালাচ্ছে—পাকড়া-পাকড়া।

এমন সময় গোবরা বিপদ বুঝে এসে এইসা লাথি কষেছে যে তাপ সিং বাঁধের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে খালের জলে আর আমার হাতে উঠে আসে তাপ সিংয়ের সেই ল্যাজের মত কিছু গোঁফ।

এই ফাঁকে সোজা দৌড় কষাই।

কোনোমতে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ফিরে এলাম কেশব দত্তের বাড়িতে। পায়ে জল কাদা, হাত-পা ছিঁড়েছে বুনো কুলের কাঁটায়। হোঁৎকা বলে—খুব বিপদ গেছে গিয়া। পটলাই ডোবাইল। পটলা বলে—ইয়া সাপ।

আমি জানাই—ওটা ঢ্যামনা সাপ। কামড়ায় না।

পটলা বলে—কি-কি করে জানব? যদি খ-খরিস হত?

হোঁৎকা বলে, চুপ মাইরা থাক। কারো রে কইবি না। হালা ধনকেষ্ট দেহি লাখ লাখ টাকার দুনম্বরি ব্যবসাও করছে। ওর আসল কারবারখান বুঝছি।

পটলা বলে—ব্যাটা ডেঞ্জারাস লোক।

হোঁৎকা বলে—তাই দেখছি, নে শুইয়া পড়। রাত হইছে।

ধনকেষ্ট প্রথম দিন থেকেই আমাদের উপর নজর রেখেছিল। আর ওই মামলায় হারার পর সেই বেয়ারার কাছে ও জেনেছে যে কে একজন তার লোক জজসাহেবের বাংলোয় ভেট এনে সাহেবকে চটিয়ে গেছে। তারপর এইভাবে মামলায় হেরেছে, তার বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে।

আর ওই ছেলেটাকেও দেখিয়ে দেয় বেয়ারা।

তিনি ওই হোঁৎকাই।

রাগে জ্বলে ওঠে ধনকেষ্ট। ওই ছেলেগুলো এখানে এসে তার বুকে বসে এভাবে তাকে বিধ্বস্ত করবে এইটা মেনে নিতে পারেনি। ভাবছিল কিছু একটা করতে হবে।

আর আজকের রাতের ঘটনায় ধনকেষ্ট তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছে। গ্রামে এতকাল ধরে এই মূর্তি পাচারের কাজ করছে। তার ঘরের গুদামে বহু লাখ টাকা দামের মূর্তি রয়েছে। রয়েছে অনেক কিছু। গ্রামের কোনো লোক তার দিকে নজর দিতে সাহস করেনি। অথচ এই ছেলেগুলো এসেছে তারই দুর্গে হানা দিতে। আজ ওরা বোধ হয় তার গোপন ব্যবসাটার খবরও পেয়েছে। আর ওদের ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

ধনকেষ্ট তাই এবার চরম ব্যবস্থাই নিতে চায়। ওদিকে তাপ সিং কাদা মাখা অবস্থায় জল থেকে উঠে দেখে তার শখের গোঁফ জোড়াটা আর নেই। কে যেন খামচে তুলে নিয়ে গেছে।

চামড়া উঠে গেছে। তার বীরত্বের এহেন অবমাননায় গর্জে ওঠে সে। খুন করেগা।

ধনকেষ্ট বলে—খুন করতে হবে না। ওদের যে কটাকে পারিস তুলে আন। আজ রাতেই। তারপর ওদের ঠান্ডা করে দেব।

রাত্রি হয়ে গেছে।

আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ কাদের ধস্তাধস্তির শব্দে চমকে উঠি।

হোঁৎকা দৌড়ে বের হয়ে যায়। আমি ঠিক কী করব বুঝতে পারি না।

গোবরা চিৎকার করছে নীচে থেকে—নেমে আয় শিগগির।

ওদিকে কেশব দত্ত জেগে উঠেছে। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি চলে। কিন্তু সবাই আছি, পটলাকেই পাওয়া যাচ্ছে না। সারা ঘরের জিনিসপত্রও তছনছ করা। ব্যাগগুলো এদিক ওদিকে পড়ে আছে।

গোবরা বলে—পটলাকেই পাওয়া যাচ্ছে না।

ফটিকের পাশেই শুয়েছিল সে। সেও ঘুমে অচেতন।

কেশব বলে—তোমরা টের পাওনি?

হোঁৎকা বলে—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিসের শব্দে ঘুম ভাঙল। ফটিক এদিক ওদিকে খোঁজে। কেশবের মা বলে—ছেলেটা গেল কোথায়? বাথরুমে যায়নি তো?

বাথরুমও ফাঁকা।

ভোর হতেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে পটলাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘরে কারা নাকি ঢুকেছিল। পটলাকে নিয়েই বিপদ।

এবার কী হবে কে জানে।

কেশবের মা বলে—কী হবে, কুটুমের ছেলে এমনি করে হারিয়ে যাবে এখান থেকে, কী জবাব দেব।

কেশব দত্তও ভাবনায় পড়ে।

কালকের রাতের সে-ই অভিযানের কথাটাও জানাতে পারি না। তবে মনে হয় এ ওই ধনকেষ্টরই কাজ। সেই প্রতিশোধ নেবার জন্য এমনি করে থাকতে পারে।

কেশব দত্ত বাদল মাস্টারকে নিয়ে থানায় যায়। আমরাও গেছি।

থানা মাইলখানেক দূরে গোপালগঞ্জে।

দারোগাবাবু ধনকেষ্টর বিশেষ পরিচিত। আর ধনকেষ্ট যে পুলিশকেও হাতে রাখবে সেইটাই স্বাভাবিক ব্যাপার।

পুলিশ অফিসার আমাদের দেখে চাইল বিরক্তভাবে। সাত সকালে তাকে জ্বালাতে এসে যেন অপরাধই করেছি আমরা

আমাদের কথা শুনে দারোগাবাবু টেবিলে তবলা বাজাতে বাজাতে বলে—দেখুন মামার বাড়িটাড়ি বেড়াতে গেছেন। কলকাতা চষা ছেলে এই অজ পাড়াগাঁয়ে হারিয়ে যাবে? বলেন কি বাদলবাবু? যান বাড়িতে বসে থাকুন। দেখবেন ঠিক ফিরে আসবে। যান।

এই বলে আমাদের বিদায় করতে চায় সে।

কেশববাবু বলে—থানায় একটা মিসিং ডাইরি করাতে হবে।

দারোগাবাবু এবারে দপ করে জ্বলে ওঠে। বলে—সে, ছেলেখেলা পেয়েছেন? যান—ওসব ব্যাপারে ডাইরি করা যায় না। আসুন তো।

বইঘর.কম

তবু বাদলবাবু বলে—আমরা লিখিত রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি। এইটা আপনার ওই কেরানিবাবুকে সই করে নিতে বলুন। তারপর কিছু করেন না করেন আপনাদের ব্যাপার।

দারোগাবাবু যেন বেকায়দায় পড়েছে। তাই বলে—ওহে, দরখাস্ত নিয়ে নাও।

এখানে কিছুই হবে না তা বুঝেছি।

তবু দরখাস্ত দিয়ে বের হবো এমন সময় ধনকেষ্টবাবুকে শোভাযাত্রা করে আসতে দেখে দারোগাবাবু নিজেই ঘর থেকে বের হয়ে এসে অভ্যর্থনা করে—আসুন ধনকেষ্টবাবু।

ধনকেষ্ট একা আসেনি। সঙ্গে সেই ভীষণ বডিগার্ড কালীচরণ রয়েছে। আর পিছনে একটা লোকের মাথায় ঝুড়িতে নানা টাটকা আনাজ, ফল-ফুলকপি, এক হাঁড়ি সন্দেশ আর দড়িতে ঝোলানো একটা কেজি তিনেক নধর রুই মাছ।

ধনকেষ্ট আমাদের থানায় দেখবে, তা ভাবেনি।

হঠাৎ দেখে বলে ওঠে—কিহে বাদল, তোমরা এখানে?

ফটিক ভালো ফটোও তুলতে পারে। দারোগাবাবুর সামনে নামানো সেই ভেট—ঝুলন্ত মাছ আর ধনকেষ্টর ভেট নিবেদনের দৃশ্যটা ফটিক এক ফাঁকে সুন্দরভাবে তুলে নেয়।

ওরা ঠিক খেয়াল করে না।

বাদলবাবু বলে—কেশবের বাড়িতে এরা বেড়াতে এসেছিল কলকাতা থেকে। কাল রাত থেকে ওদের একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না।

খবরটা শুনে ধনকেষ্টও সমবেদনা জানায়।

সেকি গ্রামে বেড়াতে এসে উবে গেল? একি কাণ্ড। গ্রামের বদনাম, দেখো—দিঘি পুকুরে ডুবে যায়নি তো। কলকাতার ছেলে সাঁতার বোধ হয় জানে না। আহা—খুঁজে দেখো।

দরদ দেখিয়ে ভিতরে চলে যায়।

আমরাও বের হয়ে আসি। হোঁৎকা বলে—কিছু বুঝলেন বাদলদা? হালায় ধনকেষ্ট থানায় আইসে ক্যান? আর আইজই।

বাদল বলে—এখানে ওকে প্রায়ই আসতে হয়।

হোঁৎকা কি ভাবছে।

বেলা হয়ে যায়, পটলার কোনো খোঁজই মেলে না।

গোবরা বলে—কেউ তাকে নিশ্চয়ই ধরে নিয়ে গেছে। কোথাও আটকে রেখেছে।

হোঁৎকাও সায় দেয়।

—তাই। কাল রাতে ধনকেষ্টর ওখানে গেছলাম। পালাবার সময় ওরেই দেখছে। তাই ধনকেষ্টই ওরে মুখ বন্ধ করার জন্য তুলে নিয়ে গেছে।

কথাটা ভাবছি আমরাও। তবু বলি—কিন্তু প্রমাণ তো নেই। আর এখানের পুলিশও যে ধনকেষ্টর পোষা তা তো নিজেই দেখলি। ওরাও কিছুই করবে না। কোনো সাহায্যই পাবে না। উল্টে আমাদের ধরেই না হাজতে পুরে দেয়।

পটলাকে উদ্ধার করতেই হবে। ও আমাদের মধ্যমণি। কামধেনু। আর হোঁৎকার দায়িত্বেই ঠাকমা পটলাকে ছেড়েছে। হোঁৎকা তাই ভাবছে।

বলে হোঁৎকা—সত্যি তুই চটপটে বলিয়ে-কইয়ে আছস। বংশীদারে লই তুই আইজই

চুঁচুড়ায় গিয়া পটলার কাকার চিঠিখানা ওখানের পুলিশের বড়কর্তারে দিবি। কইবি এখানে ওই ধনকিষ্টর সব ব্যবসার কথা। কাল রাইতের যা দেখছিস সবই কইবি। পটলাকে ধনকিষ্টই তুইলা লইয়া গেছে। ওখানেই রাখছে ওরে।

আমি বলি—কলকাতায় পটলাদের বাড়িতে ফোন করব?

হোঁৎকা বলে—না। আজ নয়। আর এক-দুদিন দেইখা করা যাবে।

পটলার বিপদ। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতেই হবে ওকে বের করার জন্য। তাই আমি বংশীগোপালকে নিয়ে বের হয়ে গেলাম সদরের উদ্দেশে।

সেই দীর্ঘ পথ দুখানা বাস বদল করে বৈকাল নাগাদ সদরে পৌঁছে খুঁজে খুঁজে এক রিকশাওয়ালাকে ভর করে পুলিশ সাহেবের বাংলোয় পৌঁছলাম।

এর মধ্যে শহরে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেছে। আজ সকালেই গঙ্গার ধারে একটা লঞ্চ থেকে দুজন বিদেশি কাঠের বাক্স নিয়ে লঞ্চঘাট থেকে রিকশা নিয়ে স্টেশনের দিকে আসছিল। সেই বাক্সটা নামাতে গিয়ে অসাবধানে হাত থেকে পড়ে ভেঙে যেতে তার ভিতর থেকে কষ্টি পাথরের কোনো দেবমূর্তি বের হয়ে পড়ে।

লোকজনও জুটে যায়।

কাগজে মূর্তি চুরির খবর অনেকেই জেনেছে। হঠাৎ ওই দুই বিদেশি সাহেবকে হিন্দু মূর্তিসমেত দেখে তারা আলোচনা শুরু করে। আর এই ফাঁকে সেই বিদেশি দুজন মূর্তি ফেলেই সরে পড়ে। তাদের আর পাত্তা মেলে না।

পুলিশের হাতে মূর্তি দেয় জনসাধারণ।

এই নিয়ে শহরে বেশ মিছিলও হয়েছে। পুলিশের চোখের সামনে এই সব মূর্তি পাচার হচ্ছে এ নিয়ে খবরের কাগজের সাংবাদিকরাও প্রশ্ন তোলে। এস-পি সাহেবের অফিসেও ডেপুটেশন দিয়েছে। জেলা পুলিশের বড়কর্তা বাবুও এবার ভাবনায় পড়েছেন। ওই মূর্তিপাচারকারীর দল খুবই সক্রিয়, আর তার পিছনে নিশ্চয়ই অর্থবান—প্রতিষ্ঠাবান লোকজনই রয়েছে।

তিনি জনসাধারণকে আশ্বাস দেন—আমরা এর জোর তদন্ত করছি। যেভাবেই হোক, ওই জাতীয় মহামূল্যবান সম্পদ বিদেশে পাচার যারা করছে তাদের ধরা হবেই।

কথাই দিয়েছেন তিনি।

কিন্তু কিভাবে তদন্ত করাবেন—কোন্ পথে এগোবেন তার কোনো হদিস এখনও করতে পারেননি। অন্য অফিসারদের সঙ্গে মিটিংও করেছেন। কিন্তু সুরাহার কোনো উপায় এখনও বের করতে পারেননি।

বৈকালে ক্লান্ত হয়ে বাংলোয় ফিরেছেন সুবিনয়বাবু। সবে চায়ের কাপ নিয়ে বসেছেন স্নান সেরে এমন সময় আমাদের ঢুকতে দেখে চাইলেন।

কোথা থেকে আসছ? কী দরকার?

ওর হাতে পটলার মেজকাকার চিঠিখানা তুলে দিই আমি।

সুবিনয়বাবু চিঠিখানা দেখে আমাদের বসতে বলেন ইশারায়। চিঠিখানা পড়তে থাকেন। পড়া শেষ হলে শুধোন—কী ব্যাপার?

বইঘর.কম

এবার আমিই সব ঘটনা বলতে থাকি।

ধনকেষ্ট সাহার কিছু ইতিহাস বংশীগোপালই গ্রাম্য ভাষায় শোনায়। তার অত্যাচারের নানা কথা আর তার পরের ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিই আমি।

আর গতরাত্রে ধনকেষ্টর বাড়িতে যা যা দেখেছিলাম সেই ঘটনাগুলোর নিপুণ বর্ণনা দিই। সেই দুই বিদেশির কথা—মূর্তির কথাও।

আর আমাদের সে দেখে ফেলেছিল। তারপর রাতে ওর লোকই পটলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে।

থানায় যাওনি?

পুলিশ সাহেবের কথায় এবার আমি এক মোক্ষম প্রমাণই পেশ করি। ফটিক দারোগাবাবু আর ধনকেষ্টবাবুর ভেট দানের দৃশ্যটা সুন্দরভাবে তুলেছিল। এখানে এসে ফোটোর দোকান থেকে ডবল খরচা দিয়ে ওটাকে বেশ বড় করেই তৈরি করে এনেছিলাম। সেই ফোটোটা বড় সাহেবের টেবিলে দিয়ে বলি—

দারোগাবাবু আমাদের ডাইরি নেননি। নেবেন কেন স্যার? ধনকেষ্টবাবু ওকে হাতে করে রেখেছেন। কেমন ভেট নেন দারোগাবাবু তার কাছ থেকে দেখুন? তিনি ধনকেষ্টর বিরুদ্ধে কিছুই করবেন না।

এস-পি সাহেব ওই কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের কর্তব্যের ছবি দেখে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। বলেন—ননসেন্স। এদের জন্য সারা পুলিশ বিভাগের বদনাম হয়।

এসবের ব্যবস্থা করছি।

এস. পি সাহেব বলেন—ওই বিদেশিরা যে মূর্তি নিয়ে আসছিল ধনকেষ্টবাবুর ওখান থেকে সেটা জানলে কী করে?

আমি জানাই। দেখলাম একটা মূর্তিকে খড় দিয়ে জড়িয়ে বস্তায় পুরে একটা কাঠের বাক্সে পুরে দিল কালীচরণ।

—কালীচরণ।

এস. পি সাহেবের কথায় জানাই—ও ধনকেষ্টর এক নম্বর সহচর। আর ওই বিদেশিদের কাছে ব্রিফকেস ভর্তি টাকা নিল ধনকেষ্টবাবু। তারপর ওরা ধনকেষ্টবাবুর লঞ্চ কি যেন নাম হ্যাঁ। এস-এল ধনপতি, ওতে চড়ে বের হয়ে গেল তখন রাত প্রায় এগারোটা হবে।

পুলিশসাহেব সব কিছু নোট করে নেন।

তাঁর কাছে ঘটনাটা এবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওই চটমোড়া খড় জড়ানো অবস্থাতেই মূর্তিটাকে কাঠের বাক্সে এখানে পাওয়া গেছে। তবে সেই বিদেশি দুজনকে পাওয়া যায়নি।

কারা গোলমাল বুঝে এই দামি মাল ফেলে রেখেই পালিয়ে গেছে। তবে ক্রেতাদের ঠিকানা না পাওয়া গেলেও বিক্রেতা এবং পাচারকারীর নাম-ঠিকানা পেয়ে গেছেন তিনি।

আর পুলিশসাহেবও বুঝেছেন এই চক্র ইতিমধ্যে স্থানীয় দারোগাকেও হাতে এনে এই কাজ করছে। তার প্রমাণও পেয়েছেন তিনি।

সেই চক্র মালপাচার করেই থামেনি। তাদের এই কাজের খবর পেয়েছে এই পটলা। তাই তাকেও গুম করেছে। দরকার হলে প্রমাণ লোপ করার জন্য খুনও করতে পারে।

তাই পুলিশসুপার ফোন তোলেন। আর্দালি ধরেছে ওদিকে। এস. পি বলেন—ডি. এস-পি সাহেবকে এখুনি আমার বাংলোয় আসতে বলো। খুবই জরুরি দরকার।

এবার এস. পি সাহেব আমাদের দিকে চাইলেন ফোন রেখে। বলেন চা-টা খাও। আর রাতে এখানেই থাকবে। তোমাদের দরকার পড়তে পারে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও করছি।

বেয়ারাকে ডেকে বলেন—এদের গেস্টরুমে থাকার ব্যবস্থা করে দাও। ওরা এখন এখানেই থাকবে। যাও।

বেয়ারার সঙ্গে বের হয়ে বারান্দার একপ্রান্তে একটা ঘরে এসে ঢুকলাম। দুটো খাট-বিছানা লাগোয়া বাথরুম সবই আছে।

মনে হল ওদিকে বেশ কর্মব্যস্ততা শুরু হয়েছে। দু'একটা—জিপ এসে থামল। ওদিকের একটা ঘরে বোধহয় ওয়ারলেস সেট আছে, রেডিও ম্যাসেজ পাঠানো—রিসিভ করা হয় ওখানে। ওখানে যেন কর্মব্যস্ততা পড়েছে।

আশা করতে পারি পটলচন্দ্রের অনুসন্ধানের জোর ব্যবস্থাই চলেছে। হয়তো এবার তার সন্ধান মিলতে পারে। জানি না হোঁৎকারা ওখানে এখন কী করছে?

রাত নেমেছে গ্রামে। সন্ধ্যার মুখে এখনও গ্রামে শিয়ালের ডাক শোনা যায়। সন্ধ্যা বেলাতেই তাদের কোরাস গানের আসর বসে হুক্কা হুয়া হুয়া!

তারপর আহার্যের সন্ধানে বের হয়। তখন বিশেষ চিৎকার করে না। শিকার সাবধান হয়ে যাবে বলে। তবে দু'একটা দলছুট শিয়াল চিৎকার করে। আবার থেমে যায়।

হোঁৎকা বের হয়েছে গোবরা ফটিককে নিয়ে। ওদের গন্তব্যস্থল ধনকেষ্টর বাড়ির ওদিকে। পথ প্রদর্শক হিসাবে চলেছে বাদলমাস্টারের ছোট ভাই পরেশ। ছেলেটা খুবই সাহসী আর হোঁৎকার দলে এর মধ্যে মিশে গেছে। বৈকালে একসঙ্গে ফুটবলও খেলে হোঁৎকা-গোবরা।

রাতের বেলা এদিকটা নির্জন।

ঘন বাঁশ বন, পিটুলি গাছে ভরা। আর বুনো কাঁটাঝোপও আছে। ওপাশে ধনকেষ্টর নতুন বাড়ি। এদিকটায় এখন ধ্বংসস্তূপই। তবু দোতলা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে কোনোমতে।

স্তব্ধ চারিদিক।

মাঝে মাঝে দু-একটা শিয়ালের ডাক, পাখির ডানার ঝটপটানি শোনা যায়। বাতাসে মিশেছে খালের বুকে জলের ঢেউ ভাঙার শব্দ।

আমরা ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি। পরেশ এসব জায়গায় আসা-যাওয়া করে। লুকোচুরিও খেলে এখানে। দেওয়ালে এর মধ্যে দু'একটা বট অশ্বত্থের গাছও গজিয়েছে, পরেশ বলে—একটু দেখে আসব।

গোবরা শুধোয় কেন?

পরেশ বলে চাপাস্বরে—ত্যানারা আছেন।

—মানে?

পরেশ হাসে। নমস্কার করে বলে।—মা মনসার বাহনরা গো। এসব তো ত্যানাদেরই আস্তানা। চমকে ওঠে ফটিক।

বইঘর.কম

কালরাতে পটলাও এমনি সাপ দেখেই কেস ভণ্ডুল করেছিল। পরেশ অভয় দেয়—তাদের গায়ে পা না দিলে ওরা কিছু বলে না। এসো।

একটা উঠান মত।

চারিদিক ভগ্নপ্রাসাদের স্তূপ। হঠাৎ ওদিকের দোতলার একটা ঘরে যেন ক্ষীণ আলোর আভা দেখা যায়। কাদের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরও শোনা যায়।

হোঁৎকা ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে লুকোয় যাতে উপর থেকে টর্চ ফেলেও কেউ তাদের দেখতে না পায়।

হোঁৎকা এবার চমকে ওঠে। উপরের ঘর থেকে শোনা যায় ধনকেষ্টর চাপা গর্জন। কাকে যেন শাসাচ্ছে সে।

—বল। এখানে কেন এসেছিলি তোরা?

ওই কলকাতা থেকে এখানে এসে ধনকেষ্টর উপর গোয়েন্দাগিরি। শেষ করে দেব তোকে।

কথাগুলো ধনকেষ্টর।

আর বলছে নিশ্চয় পটলাকে। না হলে কলকাতা থেকে আসার কথা বলবে কেন।

পটলা ভাবতে পারেনি রাতের অন্ধকারে হানা দিয়ে ওই ধনকেষ্টর দল তাকেই এনে তুলবে। ঘুম ভেঙে যেতেই অনুভব করে পটলা তার দুহাত কারা বেঁধে ফেলে মুখে একটা দুর্গন্ধময় গামছার মত কি গুঁজে দিয়েছে যাতে কোনোরকম আওয়াজ করতে না পারে।

হোঁৎকারা জেগে ওঠার আগেই তাকে ঘাড়ে করে নীচে নামিয়ে ওরা দৌড়ালো। ছটফট করে পটলা, কিন্তু করার কিছুই নাই।

কোথায়, কেন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা ভাবতেও পারে না পটলা। শেষ অবধি অন্ধকারে বন-বাদাড় ভেদ করে তাকে এনে এই ভাঙা বাড়িটাতে তুলেছে।

আর ধনকেষ্টকে দেখে পটলা চিনতে পারে। ধনকেষ্ট বলে একটাকে মাত্তর এনেছিস কালী? বাকিগুলোকে ছেড়ে রেখে এলি যে? কালীচরণ বলে—খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছি এইটাই পালের গোদা! আর একসঙ্গে সবগুলোকে তুলে আনলে সামলাতে পারবেন না। যা বিচ্ছুর দল। ধনকেষ্ট মাথা নাড়ে।

—তা যা বলেছিস। হাড় শয়তান এরা। আমার ভাতে হাত দিয়েছে, ওদের কাউকে জ্যান্ত ফিরে যেতে দেব না। আপাতত এটাকেই আটকে রাখ। তারপর কালী বলে।

—এইটাই ওদের পাণ্ডা। মস্ত বড়লোকের একমাত্র ছেলে।

ধনকেষ্ট কি ভেবে বলে।—তাহলে বুদ্ধি আছে তো দেখছি।

পটলার হাত পায়ের বাঁধন খোলেনি। মুখটা খুলেছে পটলা বলে—আমাকে কে-কে কে ধরে এনেছ? ধনকেষ্ট নিজেও ঈষৎ তোতলা। সে পটলাকে ওইভাবে কথা বলতে দেখে গর্জে ওঠে।

ই-ই-ইয়ার্কি হচ্ছে আ-আমার সঙ্গে।—ভেংচাবি আমাকে?

পটলাও অবাক। তার মতই জিভটা মাঝে মাঝে যে আলটাকরায় সেট হয়ে যায় ধনকেষ্টর তা জানত না।

পটলা বলে—ভ-ভ্যাংচাব কেন?

—ফে-ফের! ধনকেষ্ট ফুসে ওঠে। বলে সে—খ-খবরদার।

কালীচরণ ব্যাপারটা বুঝে বলে—কত্তা। ওই ছেলেটাও তোতলা গো! দেখছনি ত-ত করছে।

ধনকেষ্ট এবার চুপ করে যায়।

বলে সে—আটকে রাখ এটাকে। যেন পালাতে না পারে। বাকিগুলোকেও এবার জালে ফেলে গলা টিপে শেষ করতে হবে। এটা হাঁড়ির ক-কই মাছের মত জিয়ানো থাকুক। প-পরে দেখব।

পটলাকে দিনভোর হাত-পা বেঁধে ওই ভাঙা ঘরে আটকে রেখেছে। চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ। এখানে কোনো মানুষজন আসে না।

দুপুরে একটা থালায় ভাত—তাও কড়কড়ে আর বাটিতে একটু ডাল তাতেই কুমড়ো মত কি দেওয়া, তাই এনেছে একটা লোক।

আর দুটো লোক ওপাশের ঘরে তালাই পেতে শুয়ে বসে রয়েছে। ওরাই তার পাহারাদার। খাবারটা দিয়ে বলে লোকটা—নাও, খেয়ে নাও।

পটলা ওই ফাটা লালচালের ভাত আর ওই একটু ডাল তরকারির মিশ্রণ দেখে বলে—ওসব আমি খাই না।

লোকটা লালচে দাঁত বের করে বলে—একি তোমার মামার বাড়ি। যে মাছ-মাংস ভাত পাবে। যা পাচ্ছ তাই খাও। এদিকের কে বলে—আরে মদনা ও ব্যাটা না খায় আমাকেই দে। ওরটাও খেয়ে নিই। ওর রাজভোগ খাওয়া অভ্যাস—উপোসই দিক।

লোকটা তার খাবারও অনায়াসেই খেয়ে নিল। দেখছে পটলা। কুঁজোর জল খেয়েই চুপচাপ বসে থাকে পটলা।

মনে পড়ে হোঁৎকাদের কথা।

এতক্ষণ ধরে তার খবর নাই। ওরা নিশ্চয়ই খুঁজছে তাকে। কিন্তু এই ধনকেষ্ট যে তাকে এখানে এনেছে সে খবর ওরা পায়নি এখনও। পেলে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবে।

পটলাও ভাবতে পারে না কি করে খবরটা পাঠাবে।

দিন কেটে যায়, তখনও পটলা কোনো খবর পাঠাতে পারেনি। এই ধ্বংসপুরীতে বৈকালের পরই সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসে।

ধনকেষ্ট আজ বেশ খুশিই।

কাল রাতে বিদেশিদের কাছে দশলাখ নগদ টাকার বিনিময়ে ওই মূর্তিটা পাচার করেছে। ওরা এসব কাজের পুরানো লোক। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ওদের এজেন্ট ছড়িয়ে আছে। নানা প্রদেশ থেকে বহু মূল্যবান প্রাচীন মূর্তি সংগ্রহ করে ওরা জাহাজে না হয় প্লেনে নেপাল, বাংলাদেশ থেকেও নানা উপায়ে বিদেশে ওসব চালান করে। সেখানের বহু কোটি কোটি ডলারের মালিকরা চড়া দামে ওইসব পুরাবস্তু কেনে।

ওই বিদেশিরা কাল ধনকেষ্টর কাছ থেকে নগদ টাকায় মাল নিয়ে গেছে আবার সামনের সপ্তাহেই আসবে। তাই ধনকেষ্টও এইদিন আরও দুতিনটে বহু প্রাচীন মূর্তি সংগ্রহ করে এনেছে।

বইঘর.কম

ভালোই চলছিল তার বাণিজ্য। হঠাৎ এই ছেলেগুলো এসে ক'দিনের মধ্যেই তার এতদিনের তিল তিল পরিশ্রম করে গড়ে তোলা সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরিয়েছে।

ধনকেষ্টর হাত থেকে ওই বাগান পুকুর ছিনিয়ে নিয়েছে। গ্রামের লোকের সামনে দেখিয়ে দিয়েছে ধনকেষ্টকেও আঘাত করে পিছু হটানো যায়।

বাদলমাস্টারের দলও তাই সাহস পেয়ে তার বাড়ির সামনে নেচে-কুঁদে খেউড় গেয়ে সেই সাবধানবাণী শুনিয়ে গেছে।

আর তারপর ওই ছেলেগুলো রাতের অন্ধকারে তার উপর গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে। একটাকে ধরেছে। বাকি ক'টার ব্যবস্থা আজই করবে।

ধনকেষ্ট তাই থানায় গেছল। দারোগাবাবুকে ওই ভেট আর নগদ বেশ কিছু টাকা দিয়ে এসেছে।

আজ রাতেই কালীচরণের দল গ্রামের ধনকেষ্টর এক বশংবদ লোক গিরিধারীর বাড়িতে চুরির অভিনয় করবে। গিরিধারীও চোর চোর বলে চেঁচাবে। লোকজন জুটে যাবে। চোর ধরার জন্য তারা দৌড়াদৌড়ি করে কেশব দত্তের বাড়ির সামনে হাজির হয়ে চিৎকার করবে—চোর এখানে ঢুকেছে। বের করে দাও।

ধনকেষ্ট বলে—কালী, সবাইকে ঠিকঠাক বলে রেখেছিস তো?

কালী বলে হ্যাঁ। গিরিধারীও সব জানে। গদাইদেরও ফিট করে রেখেছি। ওরা চোরের পিছনে দৌড়ে কেশব দত্তের বাড়ির সামনে গে হুজ্জুতি করবে।

ধনকেষ্ট এর পরের কাজও করে রেখেছে।

বলে থানাতেও খবর যাবে। দারোগা বাকি ছোঁড়াদের টেনে বের করবে। গদাইরা যেন বলে ওদেরই পালাতে দেখেছে অন্ধকারে।

পটলা শুনছে প্ল্যানটা। বলে সে—ওরা চুরি করতে যাবে কে-কেন? কালী ধমকায় চোপ বে। ওদেরই চুরির দায়ে কোমরে দড়ি পরিয়ে জেলে পাঠাব। আর তোকে ধনকেষ্ট বলে—গলা টিপে শেষ করে খালের পলিতে পুঁতে দে-দেব। হাড়ভাঙা হলুদপুরে এসে ক-কলকাতার কে-কেদ্দানি দেখানো বের করে দেব।

পটলা চমকে ওঠে। একেবারে নিখুঁত পরিকল্পনা করে আঁটঘাট বেঁধেই পা ফেলে এই ধনকেষ্ট।

এবার সে এখানের অঞ্চলপ্রধান। পুলিশও তার হাতের লোক। হোঁৎকাদের চুরির দায়ে ধরে চোর সাজাতে তার সাক্ষাৎ প্রমাণের অভাব হবে না। ফলে তার বন্ধুদের বিনা দোষে জেলই হবে চুরির দায়ে।

আর তার পরিণাম যে ভীষণ তাও বুঝেছে পটলা। বলে সে—ওদের ছে-ছেড়ে দিন। আমার যা হয় হোক।

ধনকেষ্ট এবার ঠা ঠা করে হাসছে। শত্রুকে পিষে মেরে ফেলেই সে আনন্দ পায়। পটলার কথায় বলে—ধনকেষ্টর ল্যাজে পা দিয়েছ। গোখরো সাপের ল্যাজে পা দিলে কি-কি হয়? ছোবল খেতেই হয় ছো-ছোকরা।

ধনকেষ্ট বলে—কালী। রাত হয়েছে। যা শুভ কাজ সেরে ফেল। গিরিধারীকে

বলে—থানায় যা। গদাইরাও যেন ঠিকমতো চেল্লামিল্লি দৌড়ঝাঁপ করে। ওই ছোঁড়াগুলোকে থানার লকআপে পুরে তবে এসে খবর দিবি।

এমন সময় একজন খবর দেয়—কর্তাবাবু, নীচে দারোগাবাবু এসেছে। অবাক হয় ধনকেষ্ট।—এ সময় দারোগাবাবু! এখানে?

লোকটা বলে—বললেন খুব জরুরি দরকার আছে আপনার সঙ্গে। এখুনিই চলুন।

দারোগাবাবু এখানে বেশ আরামেই ছিল। এসেছিল গোলকগঞ্জ থানায় দুবলা পাতলা হয়ে। এক মেয়ের বিয়ে দিয়ে ক্যাশকড়িও কমে গেছল। খুব হতাশ হয়েই টাউন থানা থেকে এই ধাপধাড়া গোলকগঞ্জে এসেছিল।

কিন্তু ক'বছরেই ধনকেষ্টবাবুর কল্যাণে এখন নগদ টাকাও প্রচুর জমিয়েছে স্বনামে, বেনামে, আর খাঁটি দুধ-ঘি-মাছ-মাংসের ভেট পেয়ে ক'বছরেই নেওয়াপাতি ভুঁড়িও গজিয়েছে। ধনকেষ্টবাবু নানা কারবার করে তা জানে দারোগা শশীপদবাবু। তা করুক তবে ধনকেষ্ট মাসিক হাজার দশেক করে প্রণামীও দেয়। এ ছাড়াও নানা ভাবেই শশীপদবাবু ম্যানেজ করে ক'বছরেই গুছিয়ে নিয়েছে। শালার নামে সল্টলেকে বাড়িও তুলেছে। ভালোই চলছিল।

হঠাৎ ওই ছেলেগুলো কলকাতা থেকে এখানে এসে শুকনো ঝামেলা বাধিয়ে বসল। ধনকেষ্টবাবু বিপদে পড়ল আর সেই সঙ্গে ফেঁসে গেল শশীপদ দারোগাও। আজ সন্ধ্যাতেই সদর থেকে আর্জেন্ট রেডিও মেসেজ এসেছে, তাকে এখুনিই ওই থানার চার্জ বুঝিয়ে দিতে হবে সেকেন্ড অফিসারকে। কাল সকালে গিয়েই ওকে এখান থেকে আরও পাঁচমাইল ভিতরে ক্ষীরপুর থানায় জয়েন করে সেখান থেকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে সদরে।

ওই বদলির অর্ডার পেয়ে চমকে ওঠে শশী দারোগা। হঠাৎ এমনিই অঘটন কেন ঘটল তাই ভাবতে থাকে। ক্ষীরপুর থানায় পোস্টিং করা হয় অযোগ্য কর্মীদেরই। একেবারে অজ পাড়াগাঁ।

ছোটবাবুও অর্ডার পেয়েছে।

তাকে এক্ষুনি চার্জ বুঝে নিতে হবে। ছোট দারোগা দেখেছে ধনকেষ্টর অত্যাচার। সে ওই লোকটাকে সহ্য করতে পারে না। বড়বাবু তার অফিসার; তার অনাচারও দেখেছে।

এবার তার প্রতিকারই করেছেন পুলিশ সুপার।

কিন্তু শশীপদও ধুরন্ধর লোক। সদরে তারও কিছু লাইন আছে। এবার তারাই জানায় আসল খবরটা।

পুলিশ সুপারের এক বন্ধুর ভাইপো মিসিং হয়েছে শশীপদবাবুর এলাকা থেকে। তাকে কারা কিডন্যাপ করেছে। আর শশীবাবু সেই কেস ডাইরিও করেনি।

ফলে খবর এসে পৌঁছায় খোদ সাহেবের কাছে। আর একটা দারুণ ঘটনা ধরা পড়েছে স্টেশনে। দুই বিদেশি মূর্তি পাচার করছিল। তারা হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে। মূর্তি ফেলে তারা পালিয়েছে তবে পুলিশ মূর্তি পাচারকারীর খবরও জেনেছে। এসব ঘটেছে শশীপদবাবুর থানাতেই। এসব চালান চলছে অনেক দিন ধরে। শশীপদ এসব নিয়ে কোনো অ্যাকশনই নেয়নি।

তাই তাকে বদলি করে এরপর তদন্ত করে বিভাগীয় শাস্তিও দেওয়া হবে।

এবার বুঝেছে শশীপদ কেসের গুরুত্বটা। ওই ছেলেগুলোর পিছনে রয়েছে কলকাতার

কোনো বড় ব্যবসায়ী, মন্ত্রীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

আর শশীপদ দারোগা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে আবার আজ রাতে ধনকেষ্টর টাকা খেয়ে তাদের মিথ্যা চুরির দায়ে হাজতে পুরতে গেছল।

এবার ওই হাজতে তাকেই না ঢুকতে হয়।

শশীবাবুর খেল এখানে খতম হয়েছে। এই থানার আর কেউ সে নয়। চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছে ছোটবাবুকে, কাল সকালেই চলে যেতে হবে।

তাই ছুটে এসেছে শশীপদ দারোগা ওই ধনকেষ্টবাবুর কাছে।

ধনকেষ্ট দারোগার জরুরি তলব পেয়ে ওই ভাঙাবাড়ির নীচেই নেমে আসে। ঝড়োকাকের মত চেহারা এখন শশীপদ দারোগার। খুবই ঘাবড়ে গেছে সে।

ধনকেষ্ট বলে—আসুন দারোগাবাবু, চলুন বৈঠকখানায় বসা যাক। কালী চা-কফি।

দারোগা বলে—ওসবের দরকার নাই।

ধনকেষ্ট বলে—তাহলে ওই ছোঁড়াদের হাজত বাসের ব্যবস্থা করুন। কাল সকালেই সদরে চালান করে দিন ওদের। জেলেই থাকুক গে।

দারোগা বলে—ওসব মতলব ছাড়ুন ধনকেষ্টবাবু, এবার নিজেদেরই না জেলে যেতে হয়।

এ্যাঁ। জেলের কথায় চমকে ওঠে ধনকেষ্ট। শুধোয়—কেন? কী হল যে জেলে যেতে হবে?

শশীপদ এবার তার বদলির কথা, ওই ছেলেগুলো খোদ পুলিশ সুপারের বন্ধুর চেনা, তার কাছেই খবর চলে গেছে।—এসবও জানায়। আর ওই মূর্তি পাচারের খবরও জেনেছে পুলিশ। দুই বিদেশি সাহেব কোনোমতে পালিয়েছে। পুলিশ ধনকেষ্টর পাচার করা মূর্তিটাকেও ধরেছে।

এবার ধনকেষ্টর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

ধনকেষ্ট কাতর স্বরে বলে—এবারের মত বাঁচান দারোগাবাবু, যা লাগে, যত টাকা লাগে দেব। বাঁচান।

শশী দারোগাই আজ বিপন্ন। তাকে সহজে ছাড়বে না কর্তৃপক্ষ। তার কর্তব্যের অবহেলার জন্য সাজা পেতে হবে।

শশী বলে—কে, কাকে বাঁচায় ধনকেষ্টবাবু? নিজেই আর এখানের কেউ নই।

তাহলে কি হবে? ধনকেষ্ট বলে—ওই ছোট দারোগা তো শুনি সাধুপুরুষ। ও তো আমাকে ছাড়বে না।

শশীপদ অভিজ্ঞ লোক। পুলিশ বিভাগের বেশ কিছু খবর রাখে। ও বুঝেছে কিডন্যাপ-এর চার্জ তো আছেই, পুলিশ ওই মূর্তি পাচারকারীদেরও ছাড়বে না।

হয়তো কড়া হাতেই এটার তদন্ত শুরু হবে। শশীপদ বলে—ধনকেষ্টবাবু, পুলিশ সুপার খুব কড়া লোক। মূর্তিপাচারের জোর তদন্ত হবে। তার উপর ওই ছেলেটাকে কিডন্যাপ করে আটকে রেখেছেন—

ধনকেষ্টও এবার ভয় পায়। শশী বলে—যে কোনো মুহূর্তে পুলিশ সাহেব স্পেশাল টিম নিয়ে এখানে হানা দিতে পারে।

ধনকেষ্ট চমকে ওঠে।

—সেকি! তাহলে তো ধনেপ্রাণে মারা পড়ব।

শশী বলে—যে ভাবে হোক এই রাতে সব মূর্তি আর ওই ছেলেটাকে অন্যত্র পাচার করে দেন। পুলিশ এখানে যেন কিছু না পায়। তাহলে কেস কিছুটা হালকা হবে। না হলে হাতেনাতে ধরলে আর বাঁচার পথ থাকবে না।

ধনকেষ্টও কথাটা ভাবছে।

শশীপদ বলে—হাতে সময় নাই, যা করার এক্ষুনিই করুন আর আমি যেসব বলে গেছি সেকথা যেন কোনোদিন প্রকাশ না হয়। চলি—

দারোগা চলে যাবার পরও ধনকেষ্ট অনেকক্ষণ কি ভাবছে। তার সাম্রাজ্যের বুকে এমনি ফাটল ধরবে ভাবতে পারেনি।

তার দৃষ্টি ঘোরে কালীর ডাকে—এখন কি হবে কর্তা!

কালী ত সব শুনেছে, ধনকেষ্ট এবার সজাগ হয়ে ওঠে।

যে ভাবে হোক কাটতেই হবে তাকে।

এই বাড়ির গুদামে বেশ কয়েকটা দামি মূর্তি রয়েছে। এছাড়া, ব্রিফকেস ভর্তি রয়েছে থাক থাক টাকা আর বিপদ হয়েছে ওই ছেলেটাকে নিয়ে!

পুলিশ এসে এসব মাল—ছেলেটাকে দেখতে পেলে তাকে অ্যারেস্টই করবে।

ধরা দেবে না ধনকেষ্ট।

যে ভাবে হোক এই সব মালপত্র নিয়ে রাতারাতি সে খাল ধরে গিয়ে গঙ্গায় পড়তে পারলে সোজা কলকাতায় চলে যাবে। পথে কোথাও ছেলেটাকে ছেড়ে দেবে, যেখানে যায় যাক সে। না হয় গলা টিপে শেষ করে পাথর পুরে বস্তায় জড়িয়ে গঙ্গার বুকে ডুবিয়ে দেবে।

সব প্রমাণ লোপ হয়ে যাবে।

ধনকেষ্ট বলে—যা বলি ঝটপট কর। আর সারেংকে বল, এক পিপে ডিজেল, তেমনি মোবিল যেন তুলে নেয়! দূরের পথ যেতে হবে, দেরি যেন না করে। চল আমার সঙ্গে।

পটলা ঠিক বুঝতে পারল না। সে উপর থেকে কিছু কিছু কথা শুনেছিল।

একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে তা অনুমান করে সে, কিন্তু আসলে কী ঘটেছে তা বুঝতে পারে না। রাতের অন্ধকারেই তার হাত বেঁধে মুখে ন্যাকড়া পুরে কোনোমতে টানতে টানতে এনে ওই লঞ্চেও তোলা হল। এর মধ্যে চট বস্তা জড়ানো বেশ কিছু মাল, বড় সুটকেস কয়েকটা, খাবার জল—কিছু খাবারও তোলা হয়েছে। গাংয়ের বুকে রাত্রির অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে দেখে ধনকেষ্টও খুব উত্তেজিত। কালীচরণসহ আরও বেশ কিছু লোক উঠেছে।

আর লঞ্চও ছেড়ে দেয়!

ধনকেষ্ট নিষেধ করে—সার্চলাইট জ্বালাবি না। গাংয়ে তারার আলো পড়েছে।

চেনা গাং—জোরে চল, ভোরের আগেই বড় গাংয়ে পড়তে হবে। লঞ্চটা বেগে চলেছে। ইঞ্জিনের একটানা শব্দ ওঠে।

পটলাকে ওরা আটকে রেখেছে নীচের একটা বেঞ্চে।

কোণের দিকে বসিয়েছে তাকে যাতে বাইরে থেকে সহজে কারোও নজরে না আসে।

হাত-পা বাঁধা পটলার।

না হলে সাঁতারে পটলা খুব পারদর্শী।

গঙ্গার বুকে দীর্ঘ সাঁতারেও সে যোগ দেয়, প্রাইজও পেয়েছে। তার কাছে এই খাল কিছুই নয়।

লাফ দিয়ে জলে পড়ে পালাতে হবে যে ভাবে হোক, কিন্তু হাত-পা বাঁধা কিছু করার নেই। চুপচাপ বসে আকাশ-পাতাল ভাবছে।

হোঁৎকারাও জানতে পারেনি যে তাদের চুরির দায়ে অ্যারেস্ট করে হাজতে পাঠাবার সব ব্যবস্থাই করেছে ধনকেষ্ট। তাদের বিপদই হত।

কেবল সুপারের রেডিও ম্যাসেজই বাঁচিয়েছে তাদের। দারোগাও চিৎপটাং আর ধনকেষ্ট এবার চাচা আপন পরান বাঁচা। তাই তারা এ যাত্রা বেঁচে গেছে।

তবু রাতের অন্ধকারে বের হয়েছে তারা। হোঁৎকা গোবরার দল সাবধানে সেই ভাঙা বাড়িতে এসেছে। চারিদিক নির্জন। কেউ কোথাও নেই। এখানে ওখানে খুঁজছে তারা।

পটলার দেখা মেলে না।

একটা ঘরে দেখা যায় পটলার একটা রুমালই পড়ে আছে। আর কিছুই নেই।

মেঝেতে তাকাই। জলের 'কুঁজো'ও রয়েছে। চারিদিকে পড়ে আছে বিড়ি দেশলাই কাঠি, কিন্তু কেউ কোথাও নাই।

গোবরা বলে—এখানেই ছিল পটলা। ব্যাটারা পাহারা দিয়ে আটকে রেখেছিল কিন্তু গেল কোথায়।

তার জবাব মেলে না।

ওই বিরাট ধ্বংসস্তূপ ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। ওরা সাবধানে খালের দিকে আসে।

সেখানেও কেউ নাই। ঘরে আলো জ্বলে না।

হোঁৎকা বলে—কেস গড়বড়!

গোবরা বলে—লঞ্চও নাই। ব্যাটারা তাহলে কি পটলাকে নিয়ে কোথাও পালালো? কি হবে এখন?

আমিও ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারি না।

রাত দুপুর হবে। গেস্টরুমে খেয়ে দেয়ে শুয়েছি সবে। চোখ লেগে এসেছে।

হঠাৎ বেয়ারার ডাকে চাইলাম।

বেয়ারা বলে—সাহেব আপনাদের তৈরি হতে বললেন। এক্ষুনি বের হতে হবে।

জিপ তৈরিই ছিল।

সুবিনয়বাবু জি. এফ. পি আরও কজন অফিসারও এসেছে। আমাদের নিয়ে জিপ এসে গঙ্গার ধারে থামল।

দেখি সেখানে তখন বেশ কিছু পুলিশ হাজির। দু-তিনটে লঞ্চে উঠে ওরা এবার গঙ্গা ছেড়ে বড় খালে ঢুকে চলেছে। দুখানা লঞ্চও চলেছে রাতের অন্ধকারে খালের বুক চিরে।

পথে কোনো নৌকা দেখলে তাকে সার্চলাইট ফেলে দেখছে, কি সব জিজ্ঞাসাবাদও করছে, আবার চলেছে।

তখন ভোর হয় হয়।

হঠাৎ দেখা যায় ওদিক থেকে একটা লঞ্চ আসছিল সেটা এই দুটো লঞ্চকে দেখে সটান মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই পুলিশ হুঁশিয়ার করে।

ওই লঞ্চকে ধরতেই হবে। ও পালাচ্ছে কেন? জোরে চল। আরও জোরে।

এবার পুলিশ লঞ্চও ছুটছে। মাঝেমাঝে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে এদের তীব্র সাইরেন বাজছে।

ওই লঞ্চটাও পালাতে চায়।

ধনকেষ্ট ভাবতে পারেনি যে এইভাবে পুলিশ তার পথ আটকে দেবে। তবু শেষ চেষ্টা হিসাবে পালাতে হবে।

পটলাও দেখেছে ব্যাপারটা।

দুটো লঞ্চও যেন তেড়ে আসছে। পুলিশ লঞ্চের গতিবেগের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না ধনকেষ্টর মাল বওয়া লঞ্চ। তাই ওরা এসে ঘিরে ফেলে লঞ্চটা।

ধনকেষ্ট ওই লঞ্চ থেকে চটে মোড়া মূর্তিগুলোকে খালের জলে ফেলার চেষ্টা করতে ওই লঞ্চ থেকে রাইফেল উঁচিয়ে ধরে পুলিশ।

মাইকে ঘোষণা করা হয়—কিছু জলে ফেলার চেষ্টা করো না ধনকেষ্ট। তোমার লঞ্চ আমরা ঘিরে ফেলেছি। লঞ্চ থামাও না হলে গুলি চালাতে বাধ্য হবো।

সারেংও থাকে ওপরে।

সে দেখছে ওই উদ্যত রাইফেল। তাই সেও লঞ্চ থামিয়ে দেয়।

আর এবার পুলিশ সুপারের পিছনে আমিও ওই লঞ্চে উঠে পটলাকে বন্দি অবস্থায় দেখে ছুটে যাই।

পটলা!

ওর হাতপায়ের বাঁধন খুলে দিতে পটলাও মুক্ত হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে।

সমী—ওরা?

বলি—ওরা ভালোই আছে।

পটলা বলে—ওই ধনকেষ্ট আমাকে জলে ডুবিয়ে মারত। পুলিশ সুপার বলেন—আর কেউ তোমাকে মারবে না। এবার ধনকেষ্টবাবুকেই তার পাপের সব শাস্তি দেওয়া হবে। ওকে অ্যারেস্ট করুন।

—স্যার! ধনকেষ্ট আর্তনাদ করে ওঠে।

কিন্তু পুলিশ তাকে হাতকড়ি পরিয়েছে। আর লঞ্চেই পাওয়া যায় সাত-আটটা দামি মূর্তি, যার মূল্য কোটিখানেক টাকা আর দুই সুটকেস বোঝাই কয়েক লাখ টাকা আর সোনার বিস্কুট—তাও কেজি তিনেক হবে।

সারা গ্রামের লোক এবার খালের ঘাটে ভেঙে পড়েছে হাতকড়ি-পরা এতদিনের সেই প্রবলপ্রতাপ ধনকেষ্টবাবুকে দেখতে। কালীচরণ—তাপ সিংয়ের দলের ছাগলের দড়ির মত কোমরে দড়ি বাঁধা।

তাদের গুদামে আরও অনেক মাল পাওয়া যায়। সিন্দুকে পাওয়া যায় সারা এলাকার মানুষের লুটে নেওয়া সম্পত্তির জাল দলিল।

আজ ধনকেষ্টর সব বেলুন চুপসে গেছে।

সারা গ্রামের মানুষ আজ খান-পঞ্চাশেক ঢাক-ঢোল নিয়ে গাঁয়ে বিজয় মিছিল বের করে, তার আগে আগে চলেছি আমরা।

আজ গ্রামের মানুষের মহাশত্রু নিপাত হয়েছে। ধনকেষ্টর সবকিছু পুলিশ আটকেছে।—তার দলবলকেও।

এবার বলি—হোঁৎকা ফিরে চল কলকাতায়।

হোঁৎকা বলে—গ্রামের মানুষের আজ মহাভোজ। ভোজটা না খাইয়া যামু?

বাদলমাস্টার বলে—না-না। ভোজে তোমরা থাকবে না, তা কি হয়! তোমরাই তো এই ভোজের মূলে।

কেশব দত্তের পুকুরে জাল পড়েছে। সে এই ভোজের সব মাছ জোগাবে। আর মাছের সাইজও দারুণ। এক-একটা আট কেজির কম নয়।

লক্ষ্যভেদ

ভাগবত সরখেল টাকার কুমির। কুমির না বলে হাঙ্গর বলাই ভালো। কুমির তো খপ করে শিকার ধরে জলে ডুবিয়ে তাকে মেরে তারপর যা করার করে। কিন্তু হাঙ্গর জ্যান্ত প্রাণীর গা থেকেও মাংস খুবলে নেয়। তিলে তিলে মারে।

ইদানীং সরখেল মশাই এদিকে আবার সিমেন্ট লোহালক্কড়ের গুদাম বানিয়েছে। বড় ছেলে ব্যবসা দেখছে। দু-তিনটে গাড়ি। আর ছোট ছেলে আমাদের চেয়ে বেশ বড়, স্কুলে পড়ে। আজ ছ-বছরের বেশি ক্লাস টেনে-এর টেস্টে এলাউ হয়নি।

ভাগবত সরখেল আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবে মাঝে মাঝে দু-একটাকা চাঁদাও দেয়। বলে, —পল্লি উন্নয়ন করো। খেলাধুলা করো—দেশকে গড়তে হবে।

আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের লাগোয়া একটা বুনোগাছ ভর্তি জায়গা পড়েছিল। হোঁৎকাই সেদিন উদ্যোগ করে পাড়ায় ঘুরে কিছু পয়সা উঠিয়েছে তার বাকিটা জোগান দেয় পটলা। কুল্যে প্রায় পঞ্চাশ টাকা খরচা করে আর আমাদের ক্লাবের পাঁচজন পাণ্ডা ও বত্রিশজন কুচো-কাঁচার পাঁচদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে, মাঠটা ধোপদুরস্ত হয়ে উঠল।

সাইনবোর্ড টাঙিয়ে এবার বেশ ধুমধাম করে মাঠের উদ্বোধন করা হল এখানে প্রিয় জননেতা গিরিধারীদাকে দিয়ে।

তারপর থেকেই মাঠে খেলছি আমরা। এবার সেভেন সাইড শিল্ড খেলার আয়োজনও করা হল।

কদিন পর শিল্ডের খেলা, মাঠে গোলপোস্টে জাল পড়েছে। পটলাদের চুনের গোলা থেকে হাত সাফাই করে আনা বালতি কয়েক চুন দিয়ে মার্কিং হচ্ছে। মহাভারতও এখন আমাদের দলে ভিড়েছে। তার বাবার কথামত হোঁৎকার কাছে ডন বার-এর খেলা শিখতে আসছে নিয়মিত।

হোঁৎকা ইদানীং নতুন চ্যালা পেয়ে খুব খুশি। সকালেই আসে ওমলেট, মাখনরুটি কলা। হোঁৎকা বলে, —মহাভারত, ও তুই ভাবিস না। তোকে চাবুক কইরা দিমু। হুম্—

মহাভারত লাল ল্যাঙট পরে বিশাল দেহ নিয়ে ডন দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। ঘামছে গলগল করে। এহেন সময় সরকার ও আরো দুজন লোককে নিয়ে এসে হাজির হয়েছে ভাগবত সরখেল!

মহাভারতকে খালি গায়ে তখন আখড়ার মাটিতে ওই ধুলো মাখা অবস্থায় গড়াগড়ি খেতে দেখে ভাগবত সরখেল গর্জে ওঠে, — বলি, হচ্ছে কি? আমার ছেলেকে মাটিতে আছড়ে ফেলবে, কাপড়চোপড় কেড়ে নেবে, কার এতবড় বুকের পাটা!

হোঁৎকা এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি একগাল হেসে বলে,— না মেসোমশাই, মহাভারত

বইঘর.কম
এক্সসারসাইজ করতাসে। বডি ফিট হইবো, মেদ কোমবো।

পটলা বলে, —শরীর ভা-লো-লো...

পটলার ব্রেক ফেল করেছে যথারীতি।

ভাগবত সরখেল গর্জে ওঠে, —থামো। শোনো ছোকরারা, তোমরা তো জানো না এ মাঠ আমার। ওহে বসন্ত, ফিতেতে মেপে নাও। এই যে ম্যাপ দেখ।

পটলা জমিজায়গার খোঁজ রাখে। সে বলে, —এ জায়গার মালিক ছিল হরি দে। ত-ত তার...

অ্যাঁ—ভাগবত সরখেলের বিশাল দেহ কেঁপে ওঠে, যেন হিমালয় পর্বতে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। ভাগবত সরখেল কাগজটা দেখিয়ে বলে, — হরি দে-র পুত্রবধূর কাছ থেকে এ জায়গা খরিদ করেছি হে!

হোঁৎকা বলে, ট্যাহা দিসেন তারে, না দেনা আর সুদ মিলাইয়া এই দখল লিসেন?

শাট আপ! —ভাগবত সরখেল ইংরিজিতে ধমক দেয়।

দু-চারজন লোকও জুটে গেছে। পাড়ার মিত্তির মশাই, যাদববাবু, নরেন ঘোষরাও এসেছে। নরেন ঘোষ বলে পাড়ার ছেলেরা খেলাধুলো করে, এ মাঠ নিয়ে আপনার কি হবে?

ভাগবত সরখেল বলে, —কিনেছি এখানে ফেল্যাট বাড়ি বানাবো। কই রে খোঁটা পোত!

হোঁৎকা বলে, —শিল্ডের খেলা হইব না?

ভাগবত সরখেল দন্ত কিড়মিড় করে ওঠে, —না! হইব না। ওইসব শিলনোড়া নিয়ে এখানে খেলা চলবে না। দরকার হয় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করবো এখানে।

তারপর ছেলে মহাভারতের দিকে ফেরে ভাগবত, —অনেক হয়েছে। কাপড়চোপড় পরে নিয়ে বাড়ি চল। ব্যবসা দেখবি।

ম্লান মুখে কাপড়চোপড় কাঁধে ফেলে বাবার পিছনে পিছনে বাধ্য ছেলের মত চলে গেল মহাভারত।

গদাই বলে—কী হবে রে!

হোঁৎকা বলে, —যা করার করুক, বাধা দিমু।

পটলা বেশ উত্তেজিত। সে বলে, —রক্ত দেব, শহিদ হব—তবু মাঠ দেব না।

এতবড় বিপর্যয় ঘটতে দিতে পারি না। পটলা শহিদ হলে আমাদের ক্লাবই উঠে যাবে। তাই গিরিধারীদের কাছে এসেছি আমি আর গদাই।

গিরিধারীদা সদাব্যস্ত মানুষ। বসার ঘরে একদল লোক তাকে ঘিরে আছে। খালের জল কি করলে পানীয় জলে পরিণত হতে পারে, তাই নিয়ে আলোচনা চলছে। আড়চোখে আমাদের দেখলেন তিনি।

গিরিধারীদা আমাদের কথা শুনে বলেন, — সে কী! খেলার মাঠ দখল করবে এইভাবে ভাগবত সরখেল। ছিঃ ছিঃ। লোকটাকে নিয়ে আর পারলাম না। এক নম্বর আগ্রাসী মনোভাবের লোক। ঠিক আছে আমি দেখছি।

খেলা হবে কি না এ নিয়ে প্রশ্ন ছিল। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বিকেলে যথারীতি খেলা শুরু হয়েছে। সাদা কালো প্যান্টজামা কেডস পরে এসেছে রেফারিং করতে। দর্শকও অনেক জুটে গেছে।

খেলার শেষে আমাদের ক্লাবঘরের সামনে জামগাছের নীচে বসে হোঁৎকা বীরদর্পে বলে, —মাইট ইজ রাইট। মাঠ কে লয় দেহি।

পটলাও এখন ভরসা পেয়েছে। বলে, —সি-সিওর।

এমন সময় জিপটা এসে আমাদের সুমুখে থামে। পুলিশের লাল জিপ। তার থেকে নামলেন থানা অফিসার শ্রীকান্তবাবু। শ্রীকান্তবাবু আমাদের চেনেন, এখানে ওখানে ভলেনটিয়ারি করতে দেখেছেন।

—একটা খারাপ খবর আছে হোঁৎকা।

হোঁৎকা বলে, —কয়ে ফেলান স্যার, তয় কইতাসি জান্ লইয়া যান, কিন্তু মাঠ ছাড়তি পারুম না।

শ্রীকান্তবাবু বলেন, —মাথা গরম করো না হোঁৎকা। তোমরা বাপু মাঠ নিয়ে এখন গোলমাল করো না। কদিন বরং খেলা বন্ধ রেখে ভাগবতবাবুর সঙ্গে একটা মীমাংসার চেষ্টা করো।

গদাই বলে, গিরিধারীবাবুকেও বলেছি স্যার। তিনি বললেন খেলা চালাও গে।

শ্রীকান্তবাবু অবাক হল, সে কী! তিনি বলেছেন তোমাদের এই কথা? তবে যে দেখলাম ভাগবতবাবুর গাড়িতে তিনিও গেলেন থানায়। ভাগবতবাবুর হয়ে তিনিও অনেক কথা বললেন।

আমরা তো অবাক—হতবাক।

শ্রীকান্তবাবু বলেন, তাই এসেছিলাম। ওরা বাধা দিলে খেলা বন্ধ রেখো কদিন।

জিপ হাঁকিয়ে থানার পুলিশ থানাতে ফিরে গেল। আমরা তখন পড়েছি অকূল পাথারে।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—গদা! তরে কিল করুম! ক্যান গেসলি ওই গিরিধারীডার কাছে? ও ব্যাটা অ্যাহন মৌকা পাইয়া ভাগবতেরে চাপ দিইয়া কিছু ম্যানেজ কইরা আমাগো পথে বসাইব!

গদাইও বুঝতে পারে ব্যাপারটা। মিনমিন করে সে, —তাইতো দেখছি।

আমি বুদ্ধি বাতলাই, পটলা তোদের বাগানের এদিকের মাঠটায় আপাতত খেলা হবে। তোর ঠাকমাকে বলিগে চল। তোকে সুইসাইড করতে হবে না পটলা।

হোঁৎকা এতক্ষণ কথাটা ভাবেনি। এবার তার মাথাতেও আসে কথাটা।

—তাই চল। এ বছর শিল্ড খেলা করনের লাগবোই। তয় তোরে কইছি সমী, ও মাঠ লমুই।

মাঠের ব্যাপারে এক কথায় পটলার বাবা রাজি হবেন তা ভাবিনি। পটলের ঠাকুমা আর ওর বাবাকে প্রণাম করে আসি।

পরদিন সকালে দেখি সারা মাঠে এখানে ওখানে হাঁটু ভোর গর্ত। আর রাজ্যের ভাঙা কাচ মাঠে পড়ে আছে। চলাফেরা করা বিপজ্জনক। ওপাশের আবর্জনা স্তূপ করে রাতারাতি ফেলেছে মাঠে।

হোঁৎকা আড়ালে বলে, —ওটা করছি আমিই। চুপ মাইরা থাক্।

অবাক হই, —তুই!

হোঁৎকা বলে, —নালি হুট কইরা মাঠ ছাইড়া গেলে লোকে কইব কাউয়ার্ডের মত পালাইয়া

বইঘর.কম

গেছি। তাই পাবলিক সিমপ্যাথি লইয়া ওই নতুন মাঠে খেলা শুরু করুম।

গদাই বলে, —বেশ ভালোই করছিস হোঁৎকা।

হোঁৎকা বলে—পথ হোঁৎকা ভালোই বাইর করে। আর একটা চান্স লইতি হইব।

পটলা বলে, —বরং চ-চল্ এখন ভাগবতের কাছে। যেন সারেন্ডার করেছি এই বলে যদি কিছু টাকা ম্যানেজ হয়।

টাকার দরকার তো আছেই, তাছাড়া, ভাগবতের আসল মতলবটাও একটু আঁচ করা দরকার। শেষ পর্যন্ত পটলার কথাতে সবাই সায় দিই।

মহাভারতও আমাদের দেখে একটু অবাক হয়।

হোঁৎকা বলে দরদীকণ্ঠে, —ক্লাবে যাস না ক্যান? আরে তগোর জমি তো ছাইড়াই দিমু। তুই আমাগোর ফেরেন্ড। চল—তোর বাবাকে কথাটা জানাইয়া দিমু।

ভাগবত সরখেল ভাবতে পারেনি আমরা আসবো। মনে মনে খুশি হয় সে। হোঁৎকা পরম বিনয়ের সঙ্গে মোলায়েম করে বলে, —আপনি বলার পর আমরা ভাইবা দেখলাম, মহাভারত আমাদের মেম্বার। তার বাবা এতবড় মানী লোক, আপনার কথা ফেলুম ক্যান। তাই ক্লাবের মিটিং-এ ঠিক করছি ওই মাঠে খেলুম না।

আমি বলি, —অন্য মাঠে খেলছি, কিন্তু সে মাঠের একটা ডোবা বুজিয়ে ফেলতে হবে—এজন্য কিছু টাকা দরকার।

ভাগবত এখন দরাজ দিল। বিনাবাধায় কাজ হাসিল হতে দেখে ভাগবত বলে, —তা সত্যি। ঠিক আছে শ তিনেক দিচ্ছি এই দিয়েই কাজ চালিয়ে নাও। পরে দরকার হলে আরও কিছু দেব না হয়।

মহাভারতও খুশি হয়েছে, সেও মাঠে যাবে আবার। তিনশো টাকাই দিয়েছে ভাগবতবাবু।

সেদিন দেখি ট্রাক বন্দি ইট আসছে। মাঠের দেওয়াল তুলছে মিস্ত্রিরা। ভাগবত সরখেলকে হঠাৎ ওখানে গাড়ি থেকে নামতে দেখলাম। আমরা নির্বাক, শোকে মুহ্যমান।

হঠাৎ ভাগবত সরখেলকে আমাদের দরমা ঘেরা ক্লাবের জামতলার দিকে পায়ে পায়ে চলন্ত পিপের মত আসতে দেখে অবাকই হই।

ফটিক দৌড়ে ঘরের মধ্য থেকে একটা লোহার ফোল্ডিং চেয়ার এনে দিল। বলে, —বসুন মেসোমশাই।

ভাগবতবাবু বলে, —মহাভারতের বিয়ে এই সতেরোই শ্রাবণ। তবে কলকাতার বাইরে বর্ধমান—পাল্লা রোডের ওপারে, মানে দামোদর নদী পার হয়েই গ্রামটা। এখান থেকে সোজা গাড়ি যাবে পাল্লায় নদীর ধার অবধি। তারপর নৌকায় পার হয়েই গ্রাম। তোমরা যাবে কিন্তু চলি তাহলে।

ভাগবতবাবু ফোল্ডিং চেয়ার ছেড়ে ওঠে।

পটলা কি ভাবছিল। সেও বলে—সি-সিওর যামু। ওই ভাগবতবাবুর কাছাকাছি থাকবি। কাৎ-এ পেলে ওকে একবার চেপে ধরতে হবে। লাস্ট ট্রাই করবো মাঠটার জন্যে।

পটলা দুহাত তুলে প্রণাম করে, জয় মা-ক-ক

ওই জিবটা মাকরুণাময়ীই যেন স্বয়ং টেনে ধরেছেন। আমিও প্রণাম জানাই—মা লাস্ট চান্স,

বইঘর.কম

মুখ রেখো মা করুণাময়ী, পাঁচ সিকের মানসিক নয় মা, আস্ত পাঁঠাই দেব।

কলকাতার বাইরে বরযাত্রী যাবার জন্য একটু আনন্দও বোধহয়। মহাভারত ক্লাবে আসছে এখন ঘনঘন। কদিন ধরে বেচারা ভাবনায় পড়েছে। বলে—তোরা সঙ্গে যাবি কিন্তু।

এর মধ্যে মহাভারত আমাদের ক্লাবের সকলের দাদা হয়ে গেছে। পটলা বলে—নিশ্চয় যাব মহাভারতদা।

ছেলের বিয়ের দিনে নিজেদের গাড়ি করে, ভাগবতবাবু বিরাট হৈ চৈ করেই বর ও বারযাত্রীদের নিয়ে চলেন বর্ধমানে। শ্রাবণ মাস-এর মধ্যে বৃষ্টি নেমেছে এবার। কলকাতা থেকে গাড়িতে যেতে দেখা যায় পথের দুধারে সবুজ ধানক্ষেত ও গাছগাছালি।

শক্তিগড়ে এলে জি টি রোড ছেড়ে গাড়িগুলো চলে সরু পাকা রাস্তা ধরে। পিচ-এর রাস্তাই। তবে মাঝে মাঝে গর্ত হয়ে গেছে। দুদিকে ধানক্ষেত। সবুজ ধান মাথা নাড়ে বাতাসে। আকাশে শাওনের কালো মেঘগুলো ঘুরছে। মাঝে মাঝে দু-এক পশলা বৃষ্টি আসছে। ঝড়ো হাওয়া বয় এলোমেলো।

সামনে শাওনের দামোদর নদী।

বড় নৌকায় উঠেছে বরযাত্রীর দল। প্রায় সত্তর-আশিজন লোক। ব্যান্ড তাসা জয়ঢাক ইত্যাদি বাদ্যি বাজনা আর মালপত্রতে ওই নৌকা বোঝাই হয়ে গেছে।

বরকর্তা-বর ও বরের বন্ধুদের জন্য রয়েছে একটা অন্য নৌকো। খাতির করে তাতেই তুলেছে আমাদের। ভাগবতবাবু, গিরিধারীদাও রয়েছেন ওই নৌকোয়।

হোঁৎকা পটলা তখনও নৌকোয় ওঠেনি। কি যেন কথা বলছে ওরা।

তাড়া দিই, —উঠে আয় হোঁৎকা, পটলা।

ওরা দুজনে এসে উঠল, তারপরই নৌকোয় পদার্পণ করল ভাগবতবাবু। নৌকো কেঁপে ওঠে থরথরিয়ে। নৌকা জলের বর্ডার লাইন ছুঁইছে।

ওদিকের নৌকোয় বাজি ফাটছে। হ্যাঁ, বাজির মত বাজি। শূন্যে উঠে দুমদাম শব্দে ফাটছে বাজি। ভাগবত সরখেল মাঝে মাঝে নৌকোয় উঠে পড়ে তারিফ করছে।

ওঁর দোল নিতে মাঝি হুঁশিয়ার করে, —নড়বেন না বাবু।

ওদিকে হঠাৎ বড় নৌকো থেকে বোমা জড়ানো হাউই একটা শূন্যে না উঠে কিভাবে নদীর উপর দিয়ে গাইডের মিসাইল-এর মত সোঁ সোঁ শব্দ করে আমাদের নৌকোর দিকেই ধেয়ে আসছে...

হাউইটাকে আসতে দেখে ভাগবত ওই নৌকোর উপর লম্ফ দিয়ে গর্জাচ্ছে—অ্যাই খবরদার!

মাঝি চিৎকার করে ওঠে, —বা-বু—

বাবার সঙ্গে ছেলে মহাভারতও লাফ দিয়ে উঠেছে। ওই বিশাল দুটো মৈনাকের লম্ফে নৌকোটা একদিকে পুরো কাত হয়ে যায়, গড়িয়ে পড়ে চলন্ত পিপের মত টপটপ করে স্বয়ং ভাগবত সরখেল—আরও কজন।

আমরাও বেগতিক দেখে নদীতে লাফ দিয়েছি। আমাদের নৌকো কার্নিক খাওয়া কাটা ঘুড়ির মত লাট খেতে খেতে ভেসে চলেছে।

—বাঁচাও, বাঁচাও—

নদীর এদিককার চিৎকার শুনে চাইলাম। নদীর স্রোতে একটা পিপে যেন গড়িয়ে ভেসে চলেছে, কখনও ডুবছে আবার জেগে উঠে শূন্যে দুটো হাত তুলে চিৎকার করে।

হোঁৎকা বলে, —ভাগবতবাবুরে—

ইতিমধ্যে ঘূর্ণিতে পড়ে তখন ভাগবত সরখেল পাক খাচ্ছে। সে চিৎকার করে, —বাঁচা হোঁৎকা বাঁচা। ওরে, খেলার মাঠ তোদেরই দেব।

পটলা নিরাপদ দূরত্বে রয়েছে ওর থেকে। গোবদা হাতে একবার ধরতে পারলে ডুবিয়ে দেবে তাকেও। ডুবন্ত মানুষ আরও বিপজ্জনক।

ভাগবতবাবু ঘূর্ণিতে বনবন করে ঘুরছে, এগিয়ে যাচ্ছে ঘূর্ণির কেন্দ্রের দিকে। দুহাত উপরে তুলে চিৎকার করে, বলেন, —ভাগবতের দিব্যি, ও মাঠ গিয়েই ছেড়ে দেব। বাঁচা-ও ওক্‌ক...।

পটলা মাছের মত সাঁতরে গিয়ে ভাগবতবাবুর ঘূর্ণায়মান দেহটাকে এক ধাক্কা দিতেই, বয়ার মত ভাসমান দেহটা ঘূর্ণি থেকে ছিটকে বের হয়ে যায়। ওদিকে হোঁৎকা তখন ভাগবতবাবুর কাদামাখা চুল মুঠি করে ধরেছে খপ করে। আমি ও গদাই দুদিকে ভাগবত-এর দুটো হাত ধরেছি। আমরা ভাগবতবাবুকে ভাসিয়ে নিয়ে স্রোতের টানে এবার তীরের দিকে চলেছি।

আমরা নদীর তীরে এনে পুরু পলিকাদার উপর ভাগবতবাবুর বিশাল লাশকে টেনে তুলি। টর্চের আলো পড়ে, লোকজন ছুটে আসে।

—বেইমশাই!

বেয়াইমশাইয়ের দরাজ গলার ডাক শুনে ভাগবতবাবু উঠে বসেন। তাঁর সারা মাথায় মসৃণ প্রলেপ। আদ্দির পাঞ্জাবি জলে ভিজে গায়ে চেপে বসেছে। জুতো নেই, —পায়ে মোজা ঠিক আছে।

গর্জে ওঠে ভাগবতবাবু, —বেইমশায় অ্যাঁ ডুবিয়ে মারতে চান? মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমাকে শেষ করে, আমার সম্পত্তি দখল করার মতলব!

ভদ্রলোক চমকে ওঠেন—সে কী কথা!

ভাগবত সরখেল বলে, —ছেলেরা না থাকলে ডুবেই যেতাম! উঃ এখানে ছেলের বিয়ে দেব না। যাইহোক আমাদের মধ্যস্থতায় শেষপর্যন্ত বেশ ভালোভাবেই বিয়ের পর্ব মিটে যায়। দুই তরফই খুব খুশি।

ভাগবতবাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন। ফিরে এসেই ওই মাঠের দখলস্বত্ব পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবকে লিখে দিয়েছেন। সেদিন ঘটা করে শিল্ড ফাইনালের খেলা হল ওই মাঠেই। প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন ভাগবতবাবু। এবার আর গিরিধারীবাবুকে আমরা ডাকিনি।

হোঁৎকার বুদ্ধি

পটলার ঠাকুমার ব্রত উদ্‌যাপন, বুড়ির টাকার অভাব নেই, ছেলেরা সকলেই বেশ উপযুক্ত হয়ে উঠছে।

নিজেদের দু-তিনটে কারখানা, পৈত্রিক ব্যবসা আর কুলেপাড়া সি-আই-টি অঞ্চল যখন ছিল হোগলাবনে ঢাকা জলা তখন পটলার ঠাকুর্দা জলের দরেই প্রচুর জমি কিনে রেখেছিলেন, আজ সেখানে লাখ টাকা কাঠা, তেমনি জমজমাট এলাকায় খানতিনেক বিরাট বাড়িও তুলেছে। ভাড়া যা আদায় হয় তাও কম নয়।

তবু পটলার ঠাক্‌মা সেই সাবেকি বাড়িতেই রয়েছে ছেলেদের নিয়ে। বিরাট বাগান-পুকুর, তার পাশে মন্দির, নাটমন্দির, বনেদি বাড়ির ব্যাপার সবই রয়েছে।

বুড়ি গুরুদেবের জন্মোৎসবে তিনদিন ধরে নামকীর্তন বসিয়েছে। আর ব্রাহ্মণ ভোজন-এর বিরাট আয়োজনও করেছে। কাঙালী ভোজন হবে এর পর।

বাড়িতে এতবড় কাজ, পটলার ঠাক্‌মা তাই আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের ছেলেদেরও ডেকে বলেন,—ওরে হোঁৎকা—তোদের সব দেখাশোনা করতে হবে বাপু। এতবড় যজ্ঞিবাড়ির কাজ, পরিবেশনের ব্যাপার, তোরাই সামলা। কিরে পারবি তো?

জানি পটলা আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারি কাম কামধেনু। যখন তখন দুধ জোগায় আর সেটা আসে ঠাক্‌মার ফান্ড থেকেই। তাই হোঁৎকা তার দেশজ ভাষায় বলে। —ভাবতি হইব না ঠাক্‌মা, সব এক্কেবারে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ম্যানেজ কইরা দিমু। দেখবেন অনে—

ঠাকুমা ভরসা পায়—তাই কর ভাই। তোদের ভরসাতেই তো একাজে নেমেছি। ওই সরকার-ম্যানেজার থেকে চাকর ঠাকুর অবধি সব্বাই চোর। দেখিস যেন বদনাম না হয়।

দায়িত্ব এখন আমাদের। পটলার ছোটকাকা বলেন, মায়ের বানর সেনা এখন ফিট হয়ে গেছে। দেখবে দাদা, সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

বাজারের ফর্দ নিয়ে বের হয়ে গেলাম, হোঁৎকা-গোবরা এদিকে এক্সপার্ট। আমি ফটিক লেগেছি ডেকরেটার-এর পিছনে। কাজ চলছে। গোমস্তা শশী ঘোষের মুখখানা হাঁড়ির মত গম্ভীর হয়ে যায়। বলে সে—ঠাক্‌মা, আমরা কি নেই? ওরাই সব করছে।

শশী ঘোষকে আমরা চিনি। পটলাদের বাজারের সরকার। ওর নামে অনেক নালিশ শুনি দোকানী, ব্যাপারীদের কাছে।

ঠাক্‌মা বলেন—ছেলেরাই করুক। তুমি বাপু দেখাশোনা করো। রান্নার দিকটা সামলাও।

শশী গোমস্তা মুখ ব্যাজার করে বলে—ঠিক আছে। ওই কোথা থেকে হালুই ঠাকুর লোকজন এনে তদারক করছে। যজ্ঞের ভিয়েন বসেছে।

পুষ্পান্ন, ডাল, ছানার ডালনা, পটলের ডালনা, চাটনি, দই আর সন্দেশ, রসগোল্লা। মিষ্টির ব্যাপারে শশী ঘোষ বলতে যাবে—

—ওটা সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে বলে দিই।

হোঁৎকা বলে—না ঠাক্‌মা। কারিগর আনাই ঘরেই বানামু। খাঁটি জিনিস হইব। ঠাক্‌মা বলেন—তাই ভালো।

শশী ঘোষ-এর মুখ গোদা হয়ে ওঠে।

আমি বলি—হোঁৎকা, কেসটা ভালো মনে হচ্ছে না। শশী ঘোষ-এর ভাতে হাত দিচ্ছিস। পটলা বলে—ঠি-ঠিক করেছিস। ও ক-কমিশন মারে। ত-তোরাই সব করবি ক-কাকা বলছিল।

পুষ্পান্ন অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গোবিন্দভোগ চালের নিরামিষ পোলাও, ঠাক্‌মার জন্যে পটলার বাবা একেবারে খুরদা থেকে টিনবন্দি আসল খাঁটি গাওয়া ঘি আনিয়েছে। দেবতার ভোগ হবে ওই ঘৃতপক্ক পুষ্পান্ন দিয়ে আর সেই ভোগই দেওয়া হবে নিমন্ত্রিতদের।

শশী ঘোষ-এর স্বভাবের খবর পটলার ছোট কাকাও জানে। তাই নিজেই রয়েছে ভোগ মন্দিরে। ঠাক্‌মা বলে—ওরে বিভু যেন ঘিয়ের কার্পণ্য করিস না বাবা। ছোটকাকা বিভূতিবাবু বলে—আমি রয়েছি মা। কিহে শশী ভোগ ঠিক হবে তো?

শশীর মন-মেজাজ ভালো নেই। এত বড় কাজ—তার থেকে কিছু কমিশন সে পেত, কিন্তু সব পথই বন্ধ করেছে ওরা। শশীর সামনে মালিক রয়েছে। শশী বলে—আজ্ঞে!

ভোগরাগ-এর পর নিমন্ত্রিতরা বসেছে প্রসাদ পেতে, বহু মান্যগণ্য বিশিষ্ট অতিথিই রয়েছে। প্রসাদ দেওয়া হল—উচ্ছিষ্ট ঘৃতপক্ক পুষ্পান্ন—পটলার বাবা-ঠাক্‌মা-ছোটকাকাও রয়েছে। আমরা পরিবেশন করছি। পুষ্পান্ন হাতায় তুলে পাতে দিয়েই অবাক হই, কোথায় পুষ্পান্ন—ঘিয়ের লেশমাত্র নেই—একেবারে রং-করা যেন পিণ্ডির ড্যালা। মুখে দিয়ে সকলেই থ!

ঠাক্‌মা বলে—একি রে! এই তোমাদের পুষ্পান্ন—ঘিয়ের লেশগন্ধ নেই, এ যে অখাদ্য রে! অ বিভু—

বিভূতিবাবু হাঁক পাড়ে—ঠাকুরমশাই, এ কি রান্না করেছেন? ঘিয়ের খোশবু নেই—পিণ্ডির ড্যালা।

ঠাকুর হুঁকো খাচ্ছে, বলে—ঘি তো আপনার সামনেই দিলাম।

শশী বলে—আপনি তো বরাবরই রসুইখানাতেই ছিলেন, নিজের চোখে দেখলেন প্রায় পাঁচসের টিন করে ঘি ঢেলেছি এক এক হাঁড়িতে। তা সত্যি। বিভূতিবাবু উনুনে চাপানো বড় বড় রান্নার হাঁড়িতে ঘি তো ঢেলেছে।

তাই বলে বিস্মিত কণ্ঠে—তাই তো। ঘি তো দেওয়া হয়েছে মা।

—তাহলে এত বাজে হল কেন? অখাদ্য হয়ে গেল। ঠাক্‌মা লজ্জায় দুঃখে যেন কেঁদে ফেলবে। আমরাও অবাক হই। শুধু হোঁৎকা বলে—হালায় গ্যাড়াকল কোথাও হইছে নির্ঘাৎ।

নিমন্ত্রিতরাও ওই পিণ্ডির ড্যালা খেতেও পারে না ফেলতেও পারে না। কোনরকমে উঠে পড়লো। যা বলার তা আড়ালেই বলবে সেটাও বোঝা গেল ওদের হাবভাব দেখে।

ঠাক্‌মা বলে—এ কি সব্বোনাশ হয়ে গেল রে তোরা থাকতে! শশী গোমস্তা শোনায়—ছাগল দিয়ে যত মাড়াই হয় না গিন্নীমা, আপনি ভার দিলেন ওই চ্যাংড়াগুলোর হাতে। এখন কি কাণ্ড হল বলুন তো।

ঠাক্‌মা বলে পটলার বাবাকে—ওরে কিশোরী—আজ ওদের খাওয়া হল না, কাল দয়া করে

বইঘর.কম

আসতে বল, কাল দুপুরে প্রসাদ পাবেন ওরা। শশী, তুমি কাল ব্যবস্থা করবে।

পটলার ছোটকাকা বলেন—না, মা। উনি যেমন আছেন থাকুন। আমিই দেখবো কি করে পোলাও পিণ্ডি হয়ে যায়।

ভাবনার কথা। এত উদ্যোগ আয়োজন পণ্ড হয়ে গেল। অতিথিরা ফল মিষ্টি দই ইত্যাদি দিয়ে আহার সেরে উঠলেন। কান্না ভিজে চোখে ঠাক্‌মা বলে—ওরে হোঁৎকা, পটলা, ওই পিণ্ডির ড্যালা কাঙালীদের দিয়ে দে!

তারাও যে খুব হাসিমুখে ওই বস্তু নিচ্ছে তা মনে হল না। কয়েক হাঁড়ি ওই জমাট পোলাও নামক বস্তু কুকুর-গরুর পেটেই গেল আর কিছু ফেলা গেল। আমাদেরও মাথা হেঁট হয়ে গেল। আমরা যে কোনো কাজের নই কেবল হৈ চৈ করতে পারি সেইটাই সর্বসময়ে প্রমাণিত হয়ে গেল। পটলার বাবা বলেন, এবার আমরাই দেখছি, পটলার বন্ধুদের বল পরিবেশন করে দেবে।

অর্থাৎ আমরা আজ আউট। ঠাক্‌মার কাছে কিছু জানানো যেত সামনের মরশুমে সে আশাও এখন আর নেই।

পটলাদের বাগানের পুকুর ঘাটে বসে আছি পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের সভ্যবৃন্দ। মুখ চুপসে গেছে। আমিই শুধাই—এ কাণ্ড হল কী করে?

পটলারও প্রেসটিজ পাংচার হয়ে গেছে। বলে সে—ত তরা কিছু করতে পারলি না শ-শশী গোমস্তাই জিতে গেল রে।

হোঁৎকা কি ভাবছে। ফটিক বলে—ঘি-টাই খারাপ ছিল। একদম বাজে।

গোবর্ধন মামার দোকান চালায়। মাল চেনে সে। গোবরা বলে—উঁহু। ঘিটা এক নম্বর খুরদা। খাঁটি মাল। ওই পোলাও-এ পড়েই নি।

পটলা বলে—ছ-ছোট কাকা দাঁড়িয়ে থেকে ঘ-ঘি দিতে দেখেছে।

পটলার মনেও বেশ উত্তেজনা। কারণ তার জিবটা এখন আলটাকরায় বারে বারে ঠেকে যাচ্ছে। হোঁৎকা বলে—হালায় কাল দেখুম।

শুধোই—কি দেখবি। কাল আবার কি রান্না হবে কে জানে। তাই বলছি কাল রান্নার তদারকিতে গিয়ে কাজ নাই, পরিবেশন করে দেব।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—হালায় এতবড় সব্বোনাশটা যে করতিছে তারে ছাইড়া দিম হোঁৎকারে চিনস না।

ঠাক্‌মা আজও অতিথি ভোজনের ব্যাপার রেখেছে, যেভাবে হোক কালকের মত ঘটনা যেন না ঘটে।

ছোটকাকাবাবু সকাল থেকেই সজাগ।

শশী গোমস্তা রাঁধুনি ঠাকুরদের সর্দারকে গলা তুলে শাসায়—আজ রান্না এতটুকু বেতাল হলে তোমাদের একদিন কি আমারই একদিন। হুঁকো-তামাক সবই দিয়েছি, ডবল রেট দিচ্ছি—এসব কেন হবে।

ঠাকুররাও বলে—ঘি-টা বোধহয় খারাপই ছিল গোমস্তা মশায়। নাহলে ছোটবাবু স্বচক্ষে দেখলেন এত এত ঘি দিলাম, কোনো খুশবু হল না।

পটলার বাবা বলেন—এক নম্বর খুরদা। দ্যাখো—ঘি ঠিকই আছে।

বইঘর.কম

রান্না শুরু হয়েছে ওদিকে। বড় বড় উনুনে বিরাট হাঁড়ি চেপেছে, রকমারি মশলা কোটা হচ্ছে, আনাজপত্র ধুয়ে কড়াই-এ চাপানো হচ্ছে। আগে এসব হয়ে গেলে ওদিকের তিনটে উনুনে পুষ্পান্নের জন্য হাঁড়ি চাপবে। তার আগে এসব কাজ চুকিয়ে ফেলতে চায় ওরা।

আমাদের এখন কোনো কাজ নেই। বাগানে বসে আছি। পটলারও মনে সুখ নেই। ওদিকে রান্নার চালায় কাজকম্ম চলেছে।

শশী গোমস্তা এদিক ওদিকে তদারক্ করছে—একবার আমাদের দিকে চেয়ে ওর ঝাঁটা গোঁফে হাসির ঝিলিক তুলে বলে—এখানে কী হচ্ছে বাবুরা?

জবাব দিই না। পটল বলে—ওরই যত রাগ আমাদের উপর।

হোঁৎকা আজ ব্যস্ত। রান্নার চালায় কোমরে গামছা বেঁধে বসে পড়েছে হামানদিস্তা নিয়ে মশলা পিষতে। ঘুড়িতে মাঞ্জা দেবার জন্য হামানদিস্তায় কাচ গুঁড়ো করা তার অভ্যাস, এখানে তাই রান্নার কাজের সহকারীকে বিশ্রাম করতে দিয়ে নিজেই লেগেছে ওখানে। খালি গায়, গামছা বেঁধে একেবারে হালুইকরদের দলে ভিড়ে গেছে।

বেলা হয়ে গেছে। রান্নার সব আইটেমগুলো নেমেছে। শশী গোমস্তা বলে—সব দেখে নিন ছোটবাবু।

ছোটকাকা বলে—না ঠিক আছে। শশী বলে—কাল ওই ছেলেগুলোকে রান্নার তদারকিতে দিয়েই এসব হয়েছে।

তারপর শশী গলা নামিয়ে বলে। কাল ঘিয়ের একটা টিনই সরে গেছল ছোটবাবু। অর্থাৎ আমাদের দলই যে ঘিয়ের টিন সরিয়েছে সেটা প্রমাণ করতে চায়।

পটলার ছোটকাকা আমাদের চেনেন। তিনি বলে—না, না। ওরা তেমন নয়। দুষ্টুমি করে তাই বলে চুরি—না-না।

কর্মরত হোঁৎকা মাথায় গামছা বেঁধে হামানদিস্তা ঠুকছে আর শুনছে ওর কথাগুলো। ইচ্ছে করে শশীর মাথায় হামানদিস্তার ডাণ্ডাটাই ঠুকে দেবে, আপাতত সেটা করে না।

পুষ্পান্ন রান্না হবে। বড় বড় তিনটে হাঁড়ি চেপেছে। গোবিন্দভোগ চাল-এর খোশবু ওঠে—কিসমিস, কাজু, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, সাজিরে জায়ফল জৈত্রী রকমারি মশলাও দেওয়া হয়েছে।

শশী বলে—ছোটবাবু, দেখুন ঘি দেওয়া হচ্ছে কিনা, পরে দোষ দেবেন না। আমার তো বদনামের কপাল! কাল কারা কি করল—দোষী হলাম আমি। দাও ঠাকুর—ঘি ঢালো। সব হাঁড়িতে প্রথমে দাও চার কেজি করে—পরে আবার দেবে।

দাঁড়ান ছোটকাকা, এদিকে আসেন। ঠাকুরমশায় সইরা যান। শশী চমকে ওঠে। ছোটকাকাও এবার হোঁৎকাকে মাথার গামছা খোলা অবস্থায় খালি গায়ে দেখে অবাক হন। —তুমি! এখানে!

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—হালাগোর খেল দেখত্যাছি। আসেন দেখেন, ঘি যে এত ঢালছে কনে গেল।

ছোটকাকা—পটলার বাবা খোদ বড়বাবু—ঠাক্‌মাও এসে পড়ে। দেখা যায় ওই প্রতিটি বড় হাঁড়ির মধ্যে একটা করে ছোট হাঁড়ি রয়েছে পোলাও এর চাল মশলার উপর, আর হড় হড় করে যে ঘি ঢালা হয়েছে তা পোলাও এর চালমশলায় পড়েনি, সব পড়েছে ওই হাঁড়িতে, হাঁড়িটা তুলে পটলা বলে—

Boighar & MAH

দেখেন—হলোগোর ঘি চুরি করার কৌশল। বিবাক ঘি সইরা যায়, আর তাই কাল পোলাও হইছিল পিণ্ডির ড্যালা—কি গোমস্তা মশাই, কাল গোপালের দোকানে বিশ কেজি ঘৃত বেচেন নি? কন্—পোলাও-এর চারটে হাঁড়ি থেকেই ওইরকম ঘি ভর্তি মিনি হাঁড়িগুলো বের হল। শশী তখন আমতা আমতা করে—না, মানে ওই রান্নার ঠাকুরদেরই কাজ।

ঠাকুরদের সর্দার বলে—আপনিই তো বললেন—ঘি পরে দেওয়া হবে। তারপর—

ঠাক্‌মা এবার ব্যাপারটা দেখে গর্জে ওঠে। তোমার এই কাণ্ড শশী!

শশী তো ঠাক্‌মার চরণে তখন বডি থ্রো করেছে।

সেদিন অতিথিরা পরিতৃপ্ত করে খেয়ে ওঠে। ঠাক্‌মা বলে—ওরে পটলা, তোর বন্ধুদের জন্যেই মুখরক্ষা হল, নাহলে শশী আজও এই কেলেঙ্কারি করত।

হোঁৎকা বলে—ঠাক্‌মা, এবার ফুটবল টিমের জন্য কিছু টাকা লাগবো, ফান্ড তো নীল! শূন্য হই আছে।

ঠাক্‌মা বলে—পরে আসবি। এখন খা ভালো করে। ওরে এখানে কমলাভোগ দে—আর সন্দেশ।

খাওয়াটাও জোর হয়েছিল, তবে হোঁৎকার দুঃখ নিরামিষ্যি।

পটলা বলে—চ-চপ—ক-কাটলেট চাইনিজ একদিন হবে পরে!

কুষ্মাণ্ড মাহাত্ম্য

ম্যাপের বাইরে কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে দামোদরের বালিয়াড়ি পার হয়ে শালিখপোঁতা। আমরা যেতে চাইনি সেখানে। পটলা তো সাফ বলে দেয়, নট গোয়িং। ইদানীং পটলা সাধ্যমত ইংরাজিতেই বাতচিত করে। কারণ বাংলা ভাষাটা তার জিভে এমন জড়িয়ে যায় মাঝে মাঝে যে লোকে হাসে। আড়ালে বলে তোতলা। তাই এখন সে বঙ্গভাষা প্রসার আন্দোলনেও ইংরাজির প্রচলনই রাখতে চায়।

পটলা বেঁকে বসতে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের বাকি সভ্য অর্থাৎ আমি আর হোঁৎকা যেতে চাই না। হোঁৎকা বলে, নিখিল বঙ্গ কুমড়ো ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক উৎসব ওই শালিখপোঁতায়, আমরা কি করুম সেখানে?

আমারও যাবার তেমন আগ্রহ ছিল না। আমরা কেউ কুমড়ো ব্যবসায়ী নই, উপরন্তু কুমড়োর ঘ্যাঁট দেখলেই আম্মার আতঙ্ক জাগে। কী করব? গোবর্ধনের মামা ওই কুমড়ো সমিতির প্রেসিডেন্ট, এখানের বিরাট কুমড়ো মার্চেন্ট। গোবর্ধন আবার আমাদের ক্লাবের মেম্বার। ওই সমিতির বার্ষিক সভায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। গোবর্ধন তার উদ্যোক্তা। ক্লাবের আরেক সভ্য আর গায়ক ফটিককে সে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। সঙ্গে হোঁৎকা যদি তার দেশজ ভাষায় কমিক স্কেচ করে—ওকেই জীবিত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বলে চালিয়ে দেবে শালিখপোঁতায়।

ফটিক এমন কুমড়ো সমিতির অনুষ্ঠান মিস করতে চায় না। তাই সে বলে, এখান থেকে গাড়িতে করে যাবি। একটা রাত থেকে পরদিন ফেরা যাবে। বেশ হৈচৈ হবে, চল না। গোবর্ধন তার সঙ্গে যোগ করে, একদম ভিলেজ, মানে পাড়াগাঁ। সিনসিনারি খুব ভালো রে। আর হোঁৎকা, সমিতির সেক্রেটারির বাড়িতে যা জোর খ্যাঁটটা হবে না! পুকুরের মাছ, তাজা মুর্গি। আমাকেও বলে, ওখানে বৌদ্ধ আমলের কোন রাজার গড় আছে। সেই রাজার গড়ে এখনও অনেক কিছু দেখার আছে। প্রাচীন অনেক কিছু—

টোপ গেলা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর থাকে না। শেষ অবধি পটলাকে বলি, চল, এত করে বলছে যখন ঘুরেই আসি। আমরা রাজি হতে ফটিক বলে, তোরা যাচ্ছিস তাই ভরসা করে যাচ্ছি রে।

অবশ্য ফটিকের ফাংশনে ভয় আমাদেরই। আগেও দু'একবার তো দেখেছি, ক্লাবের ফাংশনে ওর গান শুনে খুশি হয়ে লোকে টম্যাটো-পচা ডিম উপহার দিয়েছে, কেউ আবার খুশিতে ঢিল-পাটকেলও ছুড়েছে, সে সব সামলাতে হয়েছে আমাদেরই। কুমড়ো সমিতির ফাংশনে যদি তেমনি কেউ কুমড়ো ছোড়ে তাহলেই গেছি। তবু যেতে রাজি হয়ে যাই।

তারকেশ্বর অবধি চেনা পথ। তবে পথের যা অবস্থা তাতে পথ না চষা মাঠ তা বোঝার

উপায় নাই। একটা ছোট ভ্যানে যাচ্ছি আমরা। ফটিক ইদানীং গানের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে নাচের তালিমও দিচ্ছিল পাড়ার ছোটদের। পাড়ার সেই কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়েও চলেছে। তারা ফটিকের পরিচালনায় নৃত্যনাট্য করবে। হোঁৎকা বলে, এক রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর। ফটকে নিজে কি শেখছে তাই জিগা, ও আবার নৃত্যনাট্য করবো। দর্শকগো আমাগোরই ফিনিস্ না কইরা দেয়।

সত্যি ভাবনার কথা। ওই বাচ্চাদের নিয়ে বিপদে না পড়ি।

তারকেশ্বর অবধি তবু ভাঙা ফুটো রাস্তা দিয়ে গেলাম। গাড়িই সারা পথ নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করে গেল। কখনও কত্থক, কখনও কথাকলি, কখনও বা তাণ্ডব নৃত্য। মুড়ির টিনে মুড়ি পুরে জোরে ঝাঁকালে মুড়িগুলোর যা অবস্থা হয়, আমাদের অবস্থাও তেমনি। কলকাতা থেকে সকালে যা খেয়ে বের হয়েছিলাম, বাবা তারকনাথের কাছাকাছি আসার আগেই সব শেষ।

হোঁৎকা বলে, ক্ষুধা পাইছে। গাড়ি থামা।

গোবর্ধন এমনিতে হিসাবী। কমিটি তার কাছে জলখাবারের খরচা কিছু দেয়নি, গাড়ি দিয়েছে মাত্র। তাই গোবরা বলে, আর বেশি দূর না। দামোদর পার হয়ে এইটুন পথ।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে, রাখ তোর দামোদর। গাড়ি থামা। ফটকে, ফিইরা চল ট্রেনে। লিভার ফাংশান ঠিক না হইলে, ফাংশন হইব না। ক্ষুধা পাইছে।

সমূহ বিপদ। অগত্যা পথের ধারে একটা দোকানে গাড়ি থামিয়ে সেখানে আর কিছু না পেয়ে মুড়ি, আলুর চপ আর দু'দিনের বাসি রসগোল্লার স্টকই শেষ করা গেল। দোকানদারও এমন রসালো পার্টি পেয়ে কাঁচালঙ্কা, পিঁয়াজ, শেষপাতে তিনদিনের বাসি রসগোল্লার রসটা ফ্রি দিয়ে দিল। মুড়ির সঙ্গে তাই খেয়ে আবার যাত্রা শুরু হল।

এ পথে গাড়ি বোধহয় এই প্রথম চলেছে। যা যায় তা কুমড়ো আর আলু বোঝাই ট্রাক, তারও দু'একটাকে দেখলাম মাটির সড়ক থেকে ছিটকে তার চাক্কা উপর হয়ে পড়ে আছে, আর মাঠময় স্রেফ হরেক সাইজের কুমড়ো গড়াগড়ি খাচ্ছে। দেখে মনে হল কুমড়োই যেন এখানের জাতীয় ফসল। মাঠে মাঠে ছড়িয়ে আছে কুমড়ো। মড়ার মাথার সাইজ থেকে শবযাত্রায় যে খোল বাজিয়ে কেত্তন গাওয়া হয়, তেমনি খোলের সাইজের কুমড়োও আছে। কোনোটা বেশ কালচে সবুজ, কোনোটা ঘন সবুজ, কেউ আধা হলদে, কেউ পুরো।

শুধু মাঠের মাটিতে নয়, গ্রামের প্রতি ঘরের চালেও দেখি চালকুমড়ো। সেগুলোও যেন পাউডার মেখে সেজেগুজে রোদ পোয়াচ্ছে। গোবর্ধন বলে, এবার কুমড়োর ফলন বেশ ভালোই রে। ওদিকে ফটিক কি বলতে যাচ্ছিল, গাড়িটা আচমকা চল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে গোঁৎ খেয়ে আবার ঝটকা মেরে সিধে হতে ফটিকও ছিটকে পড়ে—ওফ, বাপরে। হোঁৎকা কোনোরকমে সামলেছে। ড্রাইভারকে বলে, এভাবে গাড়ি নে যাবা? যা রাস্তা!

এবার দেখি রাস্তার হাল। দু'দিকেই ডোবা পুকুর। সব পানায় ঢাকা। কত গভীর কে জানে। পড়লে কচুরিপানার জঙ্গলেই হারিয়ে যাব। গোবর্ধনের সঙ্গে ছিল কুমড়ো কমিটির এক মেম্বার। শীর্ণ লগার মত পটকা মার্কা চেহারা। সে বলে, হ্যাঁ, গাড়ি যাবে। কুমড়োর গাড়ি যায় মাল নে আসতে।

ড্রাইভার বলে, এ তো মানুষের গাড়ি। ডোবায় নামলে বিপদ হবে। আর কতটা পথ?

বইঘর.কম

লোকটা আঙুল দেখায়, ওই যে হোথায় নদীর বাঁধ দেখছনি?

কোনোমতে রামনাম জপ করতে করতে নদীর বাঁধের নীচে এসে পৌঁছলাম। কয়েকটা দোকান, বসতি রয়েছে। আর খড়ের চালায় স্রেফ কুমড়ো। ওদিকে একটা কোল্ড স্টোরেজও রয়েছে।

এখানে গাড়ি রেখে এবার নদী পার হয়ে ওদিকে আরও দু'মাইল গেলে তবে শালিখপোঁতা। গোবর্ধন বলে, এই তো নদী পার হয়ে বাঁধ ধরে গেলেই ব্যস।

দু'মাইল মানে এক ক্রোশ।

আমি বলি, একা নদী ষোল ক্রোশ। এখনও সতের ক্রোশ পথ যেতে হবে।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে, ফটিক, তরে মার্ডার করুম। এহানে কে তর গান শুনবো, কেউবা তগোর নেত্য দেখবো? ফিইরা চল।

ফেরার তেলের পয়সা কুমড়ো পার্টির অফিসে, তাই যেমন করেই হোক টেনে হিঁচড়ে শালিখপোঁতা যেতেই হবে। তাই নদীর হাঁটুভোর বালি ভেঙে চলেছি হাঁপাতে হাঁপাতে। জল এইটুন, বাকি সব ধুধু বালি।

ভুজঙ্গ দারোগা শালিখপোঁতায় এসে বেশ আরামেই ছিল। গ্রামটার চারিদিকে শুধু ধ্বংসস্তূপ। সরু চিলতে ইঁটের স্তূপ, তাতে বনজঙ্গল গজিয়েছে। এককালে ছিল কোন সামন্ত রাজার রাজধানী, প্রাসাদ। সব এখন ওই বনজঙ্গলে ভরা। দু'একটা মন্দির রয়েছে। কোনটায় দেবতা কোনোমতে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছেন কিঞ্চিৎ আলোচাল সেবা করে। কোনটা পতিত, সাপখোপের ডিপে। ভুজঙ্গ দারোগা এখানে এসে খাঁটি দুধ, ডিম, মাছ, মাংস সেবন করে আর ঝিমোয়। হঠাৎ তার টনক নড়েছে।

কুমড়ো সমিতির বার্ষিক উৎসব হচ্ছে এখানে, আর উদ্বোধন করতে আসছেন কোন মন্ত্রী। তাই ক'দিন ধরে ধ্বজামার্কা ক'জন সেপাইকে থানার মাঠে দাঁড় করিয়ে লেফট রাইট করাচ্ছে। দুটো রাইফেলকে সাফসুতরো করে ওদের দিয়েছে। কিন্তু ওরা বহুদিন পর রাইফেল নিয়ে চলতে হিমশিম খাচ্ছে। দারোগাবাবু তারকেশ্বর বাজার থেকে ব্রাশো আনিয়ে জং ধরা পিতলের বেল্ট-বোতাম এসব সাফ করাচ্ছে।

কুমড়ো সমিতির মেম্বাররা আসবে, নাচগান হবে, সারা এলাকার যেন ঘুম ভেঙেছে। তারা এখন থেকেই সামিয়ানা টাঙানো, স্টেজ বাঁধা দেখতে ভিড় করেছে। স্কুলবাড়ির ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে কুমড়ো পার্টির অতিথিদের। সেখানে রান্নার আয়োজন হচ্ছে।

দারোগাবাবুও ব্যস্ত। এমনি দিনেই ঘটনাটা ঘটে যায়। কুমড়ো সমিতির সেক্রেটারিই এখানকার জমিদার। ওদের মন্দিরে ছিল প্রায় হাজার বছরের পুরনো এক বিষ্ণুমূর্তি। অষ্টধাতুর তৈরি সেই প্রাচীন মূর্তিকে এদের পূর্বপুরুষ কোন পুকুর খুঁড়তে গিয়ে উদ্ধার করেছিল। সেই মূর্তির দাম নাকি পঞ্চাশ লাখ টাকা। তবু এরা সেটা হাতছাড়া করেনি। সেই মূর্তিই হঠাৎ দু'দিন আগে চুরি হয়ে গেছে। আর তাই নিয়ে এরই মধ্যে খবরের কাগজে উঠেছে এখানের খবর। খোদ এস-পি সাহেব আসছেন তদন্তে। কারণ ওই মন্ত্রীর মামার বাড়িতেই চুরি হয়েছে এই মহামূল্যবান মূর্তি।

ভুজঙ্গ দারোগার কাছে কড়া ভাষায় মেসেজ এসেছে। চোরদের ধরতেই হবে। তাই ভুজঙ্গ দারোগা চারিদিকে কড়া পাহারা রেখেছে, যেন মূর্তি নিয়ে কেউ চলে যেতে না পারে। বাঁধের ওপরেও রয়েছে পাহারা। আমাদের দলকে দেখে কে হুঙ্কার ছাড়ে, হল্ট!

আমরা থামলাম। ওদিক থেকে বিড়ালের ল্যাজমার্কা গোঁফওয়ালা দারোগা এসে আমাদের দেখে শুধোয়, কোথা থেকে আ-আ-আসা হচ্ছে? এখানে কি ব্যা-ব্যা-ব্যাপার? গোবর্ধনের সেই লম্বুমার্কা মেম্বারই সব কথা জানাতে দারোগা আমাদের নিরীক্ষণ করে বলে, খুব সা-সাবধান। কোনো বে-বে-বেচাল দেখলে অ্যা-অ্যারেস্ট করব।

পটলা শুধোয়, হোয়াট ইজ ইট? কি-কি—

চোপ! গর্জে ওঠে দারোগা—আমাকে ভ-ভ-ভ্যাংচানো হচ্ছে? ফ-ফাজিল ছোকরা?

অনেক লোককেই তোতলা হতে দেখেছি, কিন্তু কখনও তোতলা দারোগা দেখিনি। বলি—ও আপনার মতই স্যার। জিবটার ব্রেক ফেল করে ওরও। সরি!

আমরা এবার ছাড়া পেয়ে গ্রামে ঢুকলাম। ওদিকে কলাগাছ, ঘট, তার উপর ডাব নয়, ডাবের সাইজের কুমড়ো। হোঁৎকা বলে, পুলিশ এত ক্যান রে?

খবরটা আমরাও জানতে পারি। এখানে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দামের প্রাচীন মূর্তি চুরি হয়ে গেছে।

ভুজঙ্গ দারোগা বসে নেই। বড়সাহেব এখানে জমিদারের মন্ত্রী ভাগ্নেকে তার এলেম দেখাবার জন্য এর মধ্যে আশপাশের গ্রামের ডজন খানেক ছিঁচকে চোরদের ধরে এনে ফটকে পুরে গর্জাচ্ছে, তু-তুই জানিস। বল কোথায় সেই মূ-মূর্তি!

গবা হাঁড়ি দাগি চোর। তার গায়ে রেড়ির তেল এখনও শুকোয়নি। সে বলে, আমরা গেরস্থের ঘটি-বাটি নিই হুজুর। ওসব ঠাকুর-দ্যাবতা নে কি করবো?

নন্দ বারুই নিজে, নিজেরাই খেতে পাই না, ঠাকুর-দ্যাবতার সেবা জুটুবো কোত্থেকে? ওসব ফ্যাসাদে কেনে যাবো বলেন?

ওদের কারোর কাজ যে নয়, তা বোঝে দারোগা সাহেব। কিন্তু সে এবার বিপদেই পড়েছে। হন্যে হয়ে সারা গাঁয়ের ডোবা, পুকুলে জাল ফেলছে। কই, চ্যাং, ল্যাঠা মাছই ওঠে। সেই মূর্তি আর ওঠে না।

গ্রামটা ঘুরতে বের হই আমরা পঞ্চপাণ্ডব। গ্রাম নয়, যেন কুমড়োর কারখানা। সারা এলাকার কুমড়ো, চালকুমড়ো আসে এখানে। বহু জায়গায় দেখি আখের শালের মত বড় বড় কড়াই-এ কুমড়ো সেদ্ধ হবার পর হাত পা দিয়ে সেইগুলো চটকানো হচ্ছে, তারপর আবার দলাই-মালাই করে সেগুলো ক্বাথের মত করে টিনবন্দী করা হচ্ছে। কুমড়োর এহেন অবস্থা দেখিনি। গোবর্ধন বলে, ওর থেকে টম্যাটো সস তৈরি হবে।

কুমড়োর টম্যাটো সস?

গোবর্ধন বলে, ওতে রং মিশিয়ে টম্যাটো সস করা হবে। টম্যাটোর কত দাম জানিস?

কুমড়োর মহিমা অপার। অন্যত্র দেখি স্রেফ চালকুমড়োর পাহাড়। সেগুলোও কেটে পিস পিস করে সেদ্ধ করা হচ্ছে। ওর থেকে চালকুমড়োর মিঠাই হবে।

বইঘর.কম

কুমড়ো সমিতির মিটিং-এ তখন মন্ত্রী মশায় তারস্বরে কুমড়োর মহিমা কীর্তন করে চলেছেন। আয়রন-প্রোটিন কতরকম ভিটামিন-ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে ওই কুমড়োর মধ্যে তারই বর্ণনা করে দেশবাসীকে কুমড়ো উৎপাদনের জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োজিত করতে বলেন!

কুমড়োর মাহাত্ম্য বক্তৃতার পর্ব মিটল। এরপর ফটিকদের অনুষ্ঠান শুরু হল। আমরা রেডি হয়ে আছি, কখন কি হয় অবস্থা। এই বোধহয় টম্যাটো, পচা ডিম পড়ল! এটা কুমড়োর দেশ। আস্ত কুমড়ো শূন্যপথে ধেয়ে এলেও আসতে পারে। কারণ ফটিকের ফাংশন শান্তিতে শেষ হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এখানে সেটা শেষ হল। দর্শকরাও এবার হ্যারিকেনের পলতে উসকে আলো নিয়ে দল বেঁধে যে যার ঘরের দিকে গেল। ফটিক বলে, ক্যামন ফাংশন হল বল। একেবারে পিনড্রপ সায়লেন্স।

পটলা বলে, ওরা সব ঘুমিয়ে প-পড়েছিল।

শান্তিতে অনুষ্ঠান শেষ হল। প্রেসিডেন্ট গোবর্ধনের মামা, ওই কুমড়ো পার্টির সেক্রেটারিও খুব খুশি। তারপর দিন দুপুরে ভুরিভোজনের পর এবার ফেরার পালা। পুকুরের মাছই কতরকম। ইয়া ট্যাংরা, রুই, সরেস গলদা চিংড়ি, তার ওপর পায়েস, রসগোল্লা—আয়োজন প্রচুর। ফিরছি। তার আগেই গরুর গাড়িতে করে এরা সামান্য উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে নদীর এপারে। ওখানেই গাড়ি থাকবে।

হেঁটে নদী পার হয়ে এসে দেখি গরুর গাড়িতে ছোটবড় খোলের মত সাইজের আট-দশটা কুমড়ো। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের চেহারাটা মুষকো। ইয়া গোঁফ, চোখ দুটো লাল করমচার মত। ওদিকে আজ কমিটি আমাদের জন্য তারকেশ্বর থেকে অন্য একটা গাড়ি ভাড়া করে এনেছে। সেই ভ্যানের ড্রাইভার আর গাড়োয়ান দু'জনে কি কথা বলছে আর আমাদের দিকে চেয়ে দেখছে।

শীতের বেলা, তাড়াতাড়ি দিন শেষ হয়। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যার আবেশ নামে নদীর বুকে। তাড়া দিই ড্রাইভারকে, চলো। কলকাতা ফিরতে রাত হবে।

ড্রাইভার যেন কানেই শোনে না। সে বনেট খুলে কি নাড়াচাড়া করছে। ওদিকে সন্ধ্যা নামছে বালুচরে। ড্রাইভার এবার গাড়ি ছাড়ল। ভ্যানের মেঝেতে বেশ কয়েকটা কুমড়ো, গাদাগাদি করে আমরা। তবু একখানা করে কুমড়ো রোজগার কবে চলেছি।

গাড়ি চলছে সেই খানা ডোবা বাঁশবনের বুক চিরে। গাড়ির সামনে ড্রাইভার, ক্লিনার আর গাড়ির সঙ্গে আসা লোকটাও রয়েছে। ও নাকি শেওড়াফুলির আড়তে থাকে, সেখানেই নেমে যাবে।

সন্ধ্যা নেমেছে। রাস্তাটা নির্জন। হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লোক অন্ধকার বাঁশবন ভেদ করে এসে গাড়িটাকে ঘিরে দমাদ্দম লাঠি মারতে থাকে। সামনে ফাঁকা রাস্তা। চিৎকার করি—ডাকাত ডাকাত! পটলা বলে, গ-গাড়ি ছোটাও। কুইক। কিন্তু গাড়ি তবু স্টার্ট নেয় না। আমাদের চিৎকারে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে কিছু লোকজন হৈহৈ করে ছুটে আসে। ওদের দেখেই বোধহয় সেই ডাকাতের দল বনের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

আমরাও অবাক হই। ডাকাতরা কিইবা নিত! তবু ডাকাত—ডাকাতই। তারা চলে যেতে

বইঘর.কম
গ্রামের মানুষজন মিলে ঠেলতে ইঞ্জিনটা চালু হয়। পটলা বলে, সো-সোজা ক্যালকাটা।

তারকেশ্বর ছাড়িয়ে গাড়ি চলেছে। রাত্রির অন্ধকারে গাড়িটা ছুটছে। ঝিমুনি আসে। হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়ে গাড়িটা আবার থেমে যায় মাঠের মধ্যে। এবার একটা গাড়ি এসে সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখা যায় গাড়ি থেকে চার-পাঁচজন নেমে আমাদের গাড়িতে এসে ওঠে। ওরা কি যেন খুঁজছে। একজন তো ফটিকের তানপুরাটাই আছড়ে ভেঙে ফেলে। ফটিক আর্তনাদ করে ওঠে। লোকটা ধমকায়, চোপ। চেল্লালে খতম করে দেবো। ওর হাতে ভোজালি। অন্য আরেকজন গাড়ির মধ্যে থেকে লাথি মেরে কুমড়োগুলোকে ফেলে দিতে চায়। একজন আমাদের ব্যাগগুলো হাঁটকাচ্ছে।

এমন সময় দূরে হাইওয়েতে পুলিশের জিপের লাল আলো আর হুটারের শব্দ শুনতেই ওরা নেমে পড়ে। রাস্তায় ছিটকে পড়া দুটো ফুলসাইজ কুমড়ো তুলে নিয়ে গাড়িতে উঠে পালায়।

পুলিশের গাড়িটা আসতে দেখে আমাদের গাড়ির ড্রাইভার এবার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ফুলস্পিডে দৌড়তে থাকে। আমরা চিৎকার করি—গাড়ি থামাও, পুলিশকে জানাতে হবে ডাকাতির কথা। কিন্তু কে শোনে আমাদের কথা? সোজা বের হয়ে এসে শেওড়াফুলিতে ঢুকল। এখানে সঙ্গে আসা লোকটাকে নামিয়ে দিয়ে আবার চলেছি আমরা।

গাড়িতে দু'দুবার ডাকাত পড়েছে। শেষবারের দলটা ছিল অনেক হিংস্র। হোঁৎকাকে মেরেছে। পটলার নাকে একটা ঘুঁষি ঝেড়েছে। ফটিকের তানপুরার শোক তখনও যায়নি। একটা ঘুষির চোটে চোখের উপর আব গজিয়ে গেছে। গালে চড়ের দাগ। তবু বলে, এমন সুন্দর তানপুরাটা গেল রে! হুগলির লাউ।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে, চুপ মাইরা থাক। লাউ-কুমড়োর নাম করবি না। কুমড়োর পার্টির জন্যই মার খাইছি।

ওদিকে ড্রাইভার তখন একটা ধাবায় দাঁড়িয়েছে। তাকে বলি, আর দেরি কেন ড্রাইভার সাব? কলকাতায় ছেড়ে দিয়েই খেতে। ড্রাইভার কোনো কথাই বলে না। গিয়ে খাটিয়াতে বসল। ক্লিনার বলে, ইঞ্জিনে পেট্রল দিতে হয়। ড্রাইভারে পেটেও খাবার লাগে বাবু। খেয়ে নিই। দেরি হবে না।

এরা যেন কলকাতা যেতেই চায় না। ধাবায় শুয়ে-বসে তারপর খাবার খেয়ে নেয় ওরা। আমাদের পেটে তখন খোলকর্তাল বাজছে। কিন্তু কমিটি পথের খরচের পয়সা দেয়নি। যেন স্রেফ হাওয়া খেয়েই যাবে। ফাংশনের পর শিল্পীদের কদর আর থাকে না।

গাড়ি ছাড়তে একঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। চারিদিক নিঝঝুম অন্ধকার। হঠাৎ পথের ওপর কারা গাছ ফেলে রেখেছে দেখে গাড়িটা থামাতেই আবার দু'দিক থেকে কয়েকজন লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে। তাদের মধ্যে দেখি সেই গাড়োয়ানও রয়েছে। ওরা আমাদের ব্যাগ, তবলার কেস, মায় কুমড়োগুলোও রাস্তায় ফেলছে। বারবারই আমরা ডাকাতের পাল্লাতেই পড়ছি। এবার আর বাধা দেবার চেষ্টাও করি না। কুমড়ো নিয়েই যদি খুশি হয় হোক।

এমন সময় অন্ধকার ফুঁড়ে একটা পুলিশ ভ্যান এসে হাজির হয়। আমরা চিৎকার করি—ডাকাত, ডাকাত। ফটিক, গোবর্ধন মরিয়া হয়ে দু'জনকে ধরে ফেলে। আমিও হাতের

কাছে একটা ইট কুড়িয়ে সেই গাড়োয়ানের ঘাড়ে জোরে একটা আঘাত করতে সে ছিটকে পড়ে।

ততক্ষণে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে গাড়িটাকে।

ওই কুমড়ো, ভাঙা তানপুরা ও অন্য মাল সমেত গাড়িটাকে থানায় আনা হল। দারোগাবাবু আমাদের মুখে সব শুনে বলেন, কুমড়োর জন্যই ডাকাতি! কোথা থেকে আসছ তোমরা?

শালিখপোঁতা থেকে। ওরাই ক'টা কুমড়ো দিয়েছিল। ওই লোকটাই গাড়িতে করে এনে তুলে দেয়। তারপর মাঝপথে ও নেমে যায়। আর ড্রাইভার ধাবাতে ঘণ্টা দেড়েক দেরি করে, যাতে ওই লোকটা দলবল এনে ডাকাতি করার সময় পায়।

দারোগাবাবু কি ভাবছেন। বলেন, শালিখপোঁতা থেকে আসছ? তারপরই কুমড়োগুলোকে নিরীক্ষণ করতে থাকেন। বিশাল সাইজের কুমড়ো। হঠাৎ একটা কুমড়োর গায়ে সরু দাগ দেখে সেটাকে ধরে টানতে কুমড়োর কিছুটা অংশ উঠে আসে। তার ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দারোগাবাবু সাবধানে একটা ইঞ্চি ছয়েক সাইজের অষ্টধাতুর মূর্তি বের করে টেবিলে রাখেন। গোবরা এর আগে শালিখপোঁতায় এসেছে, মন্দিরে ওই মূর্তি সে দেখেছে। ওই প্রাচীন মূল্যবান মূর্তিটাই চুরি হয়েছে আর সেটা বের হল এখানে ওই বিশাল কুমড়োর মধ্যে থেকে!

গোবর্ধন বলে, এই মূর্তিটাই চুরি হয়েছে ওখানে। পঞ্চাশ লাখ টাকা দাম।

দারোগাবাবু ওই রাতেই শালিখপোঁতা থানায় রেডিও মেসেজ দিতে ভোরেই ওখান থেকে দারোগাবাবু, সেই মন্দিরের মালিক কুমড়ো পার্টির সেক্রেটারিবাবু, গোবরার মামা, গ্রামের দু'একজন লোক এসে পড়ে। তারা মূর্তি শনাক্ত করে আর ভুজঙ্গ দারোগা সেই গাড়োয়ানকে সপাটে একটা চড় মেরে বলে, ব্যাটা তখন বললি কিছুই জানি নে। ছিঁচকে চুরি করি, ঠাকুর-দেবতাকে ছুঁই না। এখন!

একা ওই গাড়োয়ানই নয়, তদন্তে বের হয় গ্রামের দু'একজন এমনকী ওই ড্রাইভারও জড়িত। তারাই বারবার চেষ্টা করেছিল কুমড়োটা নিয়ে যেতে কিন্তু অন্য কুমড়োর সঙ্গে মিশে যাওয়ায় ঠিক মাল বাছতে পারেনি। তাই এবার সব কুমড়োগুলো নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই ধরা পড়ে যায়।

কুমড়ো পার্টির সেক্রেটারি, পুলিশ সাহেব, দারোগাবাবু সকলেই খুব খুশি। আমরা নাকি শালিখপোঁতা গ্রামকে চরম অকল্যাণের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। গোবরার মামা বলেছে, আমাদের ক্লাবের বালকভোজনে বরাবর ফ্রিতে কুমড়ো সাপ্লাই দেবে।

পটলার ভবিষ্যৎ

পটলাকে নিয়ে এবার আর এক প্রবলেম দেখা দিয়েছে। পটলচন্দ্র আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ। অবশ্য আমরাই একপ্রকার জোর করে তাকে ওই পদে রেখেছি। সেই পটলচন্দ্র মাঝেমধ্যে এক একটা 'প্রবলেম' এইসা তৈরি করে যে তাকে সামলাতে আমরা হিমশিম খেয়ে যাই।

ইদানীং পটলার মাথায় ঢুকেছে পল্লির শিশু অর্থাৎ কচিকাঁচাদের মনোমত করে তৈরি করতে হবে। মানে গড়ে তুলতে হবে এই ক্লাবের ছত্রছায়ায়। কারণ তারাই দেশের ভবিষ্যৎ। মতলবটা তার মাথায় ঢুকিয়েছে পাড়ার ভূপতিদা। ভূপতিদা সর্বজনীন দাদা। পাড়ার ছেলে-বুড়ো সকলেরই সে দাদা।

ভূপতিদার বড় রাস্তার ধারে একটা ছোটখাটো দোকান আছে। সামান্য কিছু বিস্কুট-লজেন্স থাকে বয়ামে। সেই সঙ্গে কিছু বিড়ি-পানও। ভূপতিদা বিকেলে ক্লাবে আসে। শীর্ণ পাঁকাটির মত লম্বা চেহারা। কোনোকালে নাকি মিলিটারিতে ছিল। অবশ্য ওই দীর্ঘ বাঁশের ডগার মত বাতাসে কাঁপা দেহ নিয়ে মিলিটারিতে কি যে করত তা কেউ জানে না।

হঠাৎ সেই ভূপতিদার ঘুম ভেঙেছে দেশের মঙ্গলচিন্তায় আর ঘুমভাঙা চোখে সামনে পটলাকে দেখে তার মাথাতেই কামানের বারুদঠাসা করে ঠেসেছে ওই শিশুমঙ্গলের জব্বর পরিকল্পনাখানা। পটলার মাথায় এখন আদর্শের বারুদ ঠাসা, পলতেতে আগুন দেবার কাজটুকুই যা বাকি।

সেদিন পটলচন্দ্র বললে, নতুন সেকশন খ-খুলবো। শিশুমঙ্গল শাখা। শি-শি-ভূপতিদাই জোগান দেবে।

গোবরা মামার আড়তে এতক্ষণ কুমড়ো আলু পেঁয়াজের পাইকেরি বেচাকেনা করে এসেছে ক্লাবে একটু ডন-বৈঠকি দিতে। হোঁৎকার হাতে যৎকিঞ্চিৎ ঝালমুড়ি মাত্র জুটেছে। ফটিকের তখন গজল সাধার তাণ্ডব চলছে আর আমি ঘাসের উপর ধরাশায়ী। ক্লাব-ফান্ডে জমার ঘর শূন্য, কাল ফুটবল খেলা আছে, তার খরচা চাই। ইদানীং প্লেয়ারদের কলা-টোস্ট, নিদেন ডিমের কারি চাই, নো আলুর দম উইথ কোয়ার্টার পাউরুটি। তার খরচার জন্য পটলাকে মোচড় মারতে হবে। এহেন সময় নতুন সেকশন খোলার কথায় বলি, ক্লাবই ডকে ওঠার জোগাড় আর তুই কিনা ওই কিল্লি-বিল্লিদের নিয়ে নতুন সেকশন খুলবি! কাল খেলার খরচা নেই—

হোঁৎকা বাকিতে কেনা কেবলরামের ঝালমুড়ির শেষ কণা অবধি খেয়ে এখন কাগজে লেগে থাকা বিটনুনটুকু চাটতে চাটতে বলে, ঝালমুড়িই জোটাতে পারিস না, দিমু রেজিকনেশন। সব গিয়া ওই পোলাপানগোর লই, এসবে আমি নাই। তারপরই দণ্ডায়মান ঝালমুড়িওলাকে দেখিয়ে বলে, কেবলরামের বাকি তিন টাকা দিই দে।

Boighar & MAH

হোঁৎকা আমাদের ব্রেন—ক্লাবের মাথা। ওর পকেটে সর্বদাই বিবর্ণ একটা কাগজে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের সেক্রেটারির পদ থেকে রেজিকনেশনের লেটার রেডিমেড থাকে। সেটা প্রায়ই তাস খেলুড়েদের তুরুপের তাসের মত বের করে হোঁৎকা। আজও করতে পটলা বলে, কেবলরামের বাকি তিন টাকা দি-দিচ্ছি। আর কে-কেবলরাম ঝা-ঝালমুড়ি বানাও সকলের জন্যে। আ-ট আনা করে, বাদাম জ্যাদা। ব-বোস হোঁৎকা।

ফ্রেশ ঝালমুড়ির কথায় হোঁৎকা বসল। এই সুযোগে পটলা তাকে ধরে ভবিষ্যৎ দেশ-সমাজ গড়ার পরিকল্পনার কথা শোনাতে থাকে। পটলার পথপ্রদর্শক ভূপতিদাও ইতিমধ্যে এসে জুটেছে।

সব শুনে-টুনে হোঁৎকা বলে, খুবই জটিল ব্যাপার, ঠান্ডা মাথায় ভাবার লাগবো। কুলপি মালাই দিতি ক ওই এতোয়ারিকে।

হোঁৎকা মালাই চুষতে চুষতে বলে, টাকা-পয়সা অনেক লাগবো। ধর পয়লা চোটে হাজার খানেক। পোলাপানেগোর জন্য বাদ্যি-বাজনা চাই, প্রচার চাই।

ভূপতিদা বলে, ওদের জন্য বিকেলে বিস্কুট-লজেন্স এসব চাই।

গোবরা বলে, আর ড্রিল-কুচকাওয়াজ?

ভূপতিদার বাইশ ইঞ্চি বুক তখন ফুলে চল্লিশে পরিণত হয়েছে। শীর্ণ মুখে হুলো বেড়ালের মত গোঁফ খাড়া করে বলে, ওসব আমি করাব। মিলিটারিতে কত জবরদস্ত শিখ, জাঠকে ড্রিল মার্চ করিয়েছি।

পটলা বলে, ত-তাহলে ব্য-ব্যবস্থা কর।

হোঁৎকা চেনে একটি বস্তু। আঙুলে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে সে শুধোয়, আর এটা! রসদ কই পামু? ট্যাকা?

খুশিতে পটলার জিবটা যথারীতি আলটাকরায় আটকে গেছে। তাই ইংরাজিতেই বলে, ন-নো প্রবলেম।

পটলার ইংরাজি বুলি গড়গড় করেই বের হয়। আর টাকার অভাব ওদের নেই। পটলার বাবা, তিন কাকা দু হাতে রোজগার করেন। কারখানা, করাতকল, পাটের গুদাম কি নেই! বংশের ওই একমাত্র শিবরাত্রির সলতে, ওর ঠাকুমারও কলকাতা শহরে খান দশেক পেল্লায় বাড়ি। সুতরাং পটলচন্দ্র আমাদের কামধেনু কাম ক্যাশিয়ার। তার পরিকল্পনা সাদরে গৃহীত হল।

আড়ালে বলি হোঁৎকাকে, খেলার টাকা—

হোঁৎকা বলে, ওই শিশুদের টাকা থেকে গ্যাঁড়াবো। শিল্ড এবার চাই-ই। না হলে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের নাম থাকবে না।

শাবাশ পটলা। এবার পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের নাম যেন তুবড়ির ফুলকির মত পাড়ায় ছড়িয়ে গিয়েছে। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার, বড় রাস্তার এমাথার বটগাছ থেকে ওদিকের লাইটপোস্টে লাল শালুর ব্যানার—'পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব জাতির সেবায় শিশুমঙ্গল বিভাগ খুলছে। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন তাঁদের শিশুদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এখানে পাঠান। প্রবেশমূল্য নেই।' আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে যেন ভোটযুদ্ধ শুরু হয়েছে।

বইঘর.কম

এতদিন পাড়ায় বাস করছি, দু-চারটে ছেলে, কচিকাঁচা নজরে পড়েছে। কিন্তু পাড়ায় যে এত কিল্লি-বিল্লি, রেজগি কিলবিল করে তা জানা ছিল না। এক তিন নম্বর বস্তি থেকেই এসেছে একশো বাইশ জন। এছাড়া এখান-ওখান, এ বাড়ি-সে বাড়িতে এত গেঁড়ি-গুগলি ছিল ভাবতেও পারিনি। সারা মাঠ ভরে গেছে তাদেরই ভিড়ে। চ্যাঁ-ভ্যাঁ কলরব ওঠে।

ভূপতিদা হাঁড়ির ভিতরে রাখা সেকালের খাকি জামা-প্যান্ট পরে বুকে বিবর্ণ ফিতেয় ঝোলানো ততোধিক বিবর্ণ ক'টা মেডেল লাগিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে, ট্যানশেন!

কে শোনে কার কথা! কোনো বাচ্চা ওই শীর্ণ মানুষটার ফাটা কাঁসির মত গলার বিকট আওয়াজে চিল চিৎকার শুরু করে ভয় পেয়ে।

ক্লাবের দরমার অফিস ঘরে তখন ঢোকার উপায় নেই। কিল্লি-বিল্লিদের ভিড়। গার্জেনরাও তাঁদের শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে এসেছেন। সারা জাতিকে এবার রণকৌশলে নিপুণ করে তোলার জন্য ভূপতিদা তখন শিড়িঙ্গে হাত-পা শূন্যে ছুড়ে গর্জন করছে, লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট রাইট—

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব যে জেগে আছে, একটা বিরাট কিছু করছে, সেই সাড়া পড়েছে সারা পাড়ায়। ওদিকের দু নম্বর কুলদা মিত্তির লেনের ভৈরববাবু বললেন, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ছ হে, ক্লাবের সার্থকতা এখানেই। এবার দেখো কর্পোরেশনের ভোটে দাঁড়িয়েছি, জিতিয়ে দিলে ক্লাবকে কোথায় তুলে দেব!

হোঁৎকা ওই লোকটাকে দেখতে পারে না। সেবার ওঁর ক্লাব আমাদের জোর করে হারিয়েছিল শিল্ড ফাইনালে, আর উনিই ছিলেন রেফারি। আড়ালে হোঁৎকা বলে, ক্লাব তুইলা না দেয়। ওরে জানস না!

কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের রমরমা বেড়ে চলেছে। পটলা এর মধ্যে বেশ কয়েকশো টাকা খরচা করে ব্যান্ড, সাইড ড্রাম, কেটল ড্রাম, আর ডজন তিনেক বাঁশি কিনে এনেছে। রোজ বিকেলে দিগবিদিক কাঁপিয়ে ঝপ্পর ঝপ্পর শব্দে ব্যান্ড বাজে। ফটকে এর মধ্যে খান দুয়েক গানও তুলিয়েছে বাঁশরীতে। পুঁ পুঁ শব্দে বাঁশরী বাজে—আর ভূপতিদা বকের মত লম্বা পা ফেলে শূন্যে হাত-পা ছুড়ে গর্জায়, ট্যানশেন! তারপর টিফিন পর্ব। টিনখানেক থিন এরারুট বিস্কুট আর প্লাস্টিকের দু-তিন বড় প্যাকেট লজেন্স নস্যি হয়ে যায়। এরপর মেদিনী কাঁপিয়ে জাতির ভবিষ্যৎ দল ঘরে ফেরে।

পাড়ায় লোকের মুখে মুখে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের সুখ্যাতি। দুনিয়ার ছেলেমেয়েদের ওদের গার্জেনরা এখানে রেখে যেন নিশ্চিন্ত হতে চান। সামলাবার সব ঝক্কি পঞ্চবীরের। কে কাঁদছে, কে ইয়ে করছে, কে লজেন্স খাবে। হোঁৎকা জবাব দেয়, আমি নাই! আমারে ছাড়ান দে!

গোবরাও জানায়, ছেলেবাগালি করতে পারব না। তার চে মামার আড়তে কুমড়োই বেচব।

হঠাৎ এমনি দিনে কাণ্ডটা বেধে যায়।

পটলা আর ভূপতিদার নেতৃত্বে শিশুমঙ্গলের ছেলেরা গেছে রাসতলার মেলায়। ড্রিল করে সার বেঁধে ভূপতিদা নিয়ে গেছে ওদের। সাংস্কৃতিক মেলা তাই জাতির ভবিষ্যৎদের দেখানো দরকার। ফটকেও গেছে। বাঁশরী বাজিয়ে ডান-বাঁ করতে করতে নৃত্যের তালে তালে গেছে ওই বাহিনী। তারপর মেলায় গিয়ে ছত্রভঙ্গ অবস্থা। কে কোথায় বাঁশি, বেলুন, চুড়ি আবার হজমি কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বইঘর.কম

শেষকালে ভূপতিদা ফুরুৎ ফুরুৎ করে বাঁশি বাজিয়ে আবার তাদের নিয়ে ফিরেছে—কিন্তু বেশ কয়েকটা ছেলেমেয়ে যে ভিড়ে পাঁপড়ভাজা খেতে ব্যস্ত তা দেখেনি। ফলে সন্ধ্যার পরই পাড়ায় হৈচৈ পড়ে যায়। এর বাড়ির ছেলে, দত্তবাড়ির দুই কিল্লি মেয়ে, দু নম্বর বাড়ির ভৈরবশঙ্করের নাতি-নাতনি, আরও অনেককে পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজ খোঁজ রব ওঠে চারিদিকে। ওদিকে রাত্রি নেমেছে। কোথায় গেল ভবিষ্যতের দল!

ভৈরবশঙ্কর এখন ভোটে দাঁড়িয়েছেন। তিনি তো শীতলা মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে হাত মুঠো করে চেঁচাতে থাকেন, এসব প্রতিপক্ষের কাজ। এরা গোপনে ছেলেমেয়েদের ধরে বিদেশে পাচার করছে, না হলে কেউ বিনা পয়সায় ক্লাবের মেম্বার না করে টিফিন দেয়! ভাইসব, এমন শয়তানদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে যোগ্য নাগরিকের কর্তব্য করবেন। আমিও সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেব পাশে থেকে।

খড়ের গাদায় আগুন পড়েছে। এখানকার পাবলিক সেই শুকনো খড়ের গাদা। ব্যস্ এবার ধু ধু করে জ্বলে উঠতে দেরি হয় না।

ভৈরববাবুর নজর ছিল আমাদের ক্লাবের উপর। ওঁর ক্লাবকে কোণঠাসা করে ফেলেছি। ভোটও যাবে না ওঁর দিকে। কারণ অভিভাবকবৃন্দ আর মাসিমা দিদির দল তখন আমাদের দিকে। কিন্তু ভৈরবশঙ্কর সেই হাওয়া এক দমকায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। ওই মারমুখী জনতা এবার জলস্রোতের মত এগিয়ে আসছে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের দিকে।

গোবরা এসে খবর দেয়, কেটে পড়। হোঁৎকাও কলরব শুনে বলে, পটলা, শোন বলতেসে বিদেশে পোলাপান পাচার করস। ফুইটা যা—

যাবার পথও বন্ধ। গোবরার সাইকেলের কেরিয়ারে চাপিয়ে পটলকে পাচার করে আমরাও সরে পড়লাম। তখন জনস্রোত জলস্রোতের মত এসে আছড়ে পড়েছে ক্লাবের দরমার ঘরের উপর।

পুলিশও তৎপর হয়ে উঠেছে। খুঁজছে আমাদের। রাতভোর তখন যেন পাড়ায় লঙ্কাকাণ্ড বেধে গেছে।

আমরা প্রাণভয়ে এসে সেঁদিয়েছি খালধারে। গোবরার মামার কুমড়ো-পিঁয়াজ-আলুর আড়তে। লাটবন্দি কুমড়ো। এদিক-ওদিকে নড়লেই দু-চারটে নধর তারকেশ্বরের কুমড়ো গড়িয়ে পড়ছে মাথায় পিঠে। সেই সঙ্গে ইঁদুরের লুকোচুরিও চলেছে। আর মশা! ইয়া চড়াই পাখির মত মশাগুলো ছেঁকে ধরেছে।

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ খেয়াল হয় কাদের চিৎকারে। গোবরার মামা সকালে লোকজন নিয়ে গুদাম খুলে মাল বের করতে এসে অন্ধকারে কজনকে দেখে চিৎকার করে, চোর চোর!

মামার বিহারী কুলিবৃন্দও আমাদের ইতিমধ্যে দু-চার ঘা দিয়েছে। গোবরা আর্তনাদ করে কুমড়োর টালের নীচে থেকে, মামা! আমরা গো—

তখন বেশ খানিকটা চোটচাট হয়ে গেছে। পটলার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, হোঁৎকার কপালে ইয়া আব উঠে গেছে। আমি তো চোখে সর্ষের ফুল দেখছি কুমড়োর টালে বসে।

যখন বের করা হল তখন দেখার মত মেকআপ আমাদের। মামা বলে, এখানে! রাতভোর ছিলি তোরা!

হোঁৎকা শুধোয়, ভৈরববাবু—

মামা বলে, ওসব মিটে গেছে। খেঁদি বুঁচি ন্যাবা ছেলো কেন্নো বিচ্ছু ওরা সবাই তো ফিরে এসেছে রাসমেলা থেকে। যা, বাড়ি যা সব।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

বাড়ির দিকে যাবার পথে ক্লাবের মাঠে দাঁড়িয়ে চমকে উঠি। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের চিহ্নমাত্র নেই, দরমার ঘর-দরজা-বেড়া সব নিশ্চিহ্ন। পড়ে আছে কিছু ভাঙা টালি আর দোমড়ানো সাইনবোর্ড—ধুলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

হোঁৎকার কপালের আবটা ততক্ষণে ফুলে বেগুনফুলি আমের সাইজে এসে গেছে। আমি এক কানে আচমকা ঘুঁষি খেয়ে শুনতেই পাচ্ছি না কোনো কথা। গোবরা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলেছে। ফটিক নিরুদ্দেশ। পটলার নাক ফুলে ঢোল।

গর্জায় হোঁৎকা, ভবিষ্যৎ ভাবার মজাখান টের পাইলি পটলা! এগোর ভবিষ্যৎও অন্ধকার রে! কিছু আর করন যাইব না।

পটলার বুক চিরে হাপরের বাতাস বের হবার মত একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়। আমাদের মনে হয় পটলার ঘাড় থেকে আর একটা ভূত নামল।

অবশ্য ভূপতিদা ক'মাসে ওই 'ভবিষ্যৎ'দের টিফিন বাবদ বিস্কুট-লজেন্স সাপ্লাই দিয়ে মোটা 'প্রফিট' করে এখন নাকি তীর্থভ্রমণে গেছে।

পটলার জলসা

মদনা যে এমন গদ্দারি করবে আমাদের সঙ্গে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। এই মদনা সেদিন কুলেপাড়া ক্লাব থেকে হঠাবাজার হয়ে চলে এল। কুলেপাড়া ক্লাব মদনা আর তার তিনজন সহকর্মী ন্যাপা, বিশেদের ক্লাব থেকে আউট করে দিয়েছে, ওদের বিরুদ্ধে নাকি নানা অভিযোগ, ওরা কুলেপাড়া ক্লাবের নাম ডুবিয়েছে।

কুলেপাড়া ক্লাব আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের একেবারে জাতশত্রু। আমাদের নিজেদের খেলার মাঠ, ক্লাবঘর আছে অবশ্য এবারই হয়েছে আমাদের পটলার ঠাক্‌মার দৌলতে। ওদের জায়গা পটলার জন্যই আমরা ব্যবহার করার অনুমতি পেয়েছি।

প্রতিবার ঘটা করে শিল্ড ফাইনাল হয়, ফাংশনও করি এই মাঠে। ফটকে গান-বাজনার লাইনে আছে ওই শিল্পীদের আনে। দারুণ অনুষ্ঠান হয়। কুলেপাড়ার খেলার মাঠও নাই, তবু ফুটানি আছে, আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাস্তাতেই ম্যারাপ বেঁধে ফাংশনও করে। কিন্তু আমাদের টেক্কা দিতে পারে না।

সবদিক থেকে এই অঞ্চলে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবই সেরা। কুলেপাড়া তিনহাত সরস্বতী করেছে, পটলা বলে পাঁচহাত উঁচু সরস্বতী কর। যা লাগে দেবো। আর ওদের তিনখান গেট হচ্ছে বিসর্জনে। হোঁৎকা বলে আমাগোর ন'খানা গেট হইব পটলা।

সবদিক থেকে কুলেপাড়া ক্লাব হেরে যায়। আর তাই নাকি ওদের মধ্যেই বিরাট ঝগড়া শুরু হয়। মদনাই তার দলবল ওই ন্যাপা বিশেদের নিয়ে ওইসব অনুষ্ঠান করে। এবার কুলেপাড়ার সভ্যরা বলে—মদনা টাকা মারে, ভালো শিল্পীদের আনে না, তাই পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবই জিতে যায়। তাড়াও মদনাকে।

অপমানিত মদনাও ক্লাব থেকে বিতাড়িত হয়ে এবার আমাদের ক্লাবে এসে হাজির হয়, পরীক্ষা শেষ, সন্ধ্যাবেলায় তাই ক্লাবে আমি, হোঁৎকা, পটলা, ফটিক মায় গোবরাও রয়েছি। পটলা আজ টোস্ট ওমলেটের ব্যবস্থা করেছে ক্লাব ফান্ড থেকে, তারই সদ্ব্যবহার করছি। অবশ্য হোঁৎকার জন্য ডবল টোস্ট চাই। ওর পেটের খোলটা একটু বড়। হোঁৎকা তাও পেয়েছে। এমন সময় মদনাদের আসতে দেখে চাইলাম। মদনা এসেছে একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থায়, ওর সঙ্গী ন্যাপা বিশুও গরুচোরের মত দাঁড়িয়ে আছে নীরবে। মদনা বলে,

—হোঁৎকা, ওই কুলেপাড়া ক্লাবকে মুছে দেব।

এ যেন ভূতের মুখে রামনাম। মদনা আমাদের চিরশত্রু ওই কুলেপাড়া ক্লাবের একটা স্তম্ভই। সব অনুষ্ঠান সেখানে ওই অর্গানাইজ করে, খেলার মাঠে কুলেপাড়া ক্লাবের হয়ে ওই তাণ্ডবনৃত্য করে। ভাসানের সময় কুলেপাড়া ক্লাবকে ওই সবকিছু জুগিয়ে সাহায্য করে। আমাদের ক্লাবের নামে মুর্দাবাদই দিয়েছে এতদিন। আজ এই মদনাকে ওই কথা বলতে শুনে অবাক হই। হোঁৎকা শুধোয় কি কস্ মদনা?

মদনা রাগে ফেটে পড়ে। বলে কুলেপাড়া ক্লাবের জন্য জান লড়িয়ে দিলাম আর এখন

আমাকে বলে 'থিফ', চোর! বেইমান! আমার জন্যই ওদের ক্লাবের বদনাম! তাই ওই ক্লাব ছেড়ে চলে এসেছি, ওই কুলেপাড়া ক্লাবকে তুলে দেব। নাম নিশানা মিটা দেঙ্গে! নাম মুছে না দিই তো আমার নাম মদনাই নয়।

ন্যাপা বলে গুরুকে খুব হ্যাটা করেছে ওরা। আমরাও চলে এসেছি।

সামনে আমাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান। শুনি কুলেপাড়াও নাকি ওই সময়ই আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনুষ্ঠান করবে। তাই মদনাকে এখন পেলে কুলেপাড়া ক্লাবকে জব্বর ঘা দিতে পারব। পটলা বলে তুই আসবি আমাদের ক-ক্লাবে?

মদনা বলে সিওর। আর এবারেই কুলেপাড়ার ফাংশনকে টেক্কা দিয়ে এখানেই ফাংশন করব। দেখবি মদনার এলেম। পটলা কি বলতে যায়, হোঁৎকা টোস্টের শেষটুকু মুখে পুরে বলে, পরশু আয় মদনা, তহন কথা হইব।

মদনা বলে তাই আসব, তবে মদনার বাত হাতিকা দাঁত, একবার বের হয়ে এসেছি ওদের শেষ করব বলে, শেষ করবই। দেখবি।

ওরা চলে গেলে পটলা বলে ওকে নিয়ে নে হোঁৎকা, ক-কাজের ছেলে। ওকে টানতে পারলে কুলেপাড়া গন্ ফট্। ফুটে যাবে। হোঁৎকা বলে, ভাবতি দে হক্কলেরে। ফট্ কইরা বিলিভ করস না।

গোবরা বলে, আমি শুনেছি মদনাকে ওরা আউট করে দিয়েছে।

পটলা বলে, ওদের শত্রু এখন মদন। শত্রুর শত্রুকে বন্ধু বলে মেনে নিলে ক-কাজ হয়। নে মদনাকে। কাজের ছেলে, এবার মুখের মত জবাব দিব ওই কুলেপাড়া ক্লাবকে।

ফটিক চায় জমিয়ে অনুষ্ঠান হোক এবার। মদনা থাকলে অনুষ্ঠান আরও জমবে। তাই বলে, মদনাদের নে হোঁৎকা।

আমি বলি, হোঁৎকা ঠিকই বলছে, মদনা অন্য ক্যাম্পের ছেলে আমাদের সঙ্গে মিলবে কি না দেখতে হবে তো, শেষে যদি কোন গোলমাল হয়?

গোবরা বলে, তাহলে মদনাকেই ঠ্যাং ভেঙে ফেলে রাখব। গোবরা গায়ের জোরেই সব করতে চায়। মদনাকে পটলার চাই, পটলাও চায় কুলেপাড়া ক্লাবকে দেখাতে যে মদনাকেও তারা এনে ওদের ঘা দিয়েছে। ফটিক তো সায় দেয় ওতে। গোবরাও।

অর্থাৎ পাঁচজনের তিনজন একদিকে, আমি আর হোঁৎকা তাই যেন ভোটে হেরে গেছি। হোঁৎকা বলে, তয় নে কিন্তু কইছি একটু হুঁশিয়ার থাকতি হইব। মদনা যদি লেঙ্গি মাইরা দেয়? পটলা বলে, নো ফিয়ার। ও ওসব করবে না।

মদনা বিশে ন্যাপাদের নিয়ে এবার আমাদের ক্লাবেই সামিল হল। পোস্টার লেখা, প্যাম্পলেট বিলি করা, ফেস্টুন টাঙানো সবতাতেই মদনা। মদনা কয়েকদিনের মধ্যে পটলার ডানহাত হয়ে উঠল। মদনাও যেন জান লড়িয়ে দেবে আমাদের জন্যে।

পটলা বলে, না, ছ-ছেল্লেটা খুব কাজের।

পটলার ভাব একটু গভীর হলে জিবটা আলটাকরায় সেট হয়ে যায়। পটলার কাছে আর্টিস্টদের লিস্ট ফেলে দেয় মদন। নামি-দামি আর্টিস্ট। মদনা বলে সন্ধ্যাদিকে আমি বললে গাইবে ওদিকে হৈমন্তীদি, শ্রীরাধাদি, এদিকে শৈবালদা, ইন্দ্রনীলদা আর নচিকেতাদা—ব্যস

ফ্যাংশন কুলপি হয়ে যাবে। কুলেপাড়া যেন কোন আর্টিস্ট না পায়। ওদের কনট্রাক্ট করাব এখানে অন্য কোন আসরে গাইবে না। করুক কুলেপাড়া ফাংশন, দেখি ক্যামন বাপের ব্যাটা। ওদের প্যান্ডেলে স্রেফ মাছি উড়বে। মাছি।

দৃশ্যটা কল্পনা করেও তৃপ্তি পাই। কুলেপাড়া ক্লাব পথে বসবে, লোক হাসবে ওদের দেখে আর পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব রমরমিয়ে ফাংশন করবে ওই সব নামি শিল্পীদের নিয়ে।

পটলা বলে তাই ক-করতে হবে মদন।

মদনার চ্যালা বিশু ন্যাপা বলে, করতে হবে কি? গুরু যখন বলেছে তখন করা হয়ে গেছে ধরে নাও।

ঘনঘন চা, টোস্ট আসছে মদনাদের জন্য। পটলাকে নিয়ে মদনা গাড়ি নিয়ে বের হচ্ছে। শিল্পীদের বাড়িতে টাকা দিয়ে কনট্রাক্ট সই করিয়ে নিচ্ছে মদনা।

বলে, কাজ সব আমার পাকা পটল।

পটলাও খুশি। মদনা শিল্পীদের সই করা কাগজপত্র সব নিজের ব্যাগেই রেখে দেয়। বলে, সব একবারেই দেবো মায় হিসাব সমেত।

ফাংশনের দিন ঘনিয়ে আসছে, আমাদের সময় নেই। স্বপ্ন দেখছি এবার ওই কুলেপাড়া ক্লাবকে পথে বসাবোই। সব শিল্পী এখন আমাদের কাছে চুক্তিবদ্ধ, এ পাড়ায় আর কোন অনুষ্ঠান করবে না। পটলা বলে।

—দ্যাখ হোঁৎকা, তোরা তখন বকলি মদনাকে ভরসা ক-করা যায় না। ওই মদনাই কুলেপাড়াকে বধ করেছে। এবার নাম ফাটাবে ওই পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবেরই ওই মদনার জন্যই।

পরদিন সকাল থেকেই মদনা-বিশেদের দেখা নাই। আমি তখন আর্টিস্টদের লিস্ট করছি বিশাল করে হোর্ডিং লেখানো হবে, হ্যান্ডবিল ছাপাতে হবে। মদনার কাছে লিস্ট কিন্তু মদনার দেখা নেই, ফটিক সাইকেল হাঁকিয়ে, এদিক-ওদিক ঘুরে গলদঘর্ম অবস্থায় ফিরে এসে বলে বাড়িতে তো নেই মদনা। কোথায় গেছে কদিন। পটলা বলে তাহলে গেছে কোন আর্টিস্টদের বাড়ি। ফিরে এলেই পুরো লিস্ট পাবি। কাছেই গেছে কো-কোথাও!

এমন সময় হোঁৎকা ঢোকে বিধ্বস্ত অবস্থায়। হাতে একটা পোস্টার। হোঁৎকা বলে, আর্টিস্টদের লিস্টি আর পাইবি না, মদনা গদ্দারি করছে। তখন কইছিলাম শোনসনি, এহন দ্যাখ মজাখান।

এগিয়ে দেয় পোস্টারটা। কোন দেওয়াল থেকে ছিঁড়ে এনেছে। পিছনে আঁঠা লাগানো আর এদিকে লাল কালিতে লেখা বহু তারকা সমাবেশে কুলেপাড়া ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠান। অংশ নিচ্ছেন তারপরেই আমাদের বুক করা সব নামি-দামি শিল্পীবৃন্দের নাম। চমকে উঠি, একি এসব শিল্পীকে তো আমরাই বুক করেছি! হোঁৎকা বলে বুক তো করছিস টাকাও দিছস, তয় আমাগোর পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের নাম বুক না কইরা ওই কুলেপাড়া ক্লাবের নামেই বুক করছে মদনা, ক্লিন লেঙিই মারছে আমাগোর। এহন বোঝছস কেসখান?

পটলা আর্তনাদ করে ওঠে, সে কি! তাই কাগজপত্র আমাকে দেয়নি মদনা, এই স-সব ক-করেছে?

গোবরা গর্জে ওঠে, মদনারে মার্ডার করব, ওর ঠ্যাং ভেঙেই দেব নির্ঘাৎ।

বলি ওসব ছেড়ে এখন খবর নে, ব্যাপারটা কি জানতে হবে। ক্রমশ খবরটা বের হয়। মদনা বিশের দল এখন ঝাঁকের কই আবার কুলেপাড়ার ঝাঁকে মিশে গেছে, আমরাও দেখি মদনা এখন কুলেপাড়ার ক্লাবের সকলের প্রিয় আপনজন। যে কুলেপাড়া ক্লাবকে সে মুছে ফেলে দিতে চেয়েছিল, সেই ক্লাবেরই এখন কর্মকর্তা। ওই নাকি সদর্পে বলে পঞ্চপাণ্ডবের সব কটাই ছাগল তাই অনায়াসেই ওদের ঘাড় মটকেছি। মরুক ছাগলের দল।

কথাটা আমাদের কানেও আসে। কিন্তু করার কিছুই নেই। আমাদের টাকায় আমাদের বোকা বানিয়ে মদনা এখন ফাংশন করতে চলেছে। আর আমাদের করার কিছুই নেই। পটলা তবুও চেষ্টা করে। শিল্পীদের কাছে গিয়ে বেশি টাকাও দিতে চায়। কিন্তু তারা বলে, কুলেপাড়া ক্লাবের টাকা নিয়ে চুক্তি করেছি, দশদিন ওখানে অন্য কোথাও অনুষ্ঠান করব না।

সন্ধ্যার আঁধার নেমেছে আমাদের ক্লাবঘরে। চুপচাপ বসে আছি। ওদিকে কুলেপাড়া ক্লাব অটোতে মাইক লাগিয়ে তাদের অনুষ্ঠানের শিল্পীদের নাম ঘোষণা করছে। আর ওদের কার্ডও বেশি দামে বিকোচ্ছে। এত শিল্পীর সমাবেশ করেছে কুলেপাড়া ক্লাব, এমন ফাংশন ইতিপূর্বে এখানে আর হয়নি।

পটলা বলে আ-আমি সু-সুইসাইড করব।

পটলার জন্যই এই সর্বনাশ হয়েছে তাই পটলা সুইসাইড করে লজ্জা এড়াতে চায়। গোবরা গজরাচ্ছে, মদনারে মার্ডার করব। ব্যাটা গদ্দার। বিশ্বাসঘাতক।

ফটিক বলে লোকে হাসছে রে। বলছে আমরা নাকি ছাগলপার্টি, গাধার দল।

আমি কোনো জবাব দিই না। যেন সবাই ক্লাবের মৃতদেহ আগলে রয়েছিল শেষ সৎকারের আশায়। হঠাৎ হোঁৎকা গর্জে ওঠে, একটা বিহিত করুম। পটলা সুইসাইড করতি হইব না। যা বলি তাই কর। ওই কুলেপাড়া ক্লাব মদনা দুইটাই ফিনিস হইব। প্রতিশোধ লমুই।

পটলা বলে, পারবি হোঁৎকা?

হোঁৎকা বলে—সিওর, ওদের ফাংশন ক্যামন জমজমাট হইব দেখবি।

এবার নতুন আশা নিয়ে সে উৎসাহ নিয়ে, আমরাও এবার হোঁৎকার প্ল্যানটা শুনছি। হোঁৎকার মাথাতে নানা বুদ্ধি হঠাৎ হঠাৎ খেলে যায়, তাতে অনেক সমস্যার সমাধানও হয় বেশ বিচিত্রভাবে। এবারও একটা প্ল্যান এসেছে ওর মাথায়।

সব শুনে বলি, প্ল্যানটা ভালোই, তবে খুব সাবধানে আর গোপনে এসব করতে হবে।

পটলা বলে, তাই করবি, টাকা যা লাগে দেব। ঠিকমত ক-কাজ যেন হয়। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত যে। ঠিকঠাক কাজ যেন হয়।

গোবরা বলে ওর জন্য ভাবিস না। ওই জীব-জন্তুর ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দে, আর সমী ওই টেলিফোন তুই পটলাদের বাড়ি থেকে পটাপট করতে থাকবি।

হোঁৎকা বলে বাকি সব ব্যবস্থা আমিই করুম। পটলা বেশ কিছু টাকা দিয়ে বলে, তাই কর। টাকা যা লাগে নে। এই গদ্দারির জবাব দিতেই হবে।

কুলেপাড়া ক্লাবের এখন রমরমা অবস্থা। ওদিকের বড় রাস্তায় ওরা বেশ বড়সড় প্যান্ডেল করেছে। ওদিকেই ধোপাদের আড্ডা, এদিকে বাড়ি—মাঝের পথে ওদের প্যান্ডেল। অফিসে হইচই চলছে। মদন দলনেতা। তার নামে আর ওদের প্রেসিডেন্ট ভূধরবাবুর নামে কার্ড ছাপা

বইঘর.কম

হয়েছে, বেশ চড়া দামেই দেওয়া হচ্ছে কার্ড। পাড়ার দেওয়ালে ওদের রঙিন পোস্টার ব্যানার লাগানো মাইকে পাড়া মুখর করে কুলেপাড়ার ক্লাবের জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়।

আমরা মুখ লুকিয়ে যাতায়াত করি। লোকে জানে হেরে গিয়ে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব তাদের অনুষ্ঠান বন্ধ রেখেছে। লজ্জায় চলে গেছে কোথায় ওদের সভ্যরা।

কুলেপাড়ার অনুষ্ঠানের দিন সমাগত। মদন এখন খুবই ব্যস্ত। এখন সে কুলেপাড়ার হিরো। পরের পয়সায় এত শিল্পী পেয়ে গেছে। এত টাকা বাঁচিয়েছে ক্লাবের আর পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবকে ঠান্ডা করে দিয়েছে সুতরাং এদের কাছে মদন এখন হিরোই। ভূধরবাবুরও রাগ আমাদের উপর। আমাদের জন্যই নাকি সে ভোটে হারে। এবার এই অনুষ্ঠান করে নাম ফাটিয়ে জিতবে সে।

মদন এখন আমাদের দেখেও দেখে না। ফাংশনের মালকড়ি ভালো আমদানি হচ্ছে, আর শিল্পীদের টাকা দিতে হয়নি। তার অর্ধেক নাকি মদনই পাচ্ছে ক্লাব থেকে। তার দিনকাল ভালোই চলেছে, আমাদের দেখে বলে শ্লেষভরা কণ্ঠে, কিরে ফাংশন করবি না? এ্যাঁ কী হল?

হোঁৎকা চুপ করে থাকে। আমরাও নীরব থাকি।

পটলাই গর্জায়, বি-বি—

হাসে মদনা, বিশ্বাসঘাতক? তোরা তো ছাগল।

গোবরা গর্জায়—দেব এক রদ্দা।

আমি থামাই তাকে। হোঁৎকা বলে। চল এহান থেকে। আমরাই সরে আসি সব অপমান সহ্য করে। মদনা বিশের দল দাঁত বের করে হাসে।

হোঁৎকা বলে সব সায়লেন্ট থাকবি! যা করার ঠিকঠাক করতি হইব গোবরা—

গোবরা বলে, সব ব্যবস্থা করেছি, তোরা যে যার ডিউটি করে যা।

অনুষ্ঠানের দিন কুলেপাড়া ক্লাবের সভ্যদের ব্যস্ততার সীমা নেই। মদনা সব কাজের ভার ওদের সভ্যদের বুঝিয়ে দিয়েছে। একদল শিল্পীদের অভ্যর্থনা করবে। অন্যদল গেট সামলাচ্ছে। মদন নিজে অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে। চোস্ত আর ঝকঝকে চিকনের কাজ করা গুরুপাঞ্জাবি পরে মদন মেক-আপ দিয়ে মাইকে তখন ইনিয়ে-বিনিয়ে কুলেপাড়া ক্লাবের মহান অবদানের কথা ঘোষণা করছে। বিশাল দেহ নিয়ে ভূধরবাবু গলায় মালা পরে, বোদা মুখ করে বসে আছে মঞ্চে।

প্যান্ডেল তো ভর্তি। স্টেজে লাল-নীল আলো জ্বালার পরীক্ষা চলেছে এরপর ক্লাবের সভ্য-সভ্যারা উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবে নৃত্য সহকারে।

ওদিকে গ্রিনরুমে তখন নামিদামি তিনচার শিল্পীও হাজির। ছেলেরা বুকে ব্যাজ লাগিয়ে তাদের খাতির করছে। বক্তৃতার পর এবার সানাই বাদন চলেছে এরপর মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে কুলেপাড়া ক্লাবের সভ্যসভ্যাদের সমবেত বেদগান পরিবেশিত হবে।

মঞ্চ ফাঁকা—লাল-নীল আলোর ট্রায়াল চলছে।

ওদিকে গোবরা ফটিক আর গোবরার ধোপাপাড়ার চ্যালারাও যে অন্ধকারে পুকুরপাড়ে তৈরি হয়ে আছে ওদের হাতে মুঠো-মুঠো নস্যি আর গোবরা খোঁজখবর করে ধোপাপাড়া থেকে গোটা দশবারো গাধাও জোগাড় করে ওদিকে অন্ধকারে তৈরি হয়ে আছে লাঠি হাতে। মাইকে ঘোষণা হতেই গোবরা বলে ওঠে, স্টার্ট—

বইঘর.কম

মঞ্চ প্যান্ডেলে দর্শকরা হঠাৎ কলরব করে ওঠে, মাইকে ঘোষণা চলছে সভ্যসভ্যাদের সমবেত বেদগান হঠাৎ বিকট চিৎকারে চাইল শ্রোতারা, ওদিকে তাড়া খেয়ে প্যান্ডেলের চাদর ঠেলে ঢুকছে গোটা দশেক গাধা গলায় লাল জবা ফুলের মালা আর ওদের দুই নাকে গোবরার দল মুঠোভর তাজা নস্যি পুরে দিতে ওই গাধার দল বিকট শব্দে হাঁচছে আর চিৎকার করছে তারস্বরে—হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো ফ্যাঁচ্ হ্যাঁচ্চো আট-দশটা গাধা মালা পরে মঞ্চে ঢুকে ওই বেদম কোরাস চালু করেছে। মাইকে ওই গাধার হাঁচি আর আর্তনাদ তখন আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিয়েছে—হ্যাঁচ্চো—হ্যাঁচ্চো—

কুলেপাড়ার সভ্যসভ্যারা এমন বেদগান গাইবে তা দর্শকরা ভাবেনি। ওরা হাসতে থাকে। এ কি বেদগান রে? এ যে গাধার দলের চিৎকার।

মদন বুঝতে পারেনি এমনি কাণ্ড ঘটবে। সে তার দলবল নিয়ে গাধাদের তাড়া করে। গাধার মত নিরীহ জীব যে মারাত্মক হতে পারে তা তাদের জানা ছিল না। চারপায়ে লাথি ছুঁড়তেই মদন ছিটকে পড়ে ওদিকে—কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে আর ধাবমান গাধার দল এবার জনারণ্যে কোনদিকে যাবে ভেবে না পেয়ে সামনের দিকেই দৌড়লো, সঙ্গে সেই চিৎকার—হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ—দর্শকরা এ হেন অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি ছিল না। তাড়া খেতেই গাধাগুলো যে যেদিকে পারে ছুটছে, ফলে দর্শকরাও এবার যে যেদিকে পারে দৌড়োল, চেয়ার ভাঙছে গাধার লাথিতে। মানুষজনের কলরব ওঠে, সেই সঙ্গে সমবেত গর্দভরাগিণীও চলেছে।

কয়েক মিনিট মাত্র, তার মধ্যেই প্যান্ডেল লণ্ডভণ্ড, লোকজনও উধাও। ওদিকে দুটো গাধা গ্রিনরুমের দিকে ছুটেছে। একজন ভলেনটিয়ার ছিটকে পড়ে, পালাও।

শিল্পীরাও গাধার লাথি থেকে প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিকে পারে বের হয়ে গাড়িতে উঠে কেটে পড়ে। জানে ফাংশন ভণ্ডুল হলে তারপর প্যান্ডেল ভাঙচুর হবে। পাবলিক ধরবে তাদেরও।

কোনরকমে গাধার দল তো পালাল সব পণ্ড করে, আবার কর্মকর্তাদের পেটাতে লোকজন ভাঙা আসরে ফিরে আসে, কিন্তু শিল্পীরা আর ফেরেনি, তারা কেটে পড়েছে।

ওদিকে আমি তখন পটলার বাড়ি থেকে বাকি শিল্পীদের ফোন করছি, আমাদের ক্লাবে গোলমাল হচ্ছে আপনাদের অনুষ্ঠান বাতিল করা হল। না আসাই নিরাপদ। অন্যত্র অনুষ্ঠান থাকলে চলে যান।

মদনা কোনমতে মাথায় ফেট্টি বেঁধে মঞ্চে খাড়া হয়ে ঘোষণা করছে—বসুন, শান্ত হয়ে বসুন, অনুষ্ঠান যথারীতি হবে, শিল্পীরা এসে পড়বেন।

তাড়া খাওয়া দর্শকরা তো এবার মরিয়া। ঘণ্টাখানেক হয়ে গেছে, নামি-দামি শিল্পী কিছু ভেগেছে আগেই। বাকিদের পাত্তা নেই। তাই তারা এখানের অনুষ্ঠান বাতিল হতে অন্যত্র ধরে নিয়ে চলে গেছে। তাদেরও পাওয়া যাচ্ছে না।

তারপরই শুরু হয় ভাঙচুর। দর্শকরা গর্জন করে ফোরটোয়েনটিগিরি করা হচ্ছে, গাধার সং দেখাতে টাকা দিইছি?

কইরে শিল্পীরা কই? কে আওয়াজ দেয়।

ক্রমশ হাওয়া গরম হতে থাকে। দুচারটে ঢিল-পাটকেলও পড়া শুরু হয়। মড়মড় করে চেয়ার ভাঙছে, উত্তেজিত দর্শকদের উত্তেজনাও বাড়ছে। মদন ভূধরবাবু ব্যাপার গুরুতর দেখে

ঘাবড়ে গেছে। উৎসাহী-ভলেনটিয়াররাও এবার ব্যাজ খুলে পকেটে পুরেছে দর্শকদের মার থেকে বাঁচার জন্য। ভাঙচুরের পর আরও কিছু করত দর্শকরা কিন্তু পুলিশই জোর করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে প্যান্ডেল মাইক বাঁচালো কোনমতে।

সারা রাত অবধি এই নাটকই চলেছিল তারপর মদন ভূধরবাবু অন্য কর্মকর্তাদের পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবার পর জনতা ফিরে যায়। অনুষ্ঠান মঞ্চে যেন দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেছে।

আমরা নিরাপদ দূরত্বে থেকে সবই দেখছি। হোঁৎকা বলে—কি রে পটলা এহন খুশি?

পটলা বলে, পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের মুখ রেখেছিস হোঁৎকা। উঃ মদনারে পুলিশ টানতে টানতে নে গেল—ওই মোটকা ভূধররেও। খুব খুশি হইছি।

গোবরা এসে জানায়, পুলিশ ওদের ক্লাবঘরেও তালা দিয়ে গেছে।

পটলা বলে, ভেরি গুড, চল এবার। কাল হোঁৎকার অনারে তোদের ক-কবজিভোর মাংস খাওয়াব।

বইঘর.কম

ইটের বদলে পাটকেল

আজকেল ঝালমুড়িটা বেশ জমেছে। ভকতরাম নতুন কি এক মশলা বের করেছে সামান্য আমচুর দিয়ে, তাতে মুড়ির কদরও বেড়ে যায়। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের মাঠে বসে পটলার পয়সায় ঝালমুড়ি খাচ্ছি। ওদিকে দরজায় বেড়া দেওয়া ক্লাবঘর, সাইনবোর্ডটার একদিক ভেঙে গিয়ে নড়বড় করে ঝুলছে—যে কোন মুহূর্তেই ওটা ছিটকে পড়বে। অবশ্য আমাদের ক্লাবের অবস্থাও তেমনি। কবছর এই মরে সেই মরে করে করুণভাবে টিকে আছে।

দরমার ঘরে ফটিক হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইছে, মেরে সঁইয়া—আ, পার লাগাদে নাইয়া। বিগত পাঁচ বছর ধরে হতভাগাটা ওই এক গানই গেয়ে চলেছে, নৌকা পারে লাগানোর গান।

গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হয়েছে। এবার ক্লাব ফান্ডের অবস্থা খুবই টাইট, নইলে প্রতিবারই এ সময় দল বেঁধে বেড়াতে বের হই। ক্যাশিয়ার অবশ্য পটলাই। টাকা কড়ি ওই ম্যানেজ করত বাড়ি থেকে। এবার সেই টাকার উৎস অর্থাৎ ঠাকুমা কেদার বদরি গেছে। বাবা কাকারা মস্ত বড়লোক পটলার, কিন্তু পুরুষগুলো মহাচিপ্পুস। মাপা টাকা ছাড়া একস্ট্রা টু পাইস দেবে না।

হঠাৎ এমনি দিনে এসে পড়ে পটলার মাসতুতো ভাই নন্দ। নন্দদুলালকে আমরা চিনি পটলার সুবাদেই। বর্ধমানে ওদের বিরাট বাড়ি, বাবাও নামকরা উকিল।

নন্দ বলে—ছোড়দির বিয়ে সামনের ২৬ বৈশাখ, আর শহরে নয়—পাত্রের মামা দেশের বাড়িতে থাকেন, উনি চান আমাদের দেশের বাড়ি থেকে বিয়ে হবে।

নন্দ আরও বলে,—দূর গ্রামে বিয়ে, এতবড় করে, সেখানে তো বিশেষ যাই না তাই কাজের লোকজন ম্যানেজ করার জন্য তোদেরও যেতে বলেছেন বাবা।

ফটিক বলে,—ওরে ব্বাবাঃ, সেই অজপাড়াগাঁয়ে যেতে হবে!

পটলা বলে—না গেলে ওরা বিপদে পড়বে, তাই পাঠিয়েছেন নন্দদাকে মেসোমশাই। চল না—গরমের ছুটিতে বেড়ানোও হবে।

হোঁৎকা কি ভাবছে। বলে সে এবার—তয় পরোপকার—যারে কয় সমাজসেবাও হইব। চল্ যাই গিয়া।

নন্দদাও খুশি। বলে—তাহলে ক্লাবের রবীন্দ্রজয়ন্তী ২৫শে সেরে পরদিনই বের হয়ে পড়বি, আমাদের বর্ধমানে পাবি না, সাতদিন আগেই চলে যাব গ্রামে, তো—পথের হদিস সব বলে দেব। তোদের গাড়ি ভাড়াও রেখে যাচ্ছি পটলার কাছে। নিশ্চয়ই যাবি কিন্তু।

হোঁৎকা তো পা বাড়িয়ে আছে সোৎসাহে মাথা নাড়ে—ঠাক্‌মা এখানে নাই—এবার রবীন্দ্র জয়ন্তী তেমন জোর হইব না। ক্যাশকড়ি নাই মোটে। অক্ পঁচিশে বৈশাখ রাতেই স্টার্ট করুম। কী বলিস তোরা?

গোবরা, আমি, ফটিক, পটলা আর হোঁৎকা এবার যাবার প্ল্যান নিয়ে ব্যস্ত। পটলার এমার্জেন্সি ক্যাশ থেকে সাংশন করা হয়েছে পঞ্চাশ টাকা।

Boighar.com

—কী করবি?

পটলার কথায়, হোঁৎকা বলে,—কলকাতা থনে যাইত্যাছি ওই অজগ্রামে, বিয়া বইলা কথা।

কলকাতার স্যাম্পল বানাইমু না? তুবড়ি—বোম না হলে বিয়াবাড়ি মানায়? দে ট্যাকাটা, তাক লাগাইয়া দিমু!

এটা ঠিকই, হোঁৎকা বোম, পটকা—তুবড়ি বানাতে ওস্তাদ। 'শতরূপা' 'আমরা কজন' এই এলাকার সব ক্লাবেরই তুবড়ি কমপিটিশনে হোঁৎকার ফার্স্ট প্রাইজ বরাবর বাঁধা।

প্ল্যাটফর্মে এসে হাজির হয়েছি পাঁচমূর্তি। হোঁৎকার পরনে হাফপ্যান্ট, শার্ট, মাথায় টুপি, গলায় ঝোলানো হুইসিল, পিঠে ব্যাগ। আমাদের সকলেরই প্রায় এক পোশাক। শুধু ফটিক শিল্পীমানুষ তাই কোঁচানো ধুতি, কারুকাজ করা পাঞ্জাবি পরেছে, মালপত্র নিয়ে উঠে বসেছি।

তখন রাত্রি গভীর।

ট্রেনটা বর্ধমানে এসে থেমেছে। এইখানে নামতে হবে আমাদের। স্টেশনের ওদিকে মৃদু আলোয় দেখা যায় ছোট লাইনের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ভোর চারটেতে ছাড়বে। এখনও ঘণ্টা দুয়েক দেরি।

হোঁৎকা হুইসিল বাজিয়ে পুরো দল দিয়ে লাইন টপকে এসেছে ছোট গাড়ির কাছে। আবছা অন্ধকারে গাড়িটা দাঁড়িয়ে। গোবরা আয়েসি গোছের, বলে—উঠে শুয়ে পড় রাত অনেক বাকি।

দরজাগুলো কোনটা খোলা কোনটা বন্ধ। আগে যাচ্ছে পটলা—তারপরই কাণ্ডটা বেঁধে যায়।

একটা বিকট শব্দে পটলা গোঁৎ খেয়ে পড়ে—তারপরই দুটো সুঁচলো মত কি আমার হাঁটুতে ঠেকে আর পিছনে ছিটকে পড়েছে গোবরা। তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। আর ফটিকও 'বু-বু-বু' শব্দ করে চোখ কপালে তুলে লাফ দিয়ে দৌড়তে যায়, হোঁৎকা ততক্ষণে টর্চ জ্বেলে ব্যাপারটা দেখে বলে—এ্যাই ভূত ফুত নয়, থাম্ দ্যাখ না। দেখা যায়, একটা ইয়া দাড়িওলা বেওয়ারিশ পাঁঠা ধরাশায়ী গোবরার গায়ে নির্লিপ্তভাবে জল ছেড়েছে। সরকারি গাড়িতে ব্যাটা আরাম করে রোজই ঘুমোয়। আমাদের এসে শান্তিভঙ্গ করতে দেখে প্রথমে আঘাত—পদাঘাত তারপর জলবিয়োগ করে সামনের দু পা তুলে শিংসমেত অ্যাটাক করার চেষ্টা করছে গোবরাকে।

হোঁৎকা টর্চের ঘা মারতেই আপাতত রণে ভঙ্গ দিয়ে অন্য কামরায় উঠল হতভাগাটা।

অন্ধকার কামরা, পটলা বলে,—ভ-ভালো করে দ্যাখ হোঁৎকা, আর কোন জানোয়ার আছে কিনা। উঃ, পড়ে গিয়ে ক-কপালে যা লাগছে।

ভোরের মুখেই ট্রেন ছাড়ল, ছোট হলে কী হয় এর হাঁকডাক আর লম্ফ ঝম্ফ কম নয়। কামরার ভিতরে আমরা ক'জন। বাকি যাত্রীরা তো ছাদে, নামবে সূর্য উঠলে।

খালি কামরায় খোলার ভাজা খই-এর মত ছিটকে ছাটকে চলতে পৌঁছলাম বলগনা। সর্বাঙ্গে কয়লার গুঁড়ো, ভূতের মত চেহারা, গায়ে হাতেপায়ে প্রচুর ব্যথা।

গ্রীষ্মের দিন। পটলা বলে—এখানে চাটা খেয়ে নিয়ে টেম্পো ধরে মাথাভাঙ্গার মোড়ে চল, সেখানে ছোট্ট নদীর ধারে বসে টি-টি-টিফিন করা যাবে।

বইঘর.কম

সুতরাং আবার যাত্রা। ছাগলগরুর মত গাদাগাদি টেম্পোতে তিনটাকা করে খসিয়ে পৌঁছলাম মাথাভাঙ্গা। শরীর তখন একেবারে অবসন্ন। এমন যাত্রাযন্ত্রণা জানলে মরতে কে আসত?

সামনের মাঠে প্যান্ডেল বানানো হয়েছে। ওদিকে লম্বা ইস্কুলবাড়ি। এখন গ্রীষ্মের ছুটি, তাই বন্ধ। ওখানেই বরযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

নন্দদার বাবা হরিশবাবু শুধু ব্যস্ত। বাড়িতে এলাহিকাণ্ড চলেছে। ভিয়েন বসেছে, পুকুরের ইয়া বড় বড় মাছ গাদা করা হয়েছে।

কয়েকটা পাঁঠাখাসিও বাঁধা। ওদের কাটা হবে।

হরিশবাবু আমাদের দেখে বলেন—সব কাজকর্ম বুঝে নাও বাবারা। যেন কোন ঝামেলা না হয়। তোমরা এসে পড়েছো বাঁচলাম।

নন্দদাই বলে,—বরপক্ষ নাকি কড়া মেজাজের লোক। বর থাকে কলকাতায়, কোন্ অফিসে কাজ করে। তার মামাই সব। খুব কঠিন লোক। বর টাকার দাবিই করেনি। মামাই বরের অমতে কুড়ি হাজার টাকা ক্যাশ নিচ্ছে।

নন্দদা আরও বলে,—এছাড়াও এ গ্রামে মুখুজ্যে বাঁড়ুজ্যেদের দুটো দল আছে। আমাদের দিকে মুখুজ্যের দল। বিয়েতে বাড়ুজ্যেরা গোলমাল করতে পারে।

তাহলে তো কেস্ গড়বড়।

হোঁৎকা মালপত্র রেখে বলে—চল, গ্রামখান ঘুইরা আসি।

এ্যাই ছোকরা শোনো। —গ্রামের পথে চলেছি, এটাই বাঁড়ুজ্যেপাড়া। পথের ধারে একটা বটগাছের নীচটা বাঁধানো, কোন দেবস্থান হবে। সেই চাতালে বসে তামাক খাচ্ছিল কয়েকজন, নীচেও দু-চারজন রয়েছে। ইয়া গোঁফওয়ালা বয়স্ক লোকটা ডাকছে আমাদের। কাছে যেতে খ্যানখ্যানে গলায় আওয়াজ তোলে,—নিবাস?

আমরা দেখছি ওদের। অনুমানে বুঝতে পারি শত্রুপক্ষের ব্যূহের মাঝখানে এসে পড়েছি। জানাই—কলকাতা।

ওই ঘেসো উকিলের বাড়িতে আসা হয়েছে? কন্যাযাত্রী?

হোঁৎকা দেখছে ওদের। পটলাকে মুখ খুলতে দিই না। আমি জানাই—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বলে—এ গাঁয়ের নাম কি জানো? হাড়ভাঙ্গা বসন্তপুর।

আমি শুধোই—আপনার নাম?

তার জবাব দেবার আগেই দু-তিনজন চামচা উঠে পড়ে। আমাদের কাছে এসে বলে—কংস বাঁড়ুজ্যেকে চেন না? তোমার নাম কী?

হোঁৎকা বলে,—ওর নাম কিষ্ট নারায়ণ মুখুজ্যে। কিষ্টারে চেনেন তো। কংসরে যিনি বধ কইরাছিলেন। আয় চইলা আয়।

সকাল থেকেই বাড়িতে ব্যস্ততা পড়ে যায়। বিয়ের ছাদনাতলা হয়েছে বাড়ির সদরের উঠানে। চারিদিকে বারান্দা, মাঝখানে উঠান।

পটলা আর আমি ওই বিয়ের ছাদনাতলার ব্যবস্থা করছি। পুরোনো বাড়ি। লোকজন অন্যসময় বিশেষ থাকে না। ওদিকে বিরাট একটা বুনো মৌমাছির চাক।

পটলা বলে,—আরি ব্বাপ্।

আমি বলি,—ওদের না খোঁচালে ওরা কিছু বলবে না। যাস্‌নে ওদিকে, ছাদনাতলা হয়ে গেছে।

বিকেলেই এসে পড়েছে তেইশখানা গরুর গাড়ি। আকণ্ঠ বোঝাই হয়ে, বরযাত্রীর দল। গরুর গাড়ি যেন কাফেলা, আসছে তো আসছেই।

আর বর আসছে পাল্‌কিতে।

সারা মাঠ ভরে গেছে ওদের ভিড়ে। বরকে বসানো হয়েছে। এবার মাথা জোড়া টাক—বলিষ্ঠ মুগুরের মত গোল চেহারার মামাবাবু হুঙ্কার ছাড়ে,—জলখাবার দেন ছেলেদের।

তারপর আমাকেই বলেন,—বেইমশায়কে ডাকো।

হরিশবাবু বংশবদের মত এসে হাজির,—ডাকছেন।

মামাবাবু বলেন—চলুন হিসাবটা চুকিয়ে নিতে হবেক বিয়ার আগেই।

বরযাত্রীদের জলযোগপর্ব শুরু হয়েছে। হোঁৎকা, গোবরা, নন্দদা কয়েকজনকে নিয়ে ওদের প্লেটে জলখাবার দিচ্ছে রাধাবল্লভী, আলুরদম, সিঙাড়া, রাজভোগ, সন্দেশ, আম। প্রথম থেকেই দেখি গোলাপী জামাপড়া এক চ্যাংড়া বরযাত্রী তার দলবল নিয়ে কারণে অকারণে হৈ চৈ বাধাচ্ছে। আর সেই-ই আলুর দম মুখে দিয়ে বলে—ইটা কি হইছে হে?

হোঁৎকা বলে, কেন, আলুর দম।

ছোকরা চটে উঠে এক থাবড়া কাইসমেত আলুর দম নিয়ে হোঁৎকার মুখে, গালে, জামায় থ্যাপ করে লাগিয়ে বলে—খেয়ে দ্যাখো তো! ঝালনুন নাই।

হোঁৎকার মুখে আলুর দম দেখে বরযাত্রীদের অনেকেই ঠা ঠা করে হেসে ওঠে। একজন রসিকতা করে বলে টু কাটন রসগোল্লার রসও মাখিয়ে দে।

হোঁৎকাকে চেনে না ওরা। কি করে বসে ঠিক নেই। রাগে ফুলছে সে। আমি, নন্দদা গিয়ে থামাই। নন্দদা বলে—বরযাত্রীদের অত্যাচার সইতে হবে কনেপক্ষের লোকদের। সরে আয়।

ওদিকে গানের আসর বসে গেছে। বরযাত্রীদের দু-একজন খ্যামটা ঝুমুর গেয়ে থেমেছে, এবার ফটিক বসেছে। ওদের তুলনায় ফটিক অনেক ভালো গায়। কিন্তু গোলাপী জামা চিৎকার করে—গাভিরাগিণী নাকি হে ভাই! দলের কে বলে—কলকাতার গাভি।

গোবরা পান সাপ্লাই করছিল, বলে—আপনাদের দেখে স্বজাতি ভেবে তাই গাইছে।

ব্যস্! ওরা চিৎকার করে ওঠে—আমরা গাভি, গাধা, এতবড় অপমান। ওঠ সবাই, এখানে কভি নেহি, বর তুলে নিয়ে চল। মামাবাবুকে খবর দে।

মামাবাবুও এসে পড়ে—সত্যিই তো, খুব অন্যায়।

হরিশবাবু হাত জোড় করেন, শেষ অবধি গোবরাই ক্ষমা চাইল। ওরা থামল। আরও থামল, কারণ খাবার ডাক পড়েছে।

সব অপমান মুখ বুজে সইছি। খেতে বসেছে ওরা। হ্যাজাক জ্বলছে, পরিবেশন যারা করছে তারাও হিমশিম খেয়ে যায়। মাছ, মাংস পাতে পড়ছে, আর নেই, রাজভোগ ছানাবড়ারও সেই অবস্থা।

কি সন্দেহ হতে অন্ধকারে পিছন দিক দিয়ে গিয়ে দেখি, বরযাত্রীর দল পাতা থেকে মাছ, মাংস, রাজভোগ নিচ্ছে আর তুলে তুলে পিছনে ফেলছে।

শেষ অবধি মাছ, মাংস দিয়ে রাজভোগ দিয়ে সামনে দাঁড়াই। ফেলা আর হয় না তবে যথেষ্টভাবে পাতে ফেলেই উঠল নবাবের দল।

হোঁৎকা বলে,—চুপ মাইরা থাক। বিয়াটা হইতে দে। পরে দেখুম।

বিয়েতে বসতে যাবে, হরিশবাবুও তাই চান। এমনসময় গোলমালটা বাধে। বাঁড়ুজ্যেপাড়ার মাতব্বর সেই কংস বাঁড়ুজ্যে দলবল নিয়ে হাজির। তাদের দাবি—গ্রাম দেবতাকে হাজার একটাকা প্রণামী দিতে হবে না হলে বিয়ে হবে না। গ্রাম দেবতার হাজার এক, গ্রামসভার হাজার এক টাকা চাই। আর হরিশবাবুকে হাতজোড় করে মাপ চাইতে হবে কেন তাদের নেমন্তন্ন করা হয়নি।

সে কে বিচিত্র পরিস্থিতি। মুখুজ্যে পার্টিও বলে, এ টাকা তাদের প্রাপ্য।

দুই দলের চুলোচুলি বাধার উপক্রম। বর কনে তখনও আসেনি, বাইরের বাড়িতে তখন চুলোচুলি চলেছে। কপাল চাপড়াচ্ছেন হরিশবাবু। অন্দরে কান্নাকাটি পড়েছে। বিয়েটাই বোধহয় ভেস্তে যাবে এদের জন্যে।

মামাবাবু বলে,—এ ঝঞ্ঝাট সইব না। বর তুলে নিয়ে যাব।

তার বিশ হাজার টাকাও হাতে এসে গেছে।

আমাদের মধ্যে গোবরা আর হোঁৎকা নেই। অন্ধকারে হঠাৎ গ্রাম কাঁপিয়ে দুম্ দাম্ শব্দ! বোম ফাটছে। দূরে কোথায় চিৎকার ওঠে,—ডাকাত! ডাকাত! ডাকাত পড়েছে বাঁড়ুজ্যে পাড়ায়।

আর আমিও এই ফাঁকে সেই পুরোনো মৌমাছির বিশাল চাকে পর পর কয়েকটা আধলা ইট মেরে সোজা বাইরে পালিয়েছি।

মুহূর্তে শুরু হয়ে যায় ধুন্ধুমার কাণ্ড। ইটের চোটে ভেঙে পড়া চাক থেকে এবার মৌমাছির পাল ওই উঠোনে বাঁড়ুজ্যে ভার্সাস মুখুজ্যের দলকে ঘিরে ধরে ক্রুদ্ধ হয়ে হুল ফোটাতে শুরু করেছে। মামাবাবু তখন বর তুলতে যাচ্ছে। তার টাক থেকে শুরু করে সারাদেহে বসেছে ডজন কয়েক মৌমাছি। আর গোলাপী জামার দল ছিল ওদিকেই। ওইখানেই মৌমাছির দল বেপরোয়া অ্যাটাক শুরু করেছে।

লাফাচ্ছে দাপাচ্ছে উপস্থিত জনতার দল। কেউ গড়াগড়ি দিচ্ছে।

আর বোমার শব্দে বাঁড়ুজ্যের লিডার দলবল নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে গড়াগড়ি দেওয়া বরযাত্রীদলকে মাড়িয়ে দৌড়াল, কে জানে কি সর্বনাশ হয়েছে! মুখুজ্যের দলও দৌড়াচ্ছে অন্ধকারে। শুধু উঠানে গড়াগড়ি দিচ্ছে, লম্ফঝম্ফ করছে মৌমাছির আক্রমণে আটকে পড়া বরযাত্রীর দল। মামাবাবুর টাকসহ মুখখানা ফুলে পাঁচ নম্বর ফুটবল।

এর মধ্যে হোঁৎকা গোবরাও এসে পড়ে। তাড়াতাড়ি ধোঁয়া টোয়া দিতে মৌমাছির দল রণে ভঙ্গ দেয়। ক্রমশ শান্তি নামে, ততক্ষণ অবশ্য বরযাত্রীর দল মায় মামাবাবু প্রায় বাহ্যজ্ঞানরহিত।

অবশ্য বর কনে ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা ছিল বাড়ির ওদিকের মহলে। তাদের উপর তেমন হামলা কিছু হয়নি। তবে বরযাত্রীদের কাতরানির শব্দ বেশ শোনা গেছিল।

এবার বিয়েও শুরু হল। আর নির্বিঘ্নে শেষও হল বিয়ে।

মুখুজ্যে বাঁড়ুজ্যের দলবলও আর ফিরে এল না। তারা তখন ঘর পাহারা দিতে ব্যস্ত। ডাকাতদল নাকি এসেছিল, পালিয়েছে। আবার আসতে কতক্ষণ!

বইঘর.কম

পরদিন সকালে বাসি বিয়েও নির্বিঘ্নেই সারা হয়। বরযাত্রী দল বিদায় হল। এসেছিল সব গাড়িতে বসে লাটসাহেবের মত হৈ চৈ করতে করতে, ঘণ্টা কয়েক যা খুশি তাই করেও ছিল, কিন্তু ফেরার সময়? সাতিশয় ভদ্র, শুধু উঃ আঃ ছাড়া মুখে বাক্যটি নেই।

হরিশবাবুর মুখে এতক্ষণে উজ্জ্বল হাসি। সব ভালোয় ভালোয় চুকেছে। তবু আমাদের কাছে এসে বলেন—কাল এত বোম ফাটল গাঁয়ে—সত্যিই কি ডাকাত এসেছিল নাকি?

হোঁৎকা বলে—অভয় দ্যান তো কই। তারপর ব্যাগ থেকে দু তিনটে বাকি বোমা বের করে বলে—ওদের ওখানে বোমা ফাটাইয়া ডাকাত বইল্যা চেল্লাইতেই না ওরা সব ছাইড়া দৌড়াল। নয় কী হইত কে জানে। আর ওই শয়তান বরযাত্রীর পাল খুব ইনসাল্ট করতিছিল, তাই আমরা ওই মৌমাছির চাকখানায় আধলা ইট মাইরা একটু সমান কইরা দিচ্ছি।

হরিশবাবু এবার হাসিতে ফেটে পড়েন,—হাঃ হাঃ হাঃ—ওফ! তাই বল্! না তোমাদের বুদ্ধি তো সাংঘাতিক। তবে বুদ্ধিটা একটু বদ।

হোঁৎকাও হেসে বলে,—বদমাইসদের সিদা করতি বদবুদ্ধিই লাগে মেসোমশাই। ইট মারলে পাটকেল খাওনের লাগে।

পটলা ও রামছাগল

হঠাৎ ক'দিন ধরে পটলার পাত্তা নেই।

পটলা বেপাত্তা হওয়া মানে আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবেরও সমূহ বিপদ। কারণ ক্লাবের তাবৎ খরচা যোগায় ও। আর ওর নিপাত্তা হওয়ার খবরটা তামাম কুলেপাড়ায় চাউর হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যত পাওনাদার যথা ভজন ঝালমুড়িওলা, এতোয়ারি কুলপি মালাইওলা, ফুচকা-আলুকাবলিওয়ালা বুধন এসে হাজির তাদের পাওনার ফর্দ নিয়ে। ওদিকে রাসমণি বাজারের পথও ছাড়তে হয়েছে! ওখানে ওত পেতে আছে মদন কেবিনের মালিক মদন ধাড়া, একেবারে যাচ্ছেতাই লোক।

সেদিন হোঁৎকাকে ধরে শাসিয়েছে—চা মামলেট এন্তার খেয়ে গেছিস্ তার বাবদ তেরো টাকা ষাট পয়সা না দিলে গলায় গামছা দেবো এবার।

আর ভজন ঝালমুড়িওয়ালা রোজ সন্ধ্যায় খুঁজে পেতে ক্লাবের মাঠে এসে আমাদের শোনায়,—সাত টাকা বাকি না মিটোলে চোখে ঝাললঙ্কা ঠাঁইসা দিব।

অর্থাৎ ঘরে বাইরে অশান্তি। তবু পটলার দেখা নেই। মাঝে মাঝে ওর মাথায় পোকা নড়ে ওঠে, আর তারপরই এমনি একটা কাণ্ড বাধায় আমাদেরও বিপদে ফেলে।

হোঁৎকা বলে,—আর পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবে থাকুম না। রেজিকন্যাশন দিমু।

ফটিক বলে—তাই দে। আমিও ফলিডল খেয়ে জীবন নাশই করব। উঃ প্রেসওয়ালা ফাংশনের টিকিটের ছাপানোর টাকার জন্যে বাড়ি গিয়ে শাসাচ্ছে।

সামনে ফাংশন—তার জন্যও ইনভেস্ট হয়ে গেছে, ক্লাব ফান্ড ও শূন্য, পাড়ায় টেকা দেয়।

হোঁৎকা বলে,—হয় রেজিকনেশন নে, নয় আমাগোরই পটলার মত নিরুদ্দেশ হওয়ার লাগবো।

গোবরাই বলে,—চল, পটলার ঠাক্‌মা বার বার করে ডেকে পাঠাচ্ছে।

হোঁৎকা জানায়—পটলার কুন কেসে আমি আর নাই। ওগোর পুরা জালি কেস।

তবু না গিয়ে পারিনি।

পটলাদের বিরাট বাড়ি, বাগান। ওদিকের ড্রইংরুমে তখন পটলার বাবা-কাকাদের কি জরুরি আলোচনা চলেছে।

ওদিকে না গিয়ে বাগানের পাশে মন্দিরের চাতালেই গেলাম, পটলার ঠাক্‌মা সন্ধ্যার পর ওখানে বসে মালা জপ করে।

বুড়ি আমাদের সত্যিই ভালোবাসে, কারণ জানে যে পটলার বিপদে আমরাই বহুবার জান দিয়ে লড়ে তাকে উদ্ধার করেছি। ঠাক্‌মা তাই দায়ে অদায়ে আমাদের ক্লাবকেও বেশ টাকাকড়ি দেয়। বুড়ির নাকি অঢেল টাকা। আর ছেলেরা তো দুহাতে পয়সা রোজগার করে নানান ব্যবসা থেকে।

বইঘর.কম

আমাদের পথ চেয়েই যেন বসেছিল ঠাক্‌মা। বলেন,—এসেছিস! প্রসাদ নে। তারপর কথা হবে।

লুচি গাওয়া ঘিয়ের হালুয়া আর কালাকাঁদ। বেশি পরিমাণেই দেয়, বেশ আরাম করে খেয়ে জল খেতে দেহে মনে কিছুটা বল-ভরসা আসে। হোঁৎকা বলে,—পটলার পাত্তা পাইলেন?

ফটিক বলে—কোথায় যে গেল?

ঠাক্‌মা বলেন,—তাই বলার জন্যেই ডেকেছি। পটলার নীতি-বিবেক জাগ্রত করার জন্য আমার ছোট ছেলেই ওর গুরুদেব, কি যেন একশো আট ঘটেশ্বর বাবার আশ্রমে, পাঠিয়েছে তাকে। বেচারা সেখানে পড়ে আছে রে—

অর্থাৎ পটলাকে চালান করা হয়েছে কৌশলে।

হোঁৎকা বলে—সেকি! তা আশ্রম খান্ কোথায়?

—সে অনেক দূরের পথ। বাসুদেবপুর ইস্টিশানে নেমে বাসে করে চারকোশ পথ গিয়ে কোন নদী, বনের ধারে। শুনেছি সেই সাধুবাবা নাকি বিরাট তান্ত্রিক। মানুষকে ভেড়া, ছাগল করে রাখে। কে জানে পটলাকে কি করে রেখেছে। বাছা আমার সেই যে গেছে আর ফিরল না রে। কেমন আছে কে জানে।

ভাবনার কথা। শোনাই,—একবার গিয়ে খবর আনব?

ঠাক্‌মা বলে—খবর কি রে, তাকেই আনতে হবে। যা খরচা লাগে নিয়ে যাবি, তোরাই এখন ভরসা রে। একটা ছেলে একটু না হয় বেয়াড়া তাই বলে এই তান্ত্রিকের খপ্পরে পাঠাবে, তাকে বেড়াতে পাঠাবার নাম করে।

ভাবছি আমরা। হোঁৎকার উর্বর মস্তিষ্কে এবার অ্যাকশন শুরু হয়েছে। গোবরার দেহটা বিরাট, সে তো লড়ার জন্য ছটফট করে। হোঁৎকা বলে, হইব ঠাক্‌মা, পটলার 'রেসকিউ' মানে ইংরাজিতে যারে কয় 'উদ্ধার' তাই কইরা আনুম।

জোর মিটিং বসেছে ক্লাবে। হোঁৎকা এর মধ্যে ঠাক্‌মার কাছ থেকে ক্লিন পাঁচশো টাকা এনেছে, তার থেকে ভজন, এতোয়ারি—বুধন মায় মদন কেবিনের মদন ধাড়ার তেরো টাকা ষাট পয়সা কুল্যে বাষট্টি টাকা দেনা ফেলে দিয়ে সদর্পে ঘোষণা করেছে,—পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব কারো এক কানা-কড়িও বাকি রাখে না বুঝলা? যে যার টাকা বুইঝা লও।

এবার প্ল্যান ভাবা হচ্ছে। ফটিক এর মধ্যে খবর এনেছে ওর মাসিমার বাড়ির কাছেই নাকি একশো আট ঘটেশ্বর বাবার 'সিদ্ধাশ্রম', জায়গা দুর্গম—বন নদী এসব ব্যাপারও আছে আর ওই ঘটেশ্বর বাবা নাকি ওই এলাকার একটি বিরাট প্রতাপশালী ব্যক্তি।

ভয় হয়। বলি,—ওর সঙ্গে টক্কর দিতে পারবি? শেষকালে যদি—

হোঁৎকা গর্জে ওঠে,—কী আর হইব? ছাগল তো তুই হইয়াই আছস! কাওয়ার্ড!

গোবরা বলে,—কারেকট! তাই দেখে আসি তাকে। পটলাকে রেসকিউ করবোই।

পটলার জন্য কতবার পটল তুলতে তুলতে বেঁচে গেছি। তাই এবারও ওদের চাপে রাজি হতে হল। হোঁৎকা বলে,—কালই বাইর হইতে লাগবো। শুভস্য শীঘ্রম!

বাসুদেবপুর স্টেশনটা নেহাৎই ছোট। স্টেশনঘরের লাগোয়া একটু টিনের শেড। ওটাই যাত্রীদের ওয়েটিং রুম। বেলা এগারোটা বাইশের লোকালে নেমে দেখি রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, বাসও নেই। স্টেশনের বাইরে মাঠের ধারে একটা বটগাছের নীচে চায়ের দোকান। বাঁশের

মাচাটা তখন প্রায় খালি, খদ্দেরপত্র বিশেষ নেই, দোকানদার চায়ের উনুন নিভিয়ে ঘরে যাবে, আমাদের দেখে চাইল। সেইই জানায়,—বাস তো আবার বিকাল চারটেয়।

গোবরা শুধায়,—ঘটেশ্বর বাবার আশ্রমে যাব, কতদূর পথ?

লোকটা বলে,—তা কোশ চারেক তো নকীপুর হাট, সেখান থেকেও ধরেন কোশটাক। তা বাসে গেলেও সন্ধে রাত, এখন হেঁটে গেলেও তাই।

হোঁৎকা বলে,—হাইটাই চল্। এহানে খাবারও কিছুই মিলবো না।

পটলার জন্যে নয়, পেটের ধান্ধাতেই হাঁটা শুরু করেছি।

নকীপুর হাটতলায় পৌঁছলাম, তখন বিকেল হয় হয়। সারা পথে খাবার দোকান কিছুই নেই, ধু ধু মাঠ আর ছোট্ট জনবসতি।

হাটতলায় একটা দোকানের বেঞ্চে বসে স্রেফ মুড়ি, ঠান্ডা আলুর চপ আর কয়েকটা করে রসগোল্লা খেয়ে তবে ধড়ে প্রাণ আসে।

এবার শুধোই দোকানদারকে,—ঘটেশ্বর বাবার আশ্রম যাব কোনদিকে? দোকানদার ঘুরে তাকায়, কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

চন্দননগর থেকে—গোবরা আসল ব্যাপারটা জানায় না।

দোকানদার বলে,—তা ওই আশ্রমে বাপু, সন্ধ্যার পর না যাওয়াই ভালো। মানে শ্মশানের কাছে কিনা, আর সাধুবাবা তো ভূত-প্রেত নিয়েই থাকে।

ফটিক বলে,—মন্ত্রের চোটে নাকি মানুষদের ছাগল ভেড়া বানিয়ে দেয়?

দোকানদার বলে,—ওসব ঠিক জানি না বাপু। তবে লোকে বলে-টলে। তা রাতে ওখানে না যেয়ে এখানে ইস্কুলেই থাকেন। যেতে হয়, সকালেই যাবেন।

হোঁৎকা তবু বলে—মনে হয় কেস গড়বড়। কুইক অ্যাকশনই করনের লাগবো, চল গিয়া।

রাত হয়ে গেছে। গ্রামও নিশুতি হয়ে গেছে। গ্রামের বাইরে আরও বেশ খানিকটা ডাঙ্গা, বনখেজুরের ঝোপ,—দু'একটা ছড়ানো ছিটানো মহুয়া শালগাছের জটলা, তারপরই শুরু হয়েছে বনের সীমানা। পথও তেমন কিছু নেই এদিকে।

বলি,—এ কোথায় এলাম রে? এ যে শালবনের শুরু। কোথায় তোর ঘটেশ্বরবাবার আশ্রম?

হোঁৎকা বলে—এই তো পথ। চল্।

পিচ ঢালা পথ নয়,—লাল কাঁকর মোরাম বিছানো পথ। পথটা এবার বনের মধ্যে ঢুকেছে, দুদিকে ঘন শালবন—বেশ কিছুটা গিয়ে অজয় নদীর বিস্তার।

ওদিকে অন্ধকারে মাথা তুলে আছে বেশ কয়েকটা বাড়ি, মন্দিরের চুড়োও দেখা যায়। দূরে দু'একটা বাতি জ্বলছে, সামনে একটা শেডমত, লোকজন বিশেষ নেই। অন্ধকারে ঠাওরও হয় না। সকাল থেকে শরীরের উপর ধকলই চলেছে।

বলি,—এই চাতালেই শুয়ে পড়। কাল সকালে দেখা হবে। হোঁৎকা ততক্ষণে টানটান হয়ে শুয়ে পড়েছে।

রাত কত ঠিক জানি না, হঠাৎ একটা ধাক্কায় জেগে উঠলাম, কে যেন কোমরে প্রচণ্ড ধাক্কা কসেছে। অন্ধকারে দেখি, একটা বিরাট ছাগল এসে আমাকে গোঁত্তা মেরে ঠেলে তুলে দিয়ে আমার জায়গাটায় বসে দাড়ি নেড়ে জাবর কাটছে নির্বিকার ঋষির মতই।

ততক্ষণে গোবরা ধড়মড় করে উঠেছে,—এঃ! ভিজিয়ে দিল সর্বাঙ্গ! কি রে?

বুঝলাম, হতভাগাটা তার আগে জলত্যাগও করেছে গোবরার গায়ে।

বলি,—সরে আয় গোবরা, ওকে ঘাঁটাস নে। ব্যাটা গুঁতিয়ে দেবে। যা শিং দেখেছিস?

গোবরা বলে,—উঃ, পটলার জন্যে আর কত সইতে হবে র‍্যা? পটলাকে পেলে—

হঠাৎ দেখি, বিরাট পাঁঠা ছাগলটা উঠে দাড়ি নেড়ে সংস্কৃত স্যারের মত মিহি গলায় সাড়া দেয়,—ব্যা—ব্যা—

আর উঠে এসে গোবরার মুখের কাছে সদাড়ি মুখ নিয়ে চাইতে থাকে। গোবরা হঠাৎ চমকে ওঠে,—ওরে সমী এ ছাগল নয়রে? পটলাই।

ছাগলটা এবারও সাড়া দেয়,—ব্যা—ব্যা!

—অর্থাৎ হ্যাঁই বলছে রে!

মনে পড়ে যায়, ঘটেশ্বর বাবা নাকি লোকজনদের মন্ত্র পড়ে ছাগল ভেড়া বানিয়ে রাখে। আর্তনাদ করে উঠি,—পাঁঠার চোখ দুটো দ্যাখ্, একদম পটলার চোখ।

পটলার নাম শুনে ছাগলটাও গদগদ হয়ে সাড়া দেয়,—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

গোবরা ঠেলে তোলে হোঁৎকা, ফটিককে। হোঁৎকা ঘুম চোখে বলে,—কি হইছে?

গোবরা বলে, পটলাকে পেয়েছি।

এ্যাঁ,—হোঁৎকা শুধায় ঃ কোথায় পটলা? ওরে ফিনিস্ করুম্।

গোবরা করুণকণ্ঠে বলে,—ওকে ঘটেশ্বরবাবাই ফিনিস্ করেছে রে? ওই তো পটলা! ওকে আস্ত রামছাগল বানিয়েছে দ্যাখ্?

পটলার নবরূপ দেখে হোঁৎকা থ।

হোঁৎকা এ হেন আদরে ভেঙে পড়ে।

—হালায় ঘটেশ্বর, তার ছাগল বানাইল পটলা? ওরে শ্যাষ করুম!

কিন্তু সে তো পরের কথা। এখন ছাগলরূপী পটলাকেই উদ্ধার করতে হবে। শুধোই, —উদ্ধার তো করলি কিন্তু ছাগল থেকে ওকে আবার পটলায় পরিণত করবি কী করে? মন্তর তো জানা নেই।

হুঁ। —হোঁৎকা ভাবিতভাবে বলে ঃ সংস্কৃত স্যার অনেক মন্তর জানেন তেনারেই দেখাবো। তাতে কাম না হয় হালায় দলবল লইয়া আসুম, তর ঘটেশ্বর বাবাকে তুইলা লইয়া যামু।

এ মন্দ যুক্তি নয়। তাই বলি,—তাহলে ভোর হবার আগেই ছাগলটাকে নিয়ে প্রথম পালাতে হবে। রাতারাতি পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে সকালের গাড়িতেই উঠে কলকাতা যেতে হবে।

তখনও বেশ রাত রয়েছে। চারিদিক নীরব নির্জন।

আমরা ছাগলটাকে একটা দড়িতে বেঁধে হাঁটছি। গোবরা পথের ধারে কাঁঠালগাছ থেকে বেশ এক বোঝা পাতা ভেঙেছে। ছাগলরূপী পটলা এন্তার পাতা চিবুচ্ছে আর দিব্যি চলেছে আমাদের সঙ্গে।

হোঁৎকা বলে,—জল্‌দি চল। হালা ঘটেশ্বর জানতি পারলে আমাগোর পঞ্চপাণ্ডবগো পাঁচখান ছাগল বানাইয়া ছাড়ব।

বইঘর.কম

ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছি মাঠ ঘাট ভেঙে স্টেশানের দিকে। যখন ভোর হয় হয়, স্টেশনের ধারে বটতলায় এসে দাঁড়ালাম। চা-ওয়ালা দেখছে আমাদের। কাল দুপুরে খালি হাতে দেখেছিল আমাদের। আজ ভোরে এক রামছাগলসহ দেখে বলে,—কিনলেন ছাগলটা?

গোবরা বলে,—হ্যাঁ। চা বানাও। কলকাতার গাড়ি কখন আসবে ভাই?

দোকানদার চায়ের গেলাসে চামচ নাড়তে নাড়তে বলে,—এসে পড়বে এবার। তা ছাগলটার কেজি পনেরো মাংস হবে। কত নিল?

হোঁৎকা অনেক কষ্টে রাগ সামলে বলে,—সত্তর টাকা।

—একশো টাকা দিব। দ্যান—তাহলে ভাগ্না লাগিয়ে দিই কেটে।

হঠাৎ দেখা যায় ছাগলরূপী পটলা এই ফাঁকে ঝপ্ করে সামনের দু'পা তুলে দোকানীর লেড়ো বিস্কুটের ঠোঙাতেই সদাড়ি মুখ ঢুকিয়েছে। দু-তিনটে বিস্কুট মুখে পুরতেই দোকানদার লাফ দিয়ে তেড়ে আসে ছাগলের দিকে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ছাগলরূপী পটলা সামনের দু'পা তুলে হোল্ বডি ওয়েট দিয়ে দোকানদারের হাঁটুতেই এইসা একখান ঝেড়েছে যে বেচারা ছিটকে গিয়ে পড়েছে মাচায়।

দোকানদারকে কিছু পয়সা দিয়ে থামালাম, দেখি দূরে ট্রেন আসছে।

ঠাক্মা তখন মন্দিরে বসে মালা জপছিলেন।

হঠাৎ আমাদের ট্যাক্সি নিয়ে বাগান পার হয়ে মন্দিরের সামনে গিয়ে নামতে দেখে বুড়ি চোখ বড় বড় করে আশা ভরে এগিয়ে আসেন। ব্যাকুল কণ্ঠে শুধোন,—পেয়েছিস পটলাকে?

হোঁৎকা একদম বিষণ্ণতার পোজ নিয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে,—পাইছি ঠাক্মা। তয় ওই ঘটেশ্বর বাবা ওর সর্বনাশ কইরা ছাড়ছে।

—এ্যাঁ! কেমন আছে আমার পটল?

জানাই—ভালোই আছে ঠাক্মা?

তবে?—ঠাক্মা আর্তনাদ করে, তবে যে বললি সর্বনাশ! কোথায় সে?

হোঁৎকা বলে,—পটলারে ঘটেশ্বর বাবা ছাগলে ট্রান্সফার করছে ঠাক্মা। ওই যে। দ্যাখেন ওর রূপখান্।

এ্যাঁ—চমকে ওঠে ঠাক্মা।

আর ছাগলরূপী পটলা ততক্ষণে এসে হাজির হয়েছে ঠাক্মার কাছে, সদাড়ি মুখ তুলে দেখছে ঠাক্মাকে বিস্মিত চাহনি মেলে, আর ঠাক্মাও ততক্ষণে ওর দাড়ি সমেত মুখ দিয়ে দুহাতে নিজের গালে চেপে ধরে হাউ-মাউ করে ওঠেন,—ওরে পটলারে? তোরে একি হাল করেছে রে। ও বাবা সোনার চাঁদ আমার, ওরে কে কোথায় আছিস এসে দ্যাখ্ রে, আমার পটলার এ কি হাল করেছে।

সে এক দৃশ্য। ওনার চিৎকারে পটলার বাবা-মা, মেজকাকাও দৌড়ে আসেন। দারোয়ান, পূজারীও এসে পড়ে, পটলার নবকলেবর দেখে ওর মাও চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিলেন, অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছি আমরা।

এমন সময় আবার একটা ট্যাক্সি এসে থামল! চমকে উঠলাম, একি? ওকে?

পটলা সশরীরে নামছে, সঙ্গে এক গেরুয়াবসনধারী সাধু। পটলা ঠাক্‌মাকে ইয়া এক রামপাঁঠাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে দেখে দারুণ অবাক হয়ে একবার সেদিকে একবার আমাদেরকে দেখে।

—ঠাকুমা! মা! এসব কি?

ঠাক্‌মা পটলাকে দেখে যে বিশ্বাস করতে পারেন না। সেই বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে এবার তার রিয়েল হারানিধিকে বুকে জড়িয়ে ধরেন,—এসেছিস ভাই! তোকে নাকি ছাগলে টেরানস্‌ফার করেছে ঘটেশ্বর বা।

সাধুমহারাজ হেসে ওঠে, সেকি গো! তাই বলে মানুষ পটলাকে ধরে আনতে গে আশ্রমের রামছাগল পটলাকে তুলে আনলে রাতারাতি। কিরে পটল?

রামছাগলটা এবার স্বামীজির কাছে গিয়ে দাঁড়াল দু'পা তুলে।

আমাদের অবস্থা তখন কাহিল। পটলা বলে,—খ্‌-খুব বুদ্ধি যা হোক ত তোদের? এ্যাঁ—এসব ভাবলি কি করে ব-বলতো? ত্‌-তোফা আরামে ছিলাম। আশ্রমে, আজ ফিরেছি আর ক-কাল রাতে তোরা যে ছাগল তুলে আনলি আমি ভেবে? এ্যাঁ।

স্বামীজি দেখছেন আমাদের, হাসছেনও। ঠাক্‌মাও। হোঁৎকার সব বুদ্ধি যেন বরবাদ হয়ে গেছে। বলে সে,—চল্‌ গিয়া। ঠাক্‌মা, পটলারে ছাগল ভাইবা 'মিসটেক' করছি। তয় ছাগলের নাম পটলা জানুম ক্যামন কইর‍্যা?

গুরুদেব বলে—আর ওই ছাগল পটলকে তোমাদেরই পৌঁছে দিতে হবে, সেইসঙ্গে দুদিন বেড়িয়ে আসবে। ভয় নেই, তোমাদের ছাগলে ট্রান্সফার করব না।

পটলার মেজকাকা মুখ বেঁকিয়ে বলে ওঠেন,—আর ট্রান্সফার ওদের করবেন কি? ওরা তো অলরেডি ছাগলে ট্রান্সফার হয়েই গেছে। উঃ, কী করে ভাবলি এসব বলত? ধেড়ে ছাগল কোথাকার!

পিকনিক

হোঁৎকা বেশ গম্ভীরভাবে বলে, নাঃ, এবার পিকনিক হইব না।

কথাটা শুনে আমরা তো হতবাক। পটলার বাক্যি অবশ্য মাঝে মাঝে থমকে যায়, কারণ তার জিবটা বিনা নোটিশে আলটাকরায় আটকে যায়। এ হেন পটলাও বলে, ক-কেন হবে না পিকনিক, বল?

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের বাৎসরিক ক্লাবের জন্মের আগে থেকেই হয়ে আসছে। অবশ্য আমাদের ক্লাবের মেম্বার এই পাঁচজনই—হোঁৎকা, পটলা, গোবর্ধন, ফটিক আর এই অধম। আমরা পিকনিকে গিয়েই প্রতিষ্ঠা করি এই ক্লাব। সুতরাং এবার পিকনিক হবে না শুনে ঘাবড়ে গেছি। হোঁৎকা এবারের কোষাধ্যক্ষ। অবশ্য কোষাগারে টাকা কখনই থাকে না। আমরা, পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের সভ্যরা, দিন আনি দিন খাই। আর পটলাই সেটা মূলত আনয়ন করে। হোঁৎকা বলে দেশজ ভাষায়, ফন্ডে ট্যাকা নাই! পিকনিক হইব ক্যামনে?

গোবর্ধনের মামার পাইকেরি কুমড়ো, চালকুমড়ো আর গুড়ের আড়ত। পটলার বাবা কাকার মত দু'হাতে আমদানি তার নেই, তবু গোবর্ধন মামার ওনলি ভাগ্নে। গোবর্ধন বলে, কুমড়া, নলেন গুড় যা লাগে দেব।

হোঁৎকা বলে, কুমড়া সিদ্ধ গুড় দিই খাই পিকনিক হইব? স্রেফ কুমড়ো? কুমড়ো বিচ্যা তরও কুমড়োমার্কা বুদ্ধি হইছে দেহি। মিনিমাম দেড় হাজার টাকা চাই পিকনিকে। ওই ম্যাটাডোর ভ্যান ভাড়া নিব আটশো টাকা, কই পামু?

পটলাই আমাদের বিপদতারণ। সে বলে, ট-টাকার ব্যবস্থা হবে। গাড়ি? মা-ম্যাটাডোর?

ফটিক আমাদের ক্লাবের মধ্যে শিল্পী মানুষ। কালোয়াতি গান গায়, এর মধ্যে দু'চারটে গানের টুইশানিও ধরেছে। ফটিকই বলে, ম্যাটাডোর ভ্যান হয়ে যাবে। আমার ছাত্রীর বাবা ওই সিমেন্টের আড়তদার ভুজঙ্গবাবুর একটা ভ্যান আছে, তেল মবিল দিলেই মিলবে।

পয়সার ব্যবস্থা, গাড়ির ব্যবস্থা হতে দেখে এবার হোঁৎকা বলে, তয় চল। কিন্তু কবজিভোর মাংস চাই, নালি হোঁৎকা তগোর এই বাঁধাকপির ঘ্যাট আর মুলো চচ্চড়ি খাতি যাইব না। মাংস উইথ দই-সন্দেশ।

আমি বলে উঠি, এত জুটবে কী করে?

তাহলে আমি নাই। তরাই যা গিয়া। হোঁৎকা জানিয়ে দেয়।

হোঁৎকা ছাড়া পিকনিক ভাবা যায় না। বাজার করা, ওখানে গিয়ে টিফিন দেওয়া, রান্না করা সব ওই-ই করে। অবশ্য খায় একা তিনজনের খাবার, কিন্তু তবু ওকে চাই-ই।

পটলা বলে, ত-তাই হবে।

আমরা সমস্বরে জয়ধ্বনি দিই, থ্রি চিয়ার্স ফর পটলা...

ট্যাঙ্কে পেট্রোল ঢাললেই যেমন অচল গাড়িও চালু হয়, তেমনি টাকা আসতেই হোঁৎকা এবার চালু হয়। এর মধ্যে পিকনিকের জায়গাও ঠিক হয়ে গেছে। ওদিকে কানা দামোদরের ধারে গোবরার মামার বিরাট চাষবাড়ি, সেখানে কুমড়োর চাষই প্রধান। এ ছাড়াও অন্য ফল ফসলও হয়, আর বাগানঘেরা একটা বাড়িও আছে। সেটাতে বিশেষ কেউ থাকে না। তবে জল-কল-বিজলি এসব আছে। রান্নার উনুনও মিলবে। কাজের লোক আছে। সকালে গিয়ে সন্ধ্যার পর ফেরাও যাবে। পিকনিকের একেবারে নাকি আদর্শ নিরিবিলি জায়গা। ওখানেই যাব। ফটিক এসে জানায় ম্যাটাডোরও মিলে গেছে।

হোঁৎকা তখন বাজারের ফর্দ নিয়ে বসেছে। মুরগির মাংস নেওয়া হবে এখান থেকেই। তরিতরকারি, তেল-মশলা, দই-সন্দেশ, মায় ব্রেকফাস্টের ডিম সেদ্ধ-টোস্ট-কলাও রেডি করে নিতে হবে।

হোঁৎকা এসব ভালোই বোঝে। নিজের চাই সবই তিন গুণ পরিমাণে। হোঁৎকা একজন নয়—হিসেবে তিনজন, সেই মত সব নিতে হয়।

খুব সকালেই ক্লাবে এসে জুটেছি, তখনও সূর্য ওঠেনি। হোঁৎকা গজেনকে নিয়ে তার মালপত্র—টিফিন, লাঞ্চের জিনিস, মাটির ভাঁড় মাংস খাবার জন্য, প্লাস্টিকের গ্লাস, বঁটি, শালপাতা সব হিসাব মত রেডি করছে। ঘড়ি দেখে পটলা বলে, এখনও ফ-ফটিক গাড়ি নে এল না?

গোবর্ধনও এসে হাজির উইথ্ দুটো নধর কুমড়ো। হোঁৎকা বলে, সক্কালেই 'কুমড়ো' যাত্রা—

গোবরা বলে, কুমড়ো অযাত্রা নয়, অযাত্রা তোর ওই ডিম-কলা। এগুলো সামনে থেকে ওঠা।

হোঁৎকা কি জবাব দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফটিককে গাড়ি নিয়ে আসতে দেখে চাইলাম। ফটিক সেই ভুজঙ্গবাবুর একটা মাল-বওয়া খোলা ম্যাটাডোর ভ্যানই এনেছে।

বলি, বসার জায়গা নেই, ভ্যানের মেঝেতে বসে যেতে হবে?

গোবরা বলে, শীতকাল, ফেরার সময় যে জমে বরফ হয়ে যাব রে!

পটলা বলে, ঠি-ঠিক কথা।

হোঁৎকা খাবার-দাবার দেখে বেশি উৎসাহী হয়ে পড়েছে। তবে এর মধ্যে কিছু 'ম্যানেজও' হয়েছে। মাংসও নিয়েছে বেশি করে, দই-সন্দেশও। হোঁৎকা বলে, বেলা হই গ্যাছে, এহন রোদে যাবি। সকাল সকাল ফিরতি পারলি ঠান্ডা লাগবো না। চল।

ভ্যানটায় ভুজঙ্গবাবু সিমেন্ট আনা নেওয়া করে, ফলে ভ্যানে বেশ খানিক সিমেন্ট পড়ে আছে। আশপাশের খাঁজেও সিমেন্ট পুরু হয়ে লেগে আছে। হোঁৎকা ততক্ষণে ওর ওপরই ডেকোরেটারের শতরঞ্জি পেতে মালপত্র তুলেছে। কড়াই-হাঁড়ি-হাতা-বালতি-কাঠ-তেল-সবজি সহ উঠেছে গাড়িতে। তারপর উঠেছি আমরা। ভ্যান চালু হয়।

কলকাতা ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূরে গিয়ে, জি-টি রোড ছেড়ে এবার বাবার রাস্তায় চলেছি অর্থাৎ তারকেশ্বর যাবার পথ ধরে চলেছি আমরা। দু'দিকে ঘন সবুজ কলাবন-বাগান-ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে ফুলকপি বাঁধাকপির ক্ষেতও রয়েছে, দু'-একটা গ্রাম-বসতও পড়ে।

হোঁৎকা এর মধ্যে পথের ধারে গাড়ি থামিয়ে মেম্বারদের চায়ের দোকান থেকে চা-বিস্কুট

বইঘর.কম
খাইয়েছে। বলে, মেন টিফিন খাবি ক্যাম্পে গিয়া, এহন চা-বিস্কুট খাই ল। আর কতদূর রে গোবরা হেই তর মামার বাড়ি?

গোবরা বলে, আর বড়জোর ঘণ্টা খানেকের পথ।

ভ্যান চলেছে ভাঙা রাস্তা ধরে নাচতে নাচতে। আমরা আনন্দে ভ্যানের মেঝেতে শতরঞ্জিতে বসেই কুলোয় গম আছড়ানোর মত নাচন-কোঁদন করছি। ফটিক কালোয়াতি গান গেয়ে চলেছে—মেরে সঁইয়া না ছোড় মোর—

অবশ্য গানটা সে শুরু করেছে দক্ষিণেশ্বর ব্রিজ থেকে ঘণ্টা দেড়েক আগে। এখনও সঁইয়াকে নিয়ে লোফালুফি করে চলেছে, চলবে শেষ তক।

হোঁৎকা দুটো কলা ম্যানেজ করে কামড়াচ্ছে খোসা ছাড়িয়ে। এমন সময় ঘটনাটা ঘটে যায়। ঘটনা নয়, দুর্ঘটনাই।

কোনো গ্রামের মধ্য দিয়ে রাস্তাটা—দু'দিকে মাটির বাড়ি। কোনোটা দাঁড়িয়ে আছে, কোনোটার চালচুলো নেই, দু'-একটা জরাজীর্ণ গরু বাঁধা, পচা ডোবায় হাঁস চরছে, পথের ধারেই আধনেংটা ছেলে-বাচ্চারা ঘুরছে আর মুরগির পাল চরছে। হঠাৎ ভ্যানটাকে দেখে ক'টা মুরগি ডানা ঝাপটে এদিকে ওদিকে উড়ে যাচ্ছে, এইভাবে চলছিল। এবার একটা মুরগি উড়ে পালাতে গিয়ে এসে পড়েছে আমাদের ওই নৃত্যরত ভ্যানের চাকার নিচেই। মুরগিটার ওপর দিয়েই ভ্যানটা চলে যায় কিছু বোঝার আগেই। আর তক্ষুণিই ওই গ্রামের আকাশ-বাতাসে এত বড় সর্বনাশা দুর্ঘটনার খবরটা বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়ে। কারা যেন নির্জন গ্রামের মাটি ফুঁড়ে উঠে পড়ে আর হৈ হৈ করে এসে ভ্যানটার সামনে রীতিমত খবরের কাগজে দেখা নেতাদের মত মানবশৃঙ্খল রচনা করে ধাবমান ভ্যানটাকে ধরে ফেলে।

ধর—ধর ওদের, যেন পালাতি না পারে।

আমরাও এবার নেমেছি ভ্যান থেকে। এর মধ্যে এদিক ওদিক থেকে আরও বেশ কিছু লোকজন মেয়েছেলে কৌতূহলী বাচ্চার দল এসে পড়ে। তারস্বরে কান্নার আওয়াজ ওঠে। রাস্তার ওপর মৃত এইটুকু মুরগির জন্যে বুক চাপড়ে কান্না জুড়েছে কোনো মহিলা। একজন শীর্ণ গামছাপরা লোক ক্ষেত থেকে এসে এবার গর্জে ওঠে, আমার মুরগি মেরেছ?

কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই, বলি, চাকার তলে এসে পড়ল, ঘটে গেছে ব্যাপারটা। তা মুরগির জন্য কিছু টাকা দিচ্ছি আমরা। বাচ্চা মুরগি—ধরো ভাই, পঞ্চাশ টাকাই দিচ্ছি। ইচ্ছে করে তো ঘটাইনি এটা।

লোকটা দেখছে টাকাগুলো। এইটুন মুরগির জন্য নগদ পঞ্চাশ টাকা সে আশা করেনি। বৌটাও কান্না ছেড়ে এসে পড়েছে, টাকা দেখে মুরগির শোক ভুলেছে সে। টাকা দিয়ে আমরা বের হতে চাই এখান থেকে।

টাকাটা নিতে যাবে লোকটা, হঠাৎ ভিড় ঠেলে এবার এসে উদয় হয় গোলগাল প্যান্টপরা একটা লোক। সে বলে, টাকা নিবি না গোকুল।

লোকটা থেমে যায়। সেই মূর্তি আমাদের ভ্যানে মালপত্র দেখে বলে, গরিবের সর্বনাশ করে নিজেরা আনন্দে পিকনিক করতে যাবেন? কারো সব্বোনাশ কারো পৌষ মাস! তা হবে না মশায়। শহুরে বাবুদের হাড়ে হাড়ে চিনি। গরিবকে কত আর ঠকাবেন?

জানাই, ঠকাবো কেন? মুরগির দাম তো দিচ্ছি ভাই। পাঁচ-সাতশো গ্রাম মুরগির জন্য পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি। মুরগিটাও ওদের রইল, খেতে পারবেন।

লোকটা এবার বলে, একটা মুরগি বেঁচে থাকলে কত ডিম দিত জানেন? নিদেন দুশো। তার থেকে অন্তত পঞ্চাশটা মুরগির বাচ্চা বের হত। পঞ্চাশটা মুরগি থেকে কত ডিম, কত বাচ্চা হত, কত তার দাম, সেদিকে না ভেবে ওকে ভালো মানুষ পেয়ে পঞ্চাশ টাকা ধরিয়ে দিয়ে কেটে পড়ছিলেন, ঠকাননি?

ওর হিসাব এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দেখে এবার প্রমাদ গনি। লোকটার ওই অপূর্ব হিসাব এবার মুরগির মালিক-মালকিন তৎসহ গ্রামবাসীরাও মেনে নেয়, ঠিক বলেছিস পাঁচু!

সেই পরোপকারী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা তরুণের নাম যে পাঁচু সেটা বুঝে বলি, ঠিক আছে, পঁচাত্তর টাকাই দিচ্ছি ওকে।

এবার সদ্যজ্ঞানপ্রাপ্ত জনতাও ওই হিসাব বুঝে বলে, না—ওতে হবে না।

লোকজনের সমাগম আরও বাড়ছে। ভ্যানটাকে তারা ঘিরে ফেলেছে, নীচে আমরা ক'টি অসহায় প্রাণী। গোবরা বলে, মুরগির একটা বাচ্চা চাপা দিয়ে এত ঝামেলা?

পাঁচু বলে, দেশে আইন নেই ভেবেছেন? হাজার টাকা দিতে হবে, তবেই ছাড়ব ভ্যান।

হাজার টাকা! কন কি রে মুশয়? হোঁৎকা ঢোঁক গেলে।

এত টাকা আমাদের কাছে নেই। তাই জানাই, এত টাকা কোথায় পাব?

কে ধমকে ওঠে, ফুর্তি করতে বেইরেছেন, ট্যাকা নাই বললে তো ছাড়ব না! ওরে প্রধানমশাইয়ের কাছে নে চল এদের।

অর্থাৎ এবার আরও কঠিন পাল্লাতেই পড়ব। মিনতি করে বলি, ঘটনাটা ঘটে গেছে, শ'খানেক টাকা আছে সঙ্গে, তাই নিয়ে ছেড়ে দিন ভাই। কিন্তু তখন ব্যাপারটা আমজনতার হাতে চলে গেছে। এমন বিনি পয়সায় মজার খোরাক পেয়ে তারাও মেতে উঠেছে। সকলেই রায় দেয়, তাই নে চল ওদের।

হোঁৎকা কি বলতে যায়। একজন গর্জে ওঠে, এ গাঁয়ে ট্যাঁ ফু চলবে না, নাম জানো আমাদের গাঁয়ের? এ গাঁয়ের নাম ঠান্ডাপুর, ডাণ্ডা মেরে ঠান্ডা করে দেবো। কে শোনায়—আজ মুরগি মেরে পালাবে, কাল এসে মানুষ মারবে? এসব চলবে না। চলো। অ্যাই ভ্যানটাও নে চল ওখানে।

মেঠো পথ ধরে ভ্যানটাকে নিয়ে চলেছে তারা হৈ হৈ করে। ওতে পাঁউরুটি-কলা-ডিমসেদ্ধ-সন্দেশ, ওপাশে চাল-ডাল-সবজি-মাংস, দই-সন্দেশের হাঁড়ি, প্যাকেট সব রয়েছে। কে যেন বলে ওঠে, কত খাবার রে বাবা!

প্রধানের বাড়ি অবধি ভ্যান যায় না, সামনের পুকুরপাড়ে একটা ঝাঁকড়া আমগাছের নীচে মালসমেত ভ্যানটাকে রেখে আমাদের নিয়ে গেল পুকুরের ওদিকে প্রধানের বাড়ি-কাম-অফিসের সামনে।

আজ রবিবার, অফিস ছুটি। প্রধানও বাড়িতে নেই। বেশ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। বিরাট বাড়ি। ওদিকের গোয়ালে বেশ কয়েকটা নধর বলদ আর জার্সি গাই রয়েছে। বাড়ির লাগোয়া বাগান। তারপর ঘন সবুজ আলুর ক্ষেত। খামারবাড়ির সামনে একটা ট্রাক্টরও রয়েছে অর্থাৎ পঞ্চায়েতের প্রধান বেশ ধনী ব্যক্তি।

কিন্তু তিনি নেই, গোলমাল শুনে বের হয়ে আসেন প্রধানের ভাইপো। ঝকঝকে লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরা, হাতে সিগ্রেট। তিনি সব শুনে গর্জে ওঠেন, মগের মুলুক পেয়েছেন? হাজার নয়, দুহাজার টাকা দিলে তবে ছাড়ব।

বইঘর.কম

অর্থাৎ মিটার আরও চাপছে। বলি, কোথায় পাব এত টাকা!

তিনিও গর্জে ওঠেন, না হলে আটকে রাখ ওদের। দিনভোর থাক এখানে, কাকা এলে থানায় পাঠাবেন।

দাওয়ায় বসে আছি আমরা, ওদিকে দেখি তখন ভ্যান থেকে কে আমাদের পাঁউরুটি-কলা -ডিমসেদ্ধ-সন্দেশ বের করে দু-চারজনকে দু-চার পিস দিয়ে, বাকি নিয়ে সরে পড়েছে। ওরা খাচ্ছে কলা-ডিম—এদিকে আমরা নীরবে দেখছি। খিদে-তেষ্টাও ভুলে গেছি। তবু মনে হয়, ডিম কলা নিয়েই যদি ছাড়ে ছাড়ুক। টিফিন না হয় নাই হবে তবু ছাড়া পাবো তো!

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

ঠায় বসে আছি ওই জনতার পাহারায়। প্রধানের ভাইপোমশায় এর মধ্যে বাড়ি থেকে স্নান সেরে এসেছেন। আর দেখি বাগানের ওদিকে পুকুরপাড়ে গিয়ে মাংস-মালপত্র মায় কড়াই হাঁড়ি দেখে ভ্যান থেকে সব নামানোর কাজ সেরে এবার তিনিই মহা উৎসাহে গাছতলায় পিকনিকের আয়োজন করছেন।

এদিকে খিদেটা এবার জানান দিচ্ছে। বেলাও বাড়ছে। টিফিন তো সাফ, এখন ওদিকে বোধহয় ফুলকপির তরকারি চেপেছে।

হোঁৎকা চুপ করে বসে আছে। পটলা বলে, এখানে ক-কেন আনলি গো-গোবরা, ড-ডাকাতের দেশে, দি-দিনে ডাকাতি করে এরা।

ভাইপো এবার এদিকে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে বলেন, শ' পাঁচেক টাকা আমাকে দেন, আমি ছেড়ে দিচ্ছি আপনাদের। অর্থাৎ ওঁকেই প্রণামী দিতে হবে পাঁচশ টাকা।

জানাই, এত টাকা তো নেই, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে দেড়শ' মত আছে।

ভাইপো হেসে ওঠেন, ওতে হবে না, বসে থাকো, থানায় পাঠাব পরে।

বলি, তাহলে আমাদের খাবার-দাবার লুঠ করলেন কেন?

ভাইপো বলেন, ও তো পাবলিকে করছে, বলুন ওদের।

অর্থাৎ বলার কিছুই নাই। দেখছি এদিকে বসে ওই পাবলিকের গণভোজনের উৎসব। এবার মাংস চড়েছে, বাতাসে খোশবু ওঠে। বেশ লোকজনও জুটেছে, এ যেন তাদেরই পিকনিক চলেছে। এর মধ্যে কে আবার মাইক এনে হিন্দি গানও শুরু করেছে, কিছু উৎসাহী ছেলে বিনি পয়সার ভোজের গন্ধ পেয়ে নাচানাচিও করছে। পুকুরের ওপারে চলেছে আনন্দের হাট, এপারে আমরা ক'জন বসে আছি। এদের লোকজন পাহারা তোলেনি। হাজার, দু'হাজার টাকার আমদানি হবে তাদের, ভোজ তো জুটেছে, ওটা উপরি। সুতরাং আমাদের ঘিরে রেখেছে যাতে পালাতে না পারি।

খিদেটাও এবার জানান দিচ্ছে মাংসের গন্ধে। বেলা দুটো বেজে গেছে, দানাপানি পড়েনি পেটে। পিকনিক ঠিকই হচ্ছে তবে আমাদের নয়, ওদের। মুরগির বাচ্চার জন্য এত দাম দিতে হবে জানতাম না।

তেষ্টাও পেয়েছে। বলতে কে একজন একটা ময়লা বিবর্ণ প্লাস্টিকের জগে টিউবওয়েল থেকে জল ধরে এনে দেয়। তাই খেতে থাকি, যেন জল দিয়ে তেষ্টাই নয়, খিদেও মেটাতে হবে আমাদের। ভয়ে হতাশায় অসহায় রাগে গলাও শুকিয়ে গেছে।

ওদিকে তখন ভোজনপর্ব চলেছে। প্রধানের ভাইপোও বসেছেন, তার জন্য বিশেষ পরিমাণ

বইঘর.কম

মাংস, উৎকৃষ্ট দই, সন্দেশের ব্যবস্থা হয়েছে। এদিকে পাহারাদাররা গিয়ে পালা করে খেয়ে আসছে।

হোঁৎকা, গোবরা খিদেয় জ্বলছে। আমাদের অবস্থাও তেমনি, কিন্তু খাবার কথা কেউ বলে না। এরাই এক কড়াই মাংস, দই, সন্দেশ সবই সাবাড় করে শূন্য হাঁড়ি কড়াই বালতি ফেলে রেখে এবার আমাদের ঘিরে জোরদার পাহারা শুরু করে। ওদিকে গাঁয়ের যত কুকুর এসে এঁটো পাতা-ভাত-হাঁড়ি-কড়াই-বালতি চাটছে।

বেলা পড়ে আসছে। হঠাৎ দেখা যায় ধুলো উড়িয়ে মেঠো পথে একটা জিপ আসছে। প্রধানের জিপ। প্রধান মশায় শহরে কি মিটিং সেরে ফিরছেন।

প্রধান মশায় জিপ থেকে নামতেই গ্রামের পাবলিক তখন মুরগি মারার কেসটা সবিস্তারে বর্ণনা করে চলেছে তাঁকে। দশাসই চেহারা প্রধানের, তিনি দেখছেন আমাদের অসহায় মূর্তিগুলোকে। ওদিকে পড়ে আছে শূন্য কড়াই-হাঁড়ি—

হোঁৎকা বলে, মুরগির বাচ্চা চাপা দিইছি, আমাগো থানাতেই পাঠান, দিনভোর উপোসী রাখছে, আমাগো ভ্যানের সব খাবার লুঠ করছে, কয় দু'হাজার টাকা দিতে লাগবো এর পর?

জানাই, টাকা নাই, আপনার ভাইপোও চান পাঁচশো টাকা, এ কি বিচার আপনাদের?

প্রধানমশায় অবাক হন, সেকি! এইসব কাণ্ড! ডাক নৃসিংহকে, কোথায় সে? নেতা সাজতে চায়? ডাক তাকে?

কিন্তু এদিক খুঁজে আর ভাইপো সেই নৃসিংহকে পাওয়া যায় না। প্রধানমশায় বলেন, কে কে ছিল দলে? একটা মুরগির বাচ্চা চাপা দিয়েছে, তাই এই কাণ্ড! বল কে কে ছিল? কারা ভ্যান লুঠ করেছে?

জনতা তখন ধীরে ধীরে পাতলা হচ্ছে। দু-একজনকে ধরে চড়-থাপ্পড় লাগান প্রধানমশায়। মুরগির মালিক তো ব্যাপার দেখে কেটে পড়েছে।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে, প্রধানমশায় কোথা থেকে মুড়ি গুড় আর ক্ষেতের কিছু মুলো তুলে আনিয়ে বলেন, এগুলো খাও, সত্যি খুব কষ্ট দিয়েছে তোমাদের। এর বিহিত আমি করবোই, তোমরা কিছু মনে করো না।

ফিরছি ওই স্তোকবাক্য শুনে। গাড়িতে বসে শুকনো মুড়ি আর মুলো চিবোচ্ছি। খোলা ভ্যানে শীতের হিম হাওয়া সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। খালি পেটে ঠান্ডাটা লাগেও বেশি। দিনভোর আজ উপোস দিয়ে আমাদের খরচায় ওই নিষ্ঠুর জনতার পিকনিক দেখে ফিরছি।

কোনো পিকনিকে মুলো মুড়ি আর গুড় দিয়ে লাঞ্চ নিশ্চয়ই হয় না।

পটলা বলে, আর পি-পিকনিকে কাজ নাই।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে, সব ওই গোবরার জন্যি হইছে। কুমড়ো মামার বাগানে না এলি এই সব হইত না। একটা মুরগির বাচ্চার দাম কয় হাজার ট্যাকা! ধ্যুস! মুলো খাতি আর পারছি না এই ঠান্ডায়।

হোঁৎকার মত পেটুক ভোজনরসিক শীতের ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে উৎকৃষ্ট লাল মুলোটাকে ছুড়ে ফেলে কি অসহায় রাগে!

এবারে পিকনিকে সত্যিই এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি আমরা।

পটলার বৃক্ষরোপণ উৎসব

সেদিন পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের বার্ষিক সভায় পটলা তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে জোর গলায় পেশ করে।

পঞ্চপাণ্ডব নামটা যেমন জবরদস্ত শোনায়, আমাদের ক্লাবকেও তেমন জবরদস্তই বলা যেতে পারে। আকারে খুব বড় না হলেও প্রকারে বড়সড়ই। নিজেদের খেলার মাঠ আছে, সেটা ওই পটলার দৌলতেই। কারণ ওর পূর্বপুরুষরা এখানে এসে যখন কাঠগোলা, করাতকল, ধান-চাল-পাটের আড়ত খোলেন তখন বেলেঘাটার কুলেপাড়া, খালধারে মানুষজনের বসতি তো দূরের কথা, ভয়ে মানুষজন এমুখো হত না। চারদিকে জলা, হোগলাবন, বাঁশ-ঘেঁটুগাছের জঙ্গল। এলাকাটা ছিল কলকাতার পূর্ব সীমান্ত, তার পরেই বাদাবন, ভেড়ি।

সেই আমলে পটলার পিতামহরা জলের দরে বিঘের পর বিঘে ওই জলা কিনেছিলেন। তারপর তাঁদেরও রমরমা শুরু হয়। এখন ওসব ব্যবসা ছাড়াও পটলাদের কাকা-বাবার কারখানা, অফিস, বিল্ডিং ব্যবসা। নানা কিছুতে মা লক্ষ্মীকে তাঁরা বেঁধেছেন নিজের ঘরে।

তাঁদের একমাত্র কুলপ্রদীপ ওই পটল—অবশ্য ভালো নাম একটা আছে, সেটা থাকে স্কুলের খাতায়। দিনান্তে রোলকল করার সময় শুনি সুবুদ্ধি নারায়ণ রায়-এর নাম। সেটা ঢাকা পড়ে গেছে মেঘে ঢাকা তারার মতই, জেগে উঠেছে ওই পটলাই। তবে সুবুদ্ধি নামটা থাকার জন্য তার মাথায় মাঝে মাঝে নানারকম বুদ্ধি গজিয়ে ওঠে। আর তার নানারকম বুদ্ধির প্রকাশ নিয়েই যত সমস্যা! সে সবের হ্যাপা সামলাতে হয় আমাদেরই—অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের বাকি চারজন সদস্যকে। কারণ পটলাই আমাদের কামধেনু।

পুরাকালে মুনি-ঋষিদের আশ্রমে এরকম রেডিমেড কামধেনু থাকত। বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমেও ছিল। তার কাছে যা চাইতেন ঋষিরা, তাই পেতেন। স্বর্ণ, ঐশ্বর্য, আহার্য এসব তো ইচ্ছানুসারেই মিলত। তাই দিয়ে তাঁরা বহু মুনিদের ভোজন করাতেন, দানধ্যান করতেন। আর দুধ? সে যখনই দুইবেন, পাবেন। পটলাও আমাদের কাছে সেইরকম কামধেনুই।

ওদিকে কুলেপাড়ার পাশেই সেভেন বুলেটস্ ক্লাবের নিজেদের খেলার মাঠ আছে। আমাদেরও মাঠ চাই, না হলে পাড়ার কচিকাঁচাদের ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের কাজে বাধা আসছে। পটলার ঠাক্‌মারও অঢেল সম্পত্তি, বহু জমি-জায়গা একমাত্র নাতির ক্লাবের জন্য খেলার মাঠ হবে না? ঠাক্‌মা আমাদেরও খুবই স্নেহ করেন।

আমরা গেছি তাঁর কাছে। ঠাক্‌মাই তাঁর জমি থেকে একটা বিঘে চারেকের প্লটে খেলার মাঠ করার অনুমতি দেন। ক্লাবঘরও তৈরি হল—দরমার ঘর, উপরে টিন। রং-চং করে মহাসমারোহে তার উদ্বোধনও করা হল। কোন মন্ত্রীকে যেন ঠাক্‌মা প্রধান অতিথি করে ফিতে কাটালেন।

বইঘর.কম

পটলার দৌলতে ক্লাবও রমরমিয়ে চলছে। এ হেন পটলার ওই জ্ঞানগর্ভ সিদ্ধান্ত আমাদের মানা ছাড়া পথ নেই।

পটলা বলে, বি-বি-বৃক্ষ রোও—। পটলার একটা স্বাভাবিক বাধা আছে, মানে উত্তেজনার সময়ই তার জিবটা 'বিট্রে' করে। তখনই কেমন জিবটা আলটাকরায় 'সেট' হয়ে যায়। কোনোরকমে 'ফ্রি' করে নিয়ে বাক্যটা শেষ করে, 'রোপণ উৎসব'।

আমিই ব্যাখ্যা করে দিই, বৃক্ষরোপণ উৎসব?

পটলা ঘাড় নাড়ে। ফটিক সঙ্গীতচর্চা করে-টরে। প্রায় শুনি এককলি গানই মাস ছয়েক ধরে ওই দরমার ক্লাবঘরে সাধছে। পাড়ার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করে। ফটিক বলে, দারুণ হবে। একেবারে নিউ আইডিয়া। বুঝলি আমার পিসেমশাইয়ের ভাইয়ের শালা শান্তিনিকেতনে থাকেন, দারুণ গান। ওখানে দেখেছি বৃক্ষরোপণ উৎসব হয়। ছেলে-মেয়েরা সেজেগুজে গান গাইতে গাইতে যায়—পিছনে চতুর্দোলায় সাজানো চারাগাছ।

ফটিক চোখ বুজে সেই দৃশ্যের কল্পনা করে গেয়ে ওঠে—মরু বিজয়ের কেতন উড়াও—

হোঁৎকা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। সে আমাদের সেক্রেটারি কাম ট্রেজারার। আর পটলাই ভাইস প্রেসিডেন্ট। হোঁৎকা তার দেশজ ভাষায় বলে, চুপ মাইরা যা ফটকা।

ফটিক পটলার সমর্থক। সে বলে, কেন? চুপ করব কেন? পটলা কি খারাপ প্রস্তাব দিয়েছে? একটি গাছ একটি প্রাণ—গাছই মানুষের বন্ধু। পিওর অক্সিজেন দেয়।

হোঁৎকা বলে, অক্সিজেন কখন দিতি হয় র‍্যা? এক্কেরে যহন মানষের দম শ্যাষ হই আসে তহন? হাসপাতালে দ্যাখসনি মুখে ঠুঙ্গি দেই—

আমি বলি, সে অক্সিজেন নয়, বাতাসকে শুদ্ধ করে গাছ। বৃষ্টি আনে, ভূমিক্ষয় রোধ করে। গাছ না থাকলে প্রাণীজগৎ বাঁচত না।

হোঁৎকা বলে, বিপিনস্যারের ক্লাস মনে লয়? খুইব তো জ্ঞান দিছস! বোঝলাম বৃক্ষরোপণ মহৎ কাজ।

পটলা এবার সমর্থন পেয়ে বলে, ত-তবে? সেই উৎসবই করব।

হোঁৎকার পকেটে সব সময়ে একটা পদত্যাগপত্র থাকে। মাঝে মাঝেই ক্যাশের স্বাস্থ্য খারাপ দেখলে সে হুমকি দেয়, রেজিকনেশন দিমু। ই ক্লাবে আর থাকুম না। সেভেন বুলেটস্ পায়ে ত্যাল দিতাছে। ওহানেই যামু। আজও সে বলে, ক্যাশ কড়ি ফিনিশ। ওই তগোর উৎসব, নাচ-গান কইরা বৃক্ষরোপণ করনের পয়সা নাই, সাধ যায় বোষ্টম হতি, কপাল ফাটে মচ্ছব দিতি! তাই কই বৃক্ষরোপণ করতি চাস তো একখান চারা আইনা পুঁইতা দে। তা নয়, নেত্য-টেত্য—ক্যাটাভারাস।

হোঁৎকা ইদানীং ওই কথাটা কোথায় শুনেছে কে জানে, প্রায়ই প্রয়োগ করে।

ফটিকের কত স্বপ্ন। কুলেপাড়ার মাঠে একেবারে শান্তিনিকেতনের স্টাইলে বৃক্ষরোপণ উৎসব করবে, পাড়ার ছেলে-মেয়েদের নাচ-গানে তালিম দেবে। দরকার হয় শান্তিনিকেতন থেকে সেই পিসেমশাইয়ের ভাইয়ের শ্যালককেই আনাবে। গান-নাচ, স্তোত্র পাঠ, বৃক্ষবন্দনা—এসব করে তামাম কুলেপাড়াকে তাক লাগিয়ে দেবে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব। ধন্য ধন্য রব উঠবে। সেভেন বুলেটস্ এসব কল্পনাও করতে পারে না। এমন একটা পরিকল্পনায় একেবারে জল ঢেলে দিল ওই হোঁৎকা।

গোবর্ধন বলে, হোঁৎকা, বৃক্ষরোপণ যদি করবি, চালকুমড়ো, না হয় তারকেশ্বরের আর্লি মিষ্টি কুমড়োর চারাই লাগা। তিন মাসে ইয়া মৃদঙ্গের সাইজের কুমড়ো হবে। এখন পাইকেরি আট টাকা কেজি, সাড়ে সাতশো টাকা কুইন্টাল, পড়তে পারে না। চালকুমড়ো তো লাগালেই হবে—অঢেল।

গোবর্ধনের মামার কুমড়ো, চালকুমড়োর হোলসেল বিজনেস। ট্রাকে করে নানা সাইজের কুমড়ো, চালকুমড়ো আসে তারকেশ্বর, নালিকুল, দশঘরার ওদিক থেকে।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে, চুপ মাইরা থাক গোবরা! খেলার মাঠে কুমড়োর চাষ করুম? তার চে সরষের চাষই কর গিয়া। চক্ষে দিনরাত সরষের ফুলই দেখবি। তগোর ক্লাবে আর নাই, রেজিগনেশনই দিমু।

পকেট থেকে রেডিমেড রেজিকনেশন লেটারটা বের করতে গিয়ে দেখে দীর্ঘদিন ধরে সেটা পকেটে পড়ে থেকে ভাঁজে ভাঁজে ফর্দাফাঁই। হোঁৎকা তারই আধখানা বের করে বলে, আধখানা লেটার রাইখা দে, পুরাটা কালই দিমু।

আমিই ক্লাবের সংবিধান কিছু বুঝি। ওরাও তা মানে। তাই বলি, আধখানা রেজিকনেশন লেটার গ্রাহ্য হবে না। পুরোটা চাই।

হোঁৎকা বলে, তাই দিমু। কালই। তগোর সনে নো কানেকশন। হক্কলে তরা ওই ক্যাডাভারাস কাণ্ড করবি এদিকে ফান্ড নিল, বড় বড় ফর্দ দিয়া খালাস।

পটলা বলে, ফা-ফান্ডের জন্য নো ফিয়ার। আই শ্যাল ম্যানেজ।

পটলা গতজন্মে বোধহয় সাহেবই ছিল। ইংরেজিটা ওর জিবে আটকায় না। ব্রেক ফেলও করে না। গড়গড় করে বলে যায়। যত গোলমাল বাংলার বেলাতেই। বোধহয় ওর কাছে ওটা এখনও বিদেশি ভাষা। তাই জিবটা গড়বড় করে ওঠে তখন।

পটলা বলে, হাও মাচ? ক-কত টাকা চাই? সে—হাও মাচ মানি?

পটলা যখন টাকার ভার নিজে নিয়েছে তখন আর ভাবনার কিছু নেই। হোঁৎকা জানে কলের জলের মতই মসৃণ গতিতে টাকা আসবে। তাই সে বলে, তয় রেজিকনেশন তুইলা নিতাছি। ফটিক-সমী তরা টাকার হিসাবটা কইরা দে। তয় টেন পার্সেন্ট বাড়তি কইরা ধরবি। আলুর দাম বারো টাকা, পিঁয়াজ কয় চল্লিশ, ত্যাল তো ধরাই যায় না—পিছলাই যায়। খাওনের ঘটা ধরতি হইব। সেইমত আমরাও পরিকল্পনা বাজেট এবার নিয়ে বসি।

মাঠে প্যান্ডেল হবে, স্টেজ, সামিয়ানা, চেয়ার, মাইক, লাইটও চাই। নৃত্যনাটিকা হবে শেষে। ওদিকে প্রধান অতিথি, সভাপতিও চাই।

ফটিক বলে, তারপর ধর নাচগানের রিহার্সালের খরচা। খাস শান্তিনিকেতন থেকে সেই নবুদাকেই আনব। সারা উৎসব সেইই পরিচালনা করবে। তার ট্রেন ভাড়া, অন্য খরচা, ট্যাক্সি ভাড়া। প্রধান অতিথি, সভাপতিকেও ধুতি-চাদর দিতে হবে।

হোঁৎকা বলে ওঠে, আরে কস কি? ওই প্রধান অতিথি-ফতিথিদের দিতে লাগবো ক্যান।

ফটিক বলে, গাইয়ে-বাজিয়েরা টাকা ছাড়া এক পাও নড়ে না। আগাম টাকা বাড়িতে রেখে তবে ফাংশনে আসে। অথচ এই প্রধান অতিথি মস্ত বড় সাহিত্যিক। এঁর কি কোনো সম্মান দক্ষিণাও থাকবে না? এঁরা কি এতই মূল্যহীন লোক? বল?

পটলা ব্যাপারটা বুঝে বলে, না, ঠিক বলেছিস, গরদের ধুতি, চ-চাদর দিয়ে প্র-প্রণাম করতে হবে।

বইঘর.কম

সব পরিকল্পনাই হয়ে যায়। হোঁৎকা বলে, এসব কথা, ওই উৎসবের কথা যেন কাকপক্ষীরেও কেউ কইবি না। ওই সেভেন বুলেটস্ ক্লাব তো কান খাড়াইয়া আছে আমাগোর টেক্কা দিবার জন্য, খবরটা পাইলেই ওরা কিছু কইরা বসবো।

গোবর্ধন বলে, হ্যাঁ। একদম যেন 'লিক্' না হয়। সেই কারণেই বলে—ওইসব নাচগানের রিহার্সেলও গোপনে করতে হবে পটলাদের বাড়ির কোনও ঘরে।

সকলেই মতটা সমর্থন করে। আর পটলাদের বাড়িও বিশাল। কয়েক বিঘের উপর। উঁচু প্রাচীর ঘেরা, গেটে দারোয়ানও মজুত থাকে। ওদিকে বাগান মন্দির, কয়েকটা ঘরও আছে, মালপত্র থাকে। ফাঁকাও আছে দু'একটা ঘর। ওখানেই রিহার্সেল হবে। বাইরের কেউ টেরই পাবে না।

পটলা বলে, ঠি-ঠিক বলেছিস। একেবারে সিক্রেট থাকবে ব্যাপারটা।

ফটিক বলে, তাই থাকবে। সব রেডি করে তিনদিনের মাথায় এমন পাবলিসিটি মারব, পোস্টার-ব্যানার ছড়াব যে সারা এলাকার মানুষ এসে পড়বে। এক্কেবারে নতুনত্ব হবে। পটলার মাথাটা কিন্তু দারুণ রে।

পটলা এখন থেকেই দিলদরিয়া। বলে, সবকিছু ফাইনাল ক-করে ফ্যাল। গো-গোবরা, নবুর দোকানে চা-টোস্ট বলে দে।

হোঁৎকা গম্ভীরভাবে জোগান দেয় পাঁচ-ছয়খান ওমলেটও দিতে কইয়া দে। প্রোটিন না হইলি ব্রেন খুলব না ঠিক মত।

তার পরদিন থেকেই পটলাদের দুর্গের মত বাড়ির বাগানের দিকে একটা ঘরে ফটিক পাড়ার মলি, ডলি, কলি, পুটু, ভোট্কা, পট্কা, মোনাদের নিয়ে নাচ-গানের তালিম শুরু করেছে।

ওদের জন্য চাই লালপাড় শাড়ি। ছেলেদের জন্য বাসন্তী রংয়ের ধুতি-পাঞ্জাবির অর্ডার চলে গেছে গোপনে পাড়ার বাইরের কোনও দোকানে। প্যান্ডেলের কারুকার্যের ব্যাপারে মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলের দু'জন কারিগর বাড়িতেই শোলা, পাটকাঠি আইসক্রিমের চামচে, বাবুই পাখির বাসা, তালপাতা, নানা কিছু বৃক্ষজাতীয় দ্রব্যাদি দিয়ে অলংকরণের কাজ শুরু করেছে। পটলার ঠাক্মাও সব শুনে বলেন, বৃক্ষ দেবতা রে! আগের দিনে বড়লোকেরা অশ্বত্থ, বট এসব গাছ প্রতিষ্ঠা করত। রোজ জল দিয়ে প্রণাম করত। বৃক্ষপূজা ভালো কাজ।

হোঁৎকা এই মৌকায় বলে, কিন্তু ক্যাশকড়ি তো ত্যামন নাই। পূজা-টুজা করুম ক্যামনে, কন ঠাক্মা? লোকে আধুনিক লারে-লাপ্পা গানে মোটা টাকা চাঁদা দেয়, কিন্তু শুভকাজে কেউ দিতিই চায় না। পটলা কইল—নামছি, এহন বৃক্ষ চাপাই না পড়ি।

ঠাক্মা বলেন, বালাই ষাট। শুভ কাজ করছিস দেবো হাজার পাঁচেক টাকা।

ব্যস—আমরা পাঁচজনও খুশির চোটে ঠাক্মাকে ফটাফট পাঁচটা পেন্নামই ঠুকে দিই।

আর ভাবনা নেই। প্যান্ডেল, অলংকরণ, ফাংশন, নাচগান সব জোর কদমে চলছে।

হঠাৎ গোবরা সেদিন ওর কুমড়ো কোম্পানির ঢংঢংয়ে সাইকেলটা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির। সাইকেল থেকে নেমে ছুটে এসে ভগ্নদূতের মত খবর দেয়, সব্বোনাশ হয়ে গ্যাছে।

আমরা অবাক হই। পটলা টাকার হিসাব ফেলে শুধায়, হোয়াট?

গোবরা দম নিয়ে বলে, সেভেন বুলেটস্ স্পাই লাগিয়ে আমাদের সব খবর জেনে নিয়েছে। ওরা এই রবিবারই ওদের ক্লাবের মাঠে বৃক্ষরোপণ উৎসব করছে। অ্যাই দ্যাখ—

পকেট থেকে দলা পাকানো একটা লিফলেট বের করে দেখায়। পড়ে তো আমাদের চক্ষুস্থির।

ফটিক ওদিকে তখন গানের কোরাসের রিহার্সেল করছে। পটলা গর্জে ওঠে, স্টপ। ফুলস্টপ। ওরাও থেমে যায়। তারপর খবরটা শুনে মুষড়ে পড়ে।

একেবারে স্যাবোটেজ। আমাদের আগে ওরাই বাজি মেরে দেবে? ততক্ষণে নন্টেও একটা পোস্টার নিয়ে আসে। বলে, সারা পাড়া, রেলবাজার, সিনেমা হলের সামনে পোস্টারে ছয়লাপ করেছে সেভেন বুলেটস্। ফেস্টুন যা টাঙিয়েছে একেবারে রাস্তার এদিক থেকে ওদিকে। ক্যালি আছে ওদের।

পটলার অবস্থা তখন চুপসানো বেলুনের মত নেতিয়ে পড়েছে। বলে, একেবারে 'ডিফিট' হয়ে গেলাম রে? সেভেন বুলটেস্ই জি-জিতে যাবে? পা-পাড়ায় মুখ আর রইল না। ক-ক্লাব তুলেই দে এবার।

হোঁৎকা এতক্ষণ গুম হয়ে কি ভাবছিল। নাচগান থেমে গেছে। ডেকরেটারের লোকেরা বলে, তাহলে কাজ হবে না বাবু? ওদিকে দর্জির লোকও ছেলে-মেয়েদের পোশাক এনেছে। সেও বলে, আমার যে ভরাডুবি হবে স্যার?

পটলা বলে, আমরাই ডু-ডুবে গেছি। নো ফাংশন। উঃ! কি স-সর্বনাশ না হয়ে গেল রে?

আমরা জানি না কি করব। স্তব্ধতার মাঝে হোঁৎকা হঠাৎ ফুঁসে ওঠে, বৃক্ষরোপণ উৎসব, ফাংশন—সবকিছুই হইব।

শোকাচ্ছন্ন পটলা বলে, ওরাই সব কিছু করে দেবে আগেই। তু-তুই তো ফ-ফেল। বলবে ওরা আমাদের নকল করেছে। ন-নতুনত্ব—

হোঁৎকা বলে, ওদের ব্যবস্থা যা করার কইরা দিমু। আমাগোর উৎসবই হইব ফার্স্ট।

ফটিকও সাহস পায়, বলছিস?

গোবরা বলে, আমাদের উৎসব হবে?

আলবৎ হইব। হোঁৎকা কইছে হইব—হইব। তরা যে যার কাজ কইরা যা, সব রেডি কইরা ফ্যাল। মায় প্যানডেল, ডেকরেশান। সমী, তুই প্রধান অতিথিরে কইয়া আয়। ফটিক—

ফটিক বলে, আমার সব রেডি থাকবে।

হোঁৎকা বলে, ওসব যা করছিস কর। পটলা—তর বাজেটে ধর শ'পাঁচেক টাকা। অত নাও লাগতি পারে, শ'দুয়েতেই ম্যানেজ হইব, ওটা একস্ট্রা লাগবো ওগোর ব্যবস্থা করতি।

পটলা বলে, শ-শ পাঁচেক পুরোই নে, দ-দরকার হয় থাউজেন্ডই দেব। ও-ওদের ব্যবস্থা বেশ পা-পা—

আমিই পাদপূরণ করে দিই, পাকাপাকি করে দিতে হবে।

পটলা বলে, সিওর।

হোঁৎকা বলে, ওদের প্রোগ্রামের সব খবরই নিতে হইব। আর গোবরা, তুই কালই তোর কুমড়ো মামার যত সাপ্লায়ার আছে ওই নালিকুল, দশঘরা, আরামবাগ-ফাগের ওহানে, নিজে গিয়া যত পারিস বৃক্ষ লইয়া আইবি।

কি বৃক্ষ? আমাদের বৃক্ষরোপণ করা হবে বকুল, আমলকী, আকাশমণি। তবে আবার ও গাছ আনবে কেন?

বইঘর.কম

হোঁৎকা বলে, গাছ ওই গোবরাকেই আনতি হইব, হেই গাছের নাম ওরেই কইমু, আর ওহানে বড়বাজারে কবিরাজী ওষুধ, গাছগাছড়া যারা বিক্রি করে তাগোর থনে—

কি ভেবে বলে—থাউক। ইটা আমি নিজে করুম। শ'পাঁচেক টাহাই দে পটলা। গোবরারেও আজই যাবার লাগবো, বৃক্ষ আনতি হইব।

পটলা টাকা দিতে হোঁৎকা বলে, চল গোবরা, তরে সব কইয়া দিই গিয়া। হ্যাঁ, একখান হাত করাত কিনতি হইব। সেরা ফরেনের মাল হইতে হইব। তরাও ওগোর প্রোগ্রামের খবর লইবি। আর কাম য্যানো সব রেডি থাকে, আমাগোর প্যানডেলও।

হুকুম দিয়ে চলে যায় হোঁৎকা। ফটিক আবার নতুন উদ্যমে নাচগান শুরু করে। ওদিকের কাজকর্মও শুরু হয়। দর্জির ড্রেসও নেওয়া হল। কাল থেকে ড্রেস রিহার্সালও শুরু হবে। তবু মনের মধ্যে একটা ভয় থেকেই যায়।

বাইরের রাস্তায় পটলাদের বাউন্ডারি ওয়ালে ওই পোস্টার যেন বেশি করে পড়েছে—

সেভেন বুলেটস্‌ের পরিবেশ দূষণের বিপক্ষে বৃক্ষরোপণ উৎসব। আসুন—দেখুন—নয়ন সার্থক করুন। স্থান—সেভেন বুলেটস্‌ ময়দান। বিশাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

লাল-নীল সবুজ রংয়ের পোস্টার, সবুজ কলাপাতার ধরনের ব্যানার। চারিদিকে যেন ওদের জয়ধ্বজা উড়ছে—এবার উঠবে ওদের জয়ধ্বনি।

আমাদের সেখানে যেন কোনও ঠাঁইই নেই।

সেভেন বুলেটস্‌ের ভোঁদা, নুলো বলে, দেখলি তো যা কখনও এ পাড়ায় হয়নি তাই করছি।

আমরা মুখ বুজেই থাকি। করার কিছুই নেই। শুনি ওদের মুখেই প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন চাঁদুবাবু, চন্দ্রমোহন চন্দ্র। অর্থাৎ চন্দ্র স্কোয়ার। ওই নামেই পরিচিত। অঢেল টাকার মালিক। মাথায় চাঁদের আলো পেছলানো চকচকে টাক আর স্কোয়ার নয়—চেহারাটা একটা সার্কেলই, একেবারে গোলাকার। বিরাট মক্কেলই পাকড়েছে। ইদানীং ভোটে দাঁড়াবেন চন্দ্র স্কোয়ার, তাই ক্লাবকে হাতে রাখতে চান। আর প্রধান অতিথি হবেন কোনও উপমন্ত্রী। ফুল্‌মন্ত্রীদের ধরতে পারেনি, তা উপ একজনকেই ধরেছে ওরা। আর এর মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ওপাড়ার সবুজ বাহিনীকেও আনছে। তারা নাকি এক একজন এক একটা গাছ লতা-ফতা সেজে পরিবেশকে সবুজ স্নিগ্ধ করে দেবে।

দূর থেকে দেখি সেভেন বুলেটস্‌ের মাঠে মঞ্চ হয়েছে। সুন্দর বেশ উঁচু মঞ্চ। সব সবুজ। আর কলাগাছ একেবারে কাঁদি সমেত এনে বসানো হয়েছে সবুজ পরিবেশ গড়ার জন্য। ওদিকে গাছের ডালে মাচা বেঁধে সানাই বসবে মই দিয়ে উঠে বৃক্ষশীর্ষ থেকে সানাইবাদন হবে। একেবারে সব নতুন আইডিয়া। আমাদের ভিতরের সব খবর জেনে এবার আমাদেরই পথে বসালো ওরা। হোঁৎকা সেই থেকে খুবই ব্যস্ত। তার ব্যক্তিগত সচিব নন্টেরও দেখা নেই। গোবরাকে কোথায় কোন বৃক্ষাদি আনতে দূর গ্রামে পাঠিয়েছে তারও দেখা নেই। পড়ে আছি মাত্র আমরা ক্লাবের তিনপিস মেম্বার।

ডেকরেটারের লোক আমাদের মাঠে কেবলমাত্র বাঁশ খুঁটি ফেলছে। এর মধ্যেই সেভেন বুলেটস্‌ উল্টে প্যাঁক দিচ্ছে, নকলনবিশের দল। আমরা যা করব ওরা তাই দেখে করবে।

বইঘর.কম

পটলা বলে, উঃ লাইফ হেল ক-করে দিল রে। এসবও শু-শুনতে হচ্ছে। আমার পা-পাতাল প্রবেশ করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বলি, ওটা একমাত্র রামায়ণের যুগে সীতাই করেছিল। কলি যুগে তুই আর করিস না।

ওরা গে-গেল কোথায়? নো পাত্তা ওই হো-হোঁৎকা—গ-গোবরার।

পটলা একেবারে ভেঙে পড়েছে। আমি বলি, একটা পথ হবেই।

ক-কবে হবে? কালই তো ওদের ফ-ফাংশন। পটলাও ধৈর্য হারিয়েছে।

আমিও ভাবনায় পড়ি। হোঁৎকা, গোবরার কোনও পাত্তাই কাল রাত পোহালে ওদের জয়-জয়কার ঘোষিত হবে। মঞ্চে সুন্দর টবে কালকের রোপণ জন্য গাছগুলোকে এনে সাজানো হচ্ছে। টেবিল-চেয়ারও বসানো হচ্ছে।

কাল ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে ওদের প্রভাতফেরী। তারপর সকালেই বৃক্ষরোপণ উৎসব। উপমন্ত্রী, এলাকার এম-এল-এ, কাউন্সিলর, খবরের কাগজের লোক, টিভির লোকরাও আসবেন। এলাহি কারবার। আমরা একেবারে পথে বসে গেলাম। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের নামই মুছে দেবে ওরা।

রাতে ঘুম আসে না। পটলা বলে, ওরাও ফিরল না। ইনসাল্টের ভয়ে মু-মুখ লুকিয়েছে। কাওয়ার্ড। উঃ! টাকা-পয়সা গেল—বে-বেইজ্জত।

ফটিক বলে, আমার নাচগানের প্রোগ্রাম রেডি।

পটলা বলে, আমার শ-শ্মশানে করবি। উঃ! লাইফ স্যাক্রিফাইস করব সিওর।

কোনওমতে ওকে নিরস্ত করি।

দুঃখের রাত তবু কেটে যায়। ভোর হতেই শুনি পথ দিয়ে কলরব করে ওদের প্রভাতফেরী চলেছে। ও পাড়ার তাবৎ কুচোগুলোর হাতে সবুজ পতাকা। আর ভোঁদা, ন্যাপারাও রয়েছে পুরোভাগে সেভেন বুলেটস্‌ের বিজয় পতাকা হাতে। সারা পাড়া কাঁপিয়ে চলেছে তারা বিজয়গর্বে।

ওদিকের মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে ওদের মূল উৎসব দেখছি। সুন্দর মঞ্চ, ওদিকে টবে গাছের সারি। ওপাশে মঞ্চে উঠছেন প্রধান অতিথি, সঙ্গে পুলিশ। চেয়ার জুড়ে বসে আছেন চন্দ্র স্কোয়ার, এঁর চক্‌চকে টাকটাই দেখা যাচ্ছে, ওঁর জন্য স্পেশাল চেয়ার আনাতে হয়েছে। অন্য মাননীয় অতিথি, এলাকার ভূষিমাল, চিটেগুড়ের আড়তদার দাঁমশাইও উঠছেন। দুটো লোক তাঁকে ধরে তুলছে। বিশাল দেহ। বেশ মোটা টাকা চাঁদা তাঁর কাছে আদায় করেছে ওরা।

অতিথিরা মঞ্চে রাখা টবের বৃক্ষগুলোকে স্পর্শ করছেন, প্রদক্ষিণ করছেন। তারপর বসছেন চেয়ারে। শাঁখ বাজছে জোরে।

হঠাৎ দেখি হোঁৎকা-গোবরাকে। পটলা আর্তনাদ করে ওঠে—কী হল? তো-তোরা!

ওদিকে ক্যামেরা, টিভি ক্যামেরার আলো জ্বলছে। ছবি উঠছে।

পটলা বলে, লাইফ স্যাক্রিফাইস ক-করব।

হোঁৎকার চেহারা কেমন বিধ্বস্ত। যেন রাতভোর ঘুমোয়নি। গোবরার চেহারাও তেমনি। হোঁৎকা বলে, তার দরকার হইব না। দ্যাখ না—

এরপরই দেখি মঞ্চে মৃদু আলোড়ন শুরু হয়েছে। বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করা, স্পর্শ করার পর চেয়ারে বসেই মন্ত্রীমশাই লাফ দিয়ে ওঠেন। হাত-পা চুলকোতে শুরু করেন। তারপর চন্দ্র

স্কোয়ার চলন্ত পিপের মত যেন গড়াতে থাকেন। তাঁরও চুলকানি শুরু হয়েছে প্রবল বেগে। ভূষিমালের আড়তদার সাঁ করে গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে বিশাল রোমশ বুক বের করে খসোর খসোর করে তীব্র গতিতে চুলকোতে থাকেন। তৎসহ লাফ ও পাড়া কাঁপানো চিৎকার—ওরে বাপ্‌রে!

ক্যামেরায় ওঁদের সেই নৃত্যরত ছবিও উঠছে। উপমন্ত্রী, চন্দ্র স্কোয়ার আর দাঁমশাই শুধু নন, মঞ্চে উপস্থিত সব সুধীজন তখন চুলকানির কমপিটিশন লাগিয়েছেন। গাছের ছোঁয়া যাঁর লাগছে তিনিই শুরু করছেন। মঞ্চ তখন ওঁদের চুলকানির চোটে টলমল।

কে মাইকে ঘোষণা করে—শান্ত হোন। মঞ্চ কাঁপছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। টিভির ছবিতে একটিবার মুখ দেখাবার জন্য তখন মঞ্চে তামাম সভ্যরা উঠে পড়েছে তারপরই মড়্ মড়্ শব্দ। মঞ্চর একপাশ নামছে। টাইটানিক ডোবার সময় যেমন ভীত যাত্রীরা জাহাজের এদিকেই জড়ো হতে লেগেছিল, তেমনি সবাই মিলে মঞ্চের ওদিক থেকে এদিকে আসার চেষ্টা করতেই পুরো মঞ্চটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। চন্দ্র স্কোয়ার তখন গড়াচ্ছেন আর আর্তনাদ করছেন। দাঁমশাই পড়েছেন শীর্ণ উপমন্ত্রীর ঘাড়ে। কে কোনদিকে পড়ে তার ঠিক নেই। মঞ্চটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এবার উপরের তেরপল সমেত বাঁশ, চাদর সবকিছু পড়ে ওদের ওপর, যেন জালে বন্দি মাছের ঝাঁক। কে কি করবে তার ঠিক নেই। চিৎকার, কলরব ওঠে। অনেকেই মাঠ ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বের দিকে দৌড়াচ্ছে। মঞ্চ তখন ধ্বংসস্তূপ। নীচে ওই জনতা—সেভেন বুলেটস্‌র কর্মিবৃন্দ।

কোনওমতে ওঁরা নিজেরাই ঠেলেঠুলে বের হয়ে আসেন। চন্দ্রমোহনের গরদের পাঞ্জাবি তখন ফর্দাফাঁই, দাঁমশাই তখনও গড়াচ্ছেন। পুলিশ উপমন্ত্রীকে বের করে গাড়িতে তোলে। থানার দারোগাবাবু ভোঁদা, ন্যাপা প্রমুখ ক'জন কর্মকর্তাকে থানায় নিয়ে চলে গেল।

ক্রমশ মাঠের লোকজনও কমে আসে। এক বিচিত্র অনুষ্ঠানই বটে। যাকে বলে কেলোর কাণ্ড। ওদের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে ওখানেই।

এরপর রহস্যটা পরিষ্কার হয়। পটলাদের বাড়ির সেই ঘরে বসে এবার হোঁৎকা বলে, কি! কইনি ওগোর ব্যবস্থা করুম। খুব বাড়ছে। স্যাবোতাজ করবো আমাগোর?

গোবরা ক'দিন ধরে গ্রামে ঘুরে এনেছে অনেক বিছুটি গাছ। টবে বসিয়ে রাতারাতি তাদের ওই মঞ্চে তুলে ওদের গাছগুলোকে সরিয়ে দিয়েছে, আর চেয়ার-টেবিলে এতদিনের চেষ্টায় সংগৃহীত আলকুসির চূর্ণ ছড়িয়ে রেখেছিল। আলকুসির কিছুমাত্র চূর্ণ গায়ে-হাতে লাগলে শুরু হবে রাম চুলকানি। তাই হয়েছিল।

ওতেই থামত। কিন্তু ছবি তোলার জন্য হুড়োহুড়ি করে মঞ্চে উঠেছিল পুরো পাড়ার সবাই, ফলে পল্‌কা মঞ্চের যা দশা হবার তাই হয়েছে এবং অনুষ্ঠানপর্ব ওইখানেই শেষ।

এর পরদিন রাতারাতি গড়ে উঠল আমাদের মঞ্চ। আর পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের অনুষ্ঠান সেদিন যা হয়েছিল তা সত্যিই অপূর্ব। সারা এলাকার মানুষ বলে, হ্যাঁ। সত্যি বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের দরকার আছে।

হোঁৎকা বলে, কি রে পটলা, দ্যাখ বৃক্ষের গুণ। ভালোমানষের জন্য ভালো যেমন করে, ভণ্ড পোলাদের তেমনি ঠান্ডাও করতি পারে। বিছুটি-আলকুসি হক্কলই তো বৃক্ষই। ঠিক কইনি?

পটলার ভ্রমণ

এবারও সেই পটলাকে নিয়েই শুরু হয়েছে প্রবলেম। অবশ্য আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের ইতিহাস অনেকেরই জানা, কারণ পটলাকে নিয়ে এর আগেও অনেক রকম প্রবলেম হয়েছে, সে সব তোমরাও জেনেছ, তাই পটলার পরিচয়টাও তোমাদের জানা।

তবু দু-চার কথায় পটলা আর আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের কথা মনে করিয়ে দিই। কামধেনু জানো? মুনিঋষিদের আশ্রমে সেকালে দু-একটা গরু থাকত। দুধের যখনই দরকার পড়ত, দুধ দিত সেই গরু। শুধু দুধই নয়—যা চাইবে, তাই দেবে ওই গরু।

পটলাও পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের তেমনি কামধেনু। ক্লাব ফান্ড 'নিল', ঝালমুড়ি, ফুচকা কি কুলপি মালাই বা চা, টোস্ট চাই, পটলা আছে। ক্লাবের ফাংশন? নো ফান্ড, পটলাকে ধরো। মাল এসে যাবে। পয়সার অভাবে ফুটবল টিম নামানো যাচ্ছে না, পটলাকে ধরো। ও ঠিক ম্যানেজ করে দেবে।

অবশ্য পটলার বাবা-কাকাদের সকলেরই চালু ব্যবসা করাতকল, কাঠগোলা, সিমেন্ট লোহার আড়ত, ঢালাই কারখানা বাজারে বড় ওষুধের দোকান, কী নেই? আর সারাবাড়ির মধ্যে পটলাই 'ওন্‌লি সন্'—অর্থাৎ সবে ধন নীলমণি!

পটলার ঠাক্‌মা বাজারের অর্ধেকটার মালকিন, বেশ কয়েকটা বাড়িও রয়েছে এখানে ওখানে। আর তার আয়ও মন্দ নয়।

এককথায়—পটলাই আমাদের বল, ভরসা।

কিন্তু দোষ ওই একটাই। মাঝে মাঝে ওর মাথায় যেন ঘুণপোকা নড়ে ওঠে। বেশ আছে—ওই পোকা নড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় পটলার এক একটা কাণ্ড। তা নিয়ে সে নিজে তো বিপদে পড়েই, আর নাকানি-চোবানি খেতে হয় আমাদেরও।

তবু পটলার জন্যে এসব করতেই হয়।

আমাদের দলের সবচেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরে হোঁৎকা আর গায়ের জোর সবচেয়ে বেশি গোবর্ধনের।

হোঁৎকা এবার বলে দেয়, তর পটলার 'কেসে' আর নাই! বেঘোরে জানটা দিতি পারুম না। কস তো কেলাবে রেজিকনেশনই দিমু। 'ব্লু ফক্স' কেলাব কত·কইরা কইছে।

হোঁৎকা আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারি। পটলা বলে, ঠি-ঠিক আছে। আর অ্যা-অ্যাডভেঞ্চার করব না। ক-কথা দিলাম।

গোবর্ধনের মামা বাজারের বিরাট কুমড়োর মহাজন। খালধারে বিশাল শেডে টাল করা নানা সাইজের কুমড়ো। ছোট-বড়-মাঝারি, পাকা-ডাঁসা সব কিসিমের কুমড়োই সেখানে ছাদ অবধি টাল দেওয়া। গোবর্ধন কানে পেনসিল গুঁজে কুমড়োর টালের হিসাব রাখে।

আর অন্যতম ফটিকচন্দ্র কালোয়াতি গানের সাধনায় মত্ত। তিনবছর আগে সে একখানা গান নিয়ে কালোয়াতি শুরু করেছিল, এখনও সেই দুটো লাইন নিয়েই পড়ে আছে।

সব ঠিকঠাকই চলছিল।

পটলা যাবে ওর মামার ওখানে বেড়াতে। ওর মামার বিরাট কাঠের গোলা, করাতকল। বিহার মধ্যপ্রদেশের সীমান্তের সারাঙ্গার গহন বন পাহাড়ে পটলার মামার কাঠ কাটাই হচ্ছে। বিশাল সেগুন-শাল-গামার-রোজউড নানা দামি কাঠ আসে ওদিক থেকে। ঐ লাইনের শেষ প্রান্তে গহন বনপাহাড়ের মধ্যে ছোট টাউনশিপে ওর মামার সুন্দর বাংলো।

ওদিকে শুধু বনের কাঠই নয়, পাহাড়ের মধ্যে পাওয়া গেছে প্রচুর লোহা পাথর, যাকে বলে 'আয়রন ওর' আর 'ম্যাঙ্গনিজ ওর'। দুর্গাপুর-ভিলাই-রাউরকেল্লা, বোকারো, বার্নপুর প্রভৃতি জায়গার লোহা কারখানায় ওইসব 'ওর' চালান যায় মালগাড়িতে। ফলে ওই গহন বনের মধ্যেই এখন ছোট-বড় আধুনিক কারখানা, টাউনশিপ সবই গড়ে উঠেছে।

পটলার মামাবাবু এখন ওই বনপাহাড়ে কাঠের ব্যবসা ছাড়াও 'আয়রন ওর'-এর বেশ বড়-সড় ঠিকাদারির কাজ করে দু'হাতে পয়সা কামাচ্ছেন।

পটলা বলে,—এবার ওই সারাঙ্গাতেই চল্ বেড়িয়ে আসি। দে-দেশভ্রমণ ক-করলে জ্ঞান ট্যান বাড়ে।

পটলার বাবা-কাকাদের ঝোঁক টাকা রোজগারের দিকে। কিন্তু পটলার ঝোঁক জ্ঞান অর্জনের দিকে। তাই দেশভ্রমণে যেতে চায় ও।

হোঁৎকা বলে, দেশভ্রমণে যাবি তো চল গিয়া দিল্লি-দেরাদুন, কাশী, নিদেনপক্ষে দার্জিলিং-টিং-তা নয় যাবি গিয়া ওই বন পর্বতে? হেই পাহাড় আর বন—কি দেখুম ক?

গোবর্ধনও সায় দেয়,—তা সত্যি। আবার বনজঙ্গলে খাবারও তেমন মিলবে না। সেই কুমড়োই ভরসা।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে,—তর মামারে ক ওখানে কুমড়ো সাপ্লাই দিব। হালায় কুমড়ার নাম করল্যা তরে মার্ডার করুম গোবরা, হঃ।

প্রতি বছর ক্লাব থেকে আমরা এমন ভ্রমণে যাই, এবার প্ল্যান ছিল দার্জিলিং যাওয়া হবে। কিন্তু পটলাকে ওই নাম না জানা বন পাহাড়ের প্রোগ্রাম করতে দেখে হোঁৎকা বলে দেয়, যামু না। তগোর কেলাবে রেজিকনেশনই দিমু। ইলেভেন বুলেটস্ দার্জিলিং যাইত্যাছে। ওগোর লগেই যামু।

ফটিক বলে,—কিন্তু চাঁদা লাগবে রে একশো টাকা করে।

টাকার কথায় হোঁৎকা একটু মিইয়ে যায়। শেষ অবধি আমি বলি, খাওয়া দাওয়া জব্বরই হবে হোঁৎকা!

পটলাও সায় দেয়, মামার নিজের মিনি পোলট্রি—মুরগির ডিম, দুধেরও অভাব নেই। বুনো মুরগি, হরিণের মাংসও মেলে।

এর মধ্যে ফটিক ঝালমুড়ি আর পাতে ছানার মালপোর ব্যবস্থা করে এসেছে নিধিরামের দোকান থেকে।

পটলা বলে,—তাহলে হোঁৎকা ফর্দ-টর্দগুলো ক্-করে নে। বিস্কুট-কেক-ড্রাই ফ্রুট্স-স্ন্যাক্স্ এসব বে বে-শি করেই নিবি।

ফটিক নিচু গলায় বলে,—আর ইয়ে কিছু কালোয়াতি গানের ক্যাসেটও—হোঁৎকা মুহূর্তে খেপে ওঠে, তয় আমি নাই।

ফটিকও বলে ওঠে—কালোয়াতি গানের কি বুঝিবিরে বাঙ্গাল?

—আর বুইঝা কাম নাই। তর ব্যা ব্যা শুইনাই ঢের বুঝছি।

যাবার মুখেই এ কি অশান্তি! তাই বলি,—একটু অ্যাডজাস্ট করে চলতে হবে। থামবি তোরা?

পটলা বলে,—সে-সেই ক-কথাটা বোঝা ওদের। নে লিস্টি কর—।

এর মধ্যে আমাদের তো সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। এর মধ্যে হোঁৎকার নেতৃত্বে পটলা বাদে আমরা গিয়ে হাজির হয়েছি পটলার ঠাক্‌মার কাছে।

আমাদের পকেট তো গড়ের মাঠ। বাড়ি থেকে দশ বিশ টাকা মিলতে পারে, বাকি সবই ম্যানেজ হবে, পটলার ঘাড়ে—না হয় মামার ঘাড়ে। কিন্তু তাই বলে পকেটে কিছু 'মানি' না নিয়ে তো জার্নি করা যায় না।

ঠাক্‌মা নাটমন্দিরে বসে মালা জপ করছে। আমরা দেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে ঠাক্‌মাকে প্রণাম করতে উনি বলেন, বসো-বসো! তারপর এসময় হঠাৎ!

হোঁৎকা এবার প্যাঁচ কষে ঃ আসতে হল ঠাক্‌মা, পটলা যাইত্যাছে কোন্ বন পাহাড়ে—

ঠাক্‌মা শুধোয়—তোমরা? তোমরা যাবে তো?

আমরা কিছু বলার আগেই হোঁৎকা বলে,—যাবার ইচ্ছা তো ছিল, কিন্তু ক্লাবের ফাংশন সামনের মাসে—টিমও গড়তি পারি নাই। চাঁদা তোলার জন্য আমাগোর থাকতি হইব। এবার যাওয়া হইব না। পটলাই যাউক গিয়া।

ঠাক্‌মা তার অনলি নাতিকে একা ছাড়তে নারাজ। তাই বলে,—চাঁদার জন্যে ভাবতে হবে না।

হোঁৎকা বলে—কিন্তু টিম করতি হইব, কমপক্ষে পাঁচ হাজার।

পটলার ঠাক্‌মা বলে—সরকারকে ডেকে দে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা ক্লাবের দরমার ঘরে এসে হাঁফ ছাড়ি। হাতে ক্যাস পাঁচ হাজার টাকার একটা বাণ্ডিল। হোঁৎকা বলে,—এর থেকে তিন হাজার ব্যাঙ্কে জমা দিই আয়। আর দু'হাজার সঙ্গে নিতি লাগব। এম্‌টি পকেটে ট্যুর হয় না, বোঝস?

এবার বুঝি, হোঁৎকা কেন আমাদের লিডার।

রাতের গাড়ির চালচলনই আলাদা, ট্রেনটা অন্ধকার ফুঁড়ে চলেছে চাকার শব্দ তুলে আর দুলছেও তেমনি। দুলতে দুলতে যেন লাইন থেকে ছিটকে পড়বে।

বাঙ্কে আমরা পাঁচজন। পরপর বাঙ্ক পাইনি। একটা ক্যুপে পেয়েছি তিনখানা, বাকি দুটো ওদিকে।

আর পাশের বাঙ্কে চলেছে বিরাট দশাসই একটা লোক, মাথাটা নতুন হাঁড়ির মত চকচকে—তেলপানা। ন্যাড়া না টাক, রাতের আবছা অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারিনি। তার সঙ্গী দুজনও বিচিত্রই। একজন বেঁটে আর বেশ মোটা কালোব্যাঙ মার্কা চেহারা, অন্যজন ঠিক তার বিপরীত। লম্বা লগার মত শীর্ণ দেহ।

ওরা ওদিকের আলো জ্বেলে তখন খাবারের আয়োজন করছে। ট্রেন ছেড়েছে রাত ন'টার পর হাওড়া থেকে। এর মধ্যে যাত্রীরা খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছে। কামরায় এখানে-ওখানে ডিম্ লাইট জ্বলছে।

আমরাও খাওয়া-দাওয়া সেরে এবার শোবার উপক্রম করছি, হঠাৎ আলো দুটো জ্বেলে ওই টাক মাথা বিশাল চেহারার লোকটা বলে,—খানা লাগা—চঙ্গু, মঙ্গু! অর্থাৎ ওই কোলা ব্যাঙ আর ওই লম্বুর নাম যথাক্রমে চঙ্গু আর মঙ্গুই।

লোকটার সিট পড়েছে আমার বাঙ্কের উপরই। তখনও উপরে ওঠেনি। রাত এগারোটা বাজে—আমার বাঙ্কেই ওরা খাবার সাজিয়ে বসল। কয়েকটা নান রুটি, তন্দুরি ওদিকে ইয়া একটা হট বক্স থেকে বের হলো একগাদা চিকেন কারি, ফিশ ফ্রাই, চিলি চিকেন, মাটন চাপ।

ওদিকে হোঁৎকা তখনও ঘুমোয়নি, সে দেখছে ওই বিচিত্র খাদ্যসম্ভার। আমাদের যা কিছু তা আজ সবই নিরামিষ, সন্দেশ কালাকান্দ। ও তাই এদিকে রকমারি ওই লোভনীয় খাদ্য দেখে হোঁৎকার চোখ চিকচিক করে ওঠে।

ওই তিনমূর্তি গিলছেও তেমনি। হঠাৎ ওই টাকওয়ালা লোকটা হোঁৎকাকে দেখে বলে,—আরে এ ছোকরা, আও, বৈঠো। থোড়া টেস্ট করো। আসলি বিরিয়ানি-চাপ-চিলি চিকেন।

হোঁৎকার পেট অভর—ওর খিদে কখনও কমে না। যদিও কমে তা ক্ষণিকের জন্য। একটু আগেই ট্রেনে উঠে দিস্তেখানেক লুচি—খান চারেক বেগুনভাজা—এতটা আলু কপির তরকারি আর ছ'টা প্রমাণ সাইজের জলভরা তালশাঁস, চারটে সলিড কালাকান্দ সেঁটেছে। এখন আবার ওদের ওই মুরগি মাটন দেখে উসখুস শুরু করে।

আমি বলি,—এই তো খেয়েছিস।

হোঁৎকা বলে ওঠে—বেশি খামু না। ওনারা কইছেন, না খাই ওগোর ইনসাল্ট করা হইব!

বলতে বলতে হোঁৎকা গিয়ে বসে পড়ল আমাকে ঠেলে। আমাকে বলে,—সমী তুই গিয়া আমার বাঙ্কে শুইয়া পড়। আমি তর সিটেই রইলাম।

অর্থাৎ খেয়ে-দেয়ে এখানেই গড়ান দেবে হোঁৎকা!

ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। দেখি সব শুনশান। কামরায় সবাই ঘুমোচ্ছে। আর ট্রেন ছুটে চলেছে রাতের অন্ধকারে।

ঘাটশিলা পার হয়ে যেতে দু-চারজন যাত্রী জেগে ওঠে। আলোও জ্বলেও ওঠে। অনেকেই টাটানগরে নামবে।

আমাদেরও ওইখানে নামতে হবে।

পটলা ওদিকে গভীর ঘুমে মগ্ন। হোঁৎকা ট্রেনে আমাদের সজাগ প্রহরী। এমনিতেই ওর ঘুম খুব পাতলা, আর এযাবৎ আমাদের ভ্রমণের ব্যাপারে সেই-ই ম্যানেজার। আজ দেখি ওর ঘুমই ভাঙেনি।

ওদিকের বার্থ তিনটে খালি। টাকমাথা আর তার দুই সহকারী, চঙ্গু, মঙ্গুর পাত্তা নাই। ওরা মাঝপথে কোনো স্টেশনে নেমে গেছে।

আমার হাঁকডাকে গোবরা, ফটিক ধড়মড় করে ওঠে।

পটলাও উঠে পড়েছে। ট্রেন টাটানগরে ঢুকছে। হোঁৎকার ঘুম ভাঙার কোনো লক্ষণই নেই।

বইঘর.কম

ট্রেন প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। হোঁৎকা তখনও ঢুলছে। মালপত্র নামিয়ে এবার ওকে ঠেলেঠুলে নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। দু'জন কুলিকে ঠিক করি, তারা হোঁৎকাকে লাগেজের মত নামিয়ে প্লাটফর্মে শুইয়ে দেয়। এবার হোঁৎকার ঘুম পুরোপুরি ভাঙে।

চমকে উঠে বসে সে,—অ্যাঁ, টাটানগর আইসা পড়ছি। ডাকবি তো?

বলি,—ডাকবি মানে, ডেকে ডেকে বেদম হয়ে পড়েছি! যা ঘুম তোর!

হোঁৎকা মাথা নাড়ে,—কি খাওয়াইছে ব্যাটারা কে জানে, তহন হতে ঘুমই আইত্যাছে।

চমকে উঠি, ওই ব্যাটা টেকো মালের কীর্তি। হোঁৎকাকে ধরাধরি করে পাশের প্লাটফর্মে গুয়া যাবার জন্যে অপেক্ষমান ট্রেনে তুলে মালপত্র তুলে নিজেরাও বসি। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনটা ছেড়ে দেয়।

শাখা লাইনের ট্রেন—স্টেশনগুলো দূরে দূরে। তখন সবে দু-চারজন যাত্রী উঠেছে ট্রেনে। তারাই বলে ওঠে,—এ তো গুয়ার ট্রেন লয় বটে, ই টেরেন যাবেক বাদাম পাহাড়।

আবার চমকে উঠি। একদিকে যেতে গিয়ে পথ ভুলে চলেছি অন্যদিকে। আর পটলা হঠাৎ বলে,—আমার সাইড ব্যাগটা পাচ্ছিনা-স্ সাইড ব্যাগ? ওর মধ্যে পটলার নিজের কিছু জামাপ্যান্ট আর দরকারি বই কাগজপত্র ছিল। সেটা নেই।

এবার হোঁৎকাও তার পকেট হাতড়ে বলে,—আমার টাকা! শ'তিনেক টাকা রাখছিলাম, টিকিটসমেত গায়েব।

রাগে গা পিত্তি জ্বলে যায়,—যা মাংস খা গে—চেনা নেই জানা নেই, খাবার দেখলে হামলে পড়িস!

পটলা বলে,—ও-ওই ব্যাগে মামাবাবু একখানা জরুরি চিঠি, ম্যাপ পাঠিয়েছিল; সেটাও গেছে।

এবার জান-প্রাণ না যায়!—গোবরা মন্তব্য করে ঃ ওদের মতলব ভালো না।

আমারও তাই মনে হয়। ওরা কাজ সেরে নিঃশব্দে মাঝপথে কোথাও নেমে গেছে। আর হয়তো তার দলেরই একজন টাটানগরে আমাদের এই ভুল ট্রেনে তুলে অন্যদিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে।

লোকগুলো কারা? তাদের পরিচয়ও জানতে পারিনি, এখন গুয়া যাই কি করে? আবার কি টাটানগরে ফিরে যেতে হবে?

পাহাড় বনের মধ্যে দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে ওই শালবনের মধ্যে দু-একটা ছোট স্টেশন মত পড়ছে, দু-দশজন আদিবাসী যাত্রীরা ওঠানামা করছে।

ওদেরই একজনকে দেখে মনে হয় লেখাপড়া জানে। আমাদের জিজ্ঞাসার জবাবে সেই-ই বলে—সামনে একটা জংশন স্টেশন পড়বে। ওখান থেকে গুয়া স্টেশনে অনেক খালি মালগাড়ি যায় 'আয়রন ওর' আনতে। গার্ডকে বলে ম্যানেজ করতে পারলে ওই মালগাড়িতে সোজা গুয়া স্টেশনে যেতে পারবে বিকেল নাগাদ।

এবার একটু আশার আলো দেখতে পাই। সদলবলে নেমে পড়ি জংশনে।

কানার মধ্যে ঝাপসা যাকে বলা হয় সেই স্টেশনটা তেমনি। তবু একটা চায়ের স্টল আছে, লোকজনের মুখ দেখা যায়। তবে চতুর্দিকে পাহাড়। তার বুক বেশ গভীর বনে ঢাকা। স্টেশনে যাত্রী চলাচল বিশেষ করে না। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, বড় বড় মালগাড়ি ইঞ্জিনে টেনে নিয়ে

চলেছে, ওইসব ওয়াগানে চলেছে লালচে মাটি মাখা এখানের বিখ্যাত আয়রন্ ওর। দুর্গাপুর-বার্নপুর বোকারো-ভিলাই-রাউরকেল্লার লোহা। কারখানাতে যাচ্ছে এত মাল। আর বেশ কিছু খালি মালগাড়িও গুয়া মাইনস্ বা অন্য মাইনস্-এর দিকে যাচ্ছে।

তেমনি এক মালগাড়ির গার্ডসাহেবকে খুঁজে বের করলাম।

গার্ডসাহেব-এর সঙ্গে তার এক বন্ধুও চলেছে। বেলা তখন প্রায় এগারোটা। গার্ডসাহেব ওই স্টেশনে গাড়ি থামিয়ে তখন লাঞ্চ সারতে ব্যস্ত। সেই বন্ধুও রয়েছে।

মেনু দেখে মনে হল পান্তা ভাত—সঙ্গে চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি আর পিঁয়াজ তৎসহ কাঁচালঙ্কা।

খেতে খেতে সে আমাদের দিকে চেয়ে বলে,—গুয়া যাবে? পাঁচজন? ঠিক আছে। এই কমপার্টমেন্টেই চলো। তবে ফাইভ ইন্টু ফাইভ—টোয়েনটি ফাইভ রুপিজ দিতে হবে।

শেষ অবধি রফা হল কুড়ি টাকায়।

আমাদেরই গরজ, তাই ওতেই রাজি হয়ে মালগাড়িতে উঠলাম। ট্রেনও ছাড়ল। ওমা! দেখি, মাঝে মাঝেই গাড়ি থামছে, আর মালগাড়িতে উঠছে দেহাতি আদিবাসীর দল, কোথায় হাট বসবে—হাটে চলেছে তারা আনাজপত্র, শালপাতার বোঝা, খেজুরপাতার চাটাইয়ের স্তূপ নিয়ে। ছাগল-মুরগির দলও রয়েছে সঙ্গে।

আমাদের করার কিছুই নেই। খিদেও পেয়েছে। সঙ্গের খাবার কখন শেষ হয়ে গেছে। পথের ধারে স্টেশন মেলে শুধুমাত্র জাম, আর বনের কেঁদপাকা। ওই খেয়েই চলেছি।

ট্রেনটা এবার পাহাড় আর বনের গভীরে ঢুকে পড়েছে। আর মালগাড়িটা যেন ওই গার্ড মিঃ গোমসের বাপের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। এ পথে ওই ভাবেই চলেছি।

খিদেতে পেট জ্বলছে। মন মেজাজও ভালো নেই, হোঁৎকা গুম হয়ে আছে। ওর ভুলের জন্যই আমাদের এই অবস্থা।

পটলা বলে, আর দেরি নাই, এর পরের ইস্টিশনই গু-গু-।

হোঁৎকা বলে,—ওসবে কাম নাই—চুপ মাইরা বস তো! এহন তোর মামার বাড়ি যাতি না বনে?

আমি বলি,—তা সত্যি, বনভ্রমণের পারমিট আর ডরমেটরিতে থাকার চিঠিখানা অবশ্য আছে। কিন্তু বনে যাবার জিপ ভাড়ার টাকা, সেখানে ক'জনের থাকা খাওয়া, ফেরার ভাড়া এবারের মত যথেষ্ট টাকা তো নেই। সব টাকা তো ওই বদমাইস সাফ করে দিয়েছে।

হোঁৎকার মুখে এতক্ষণে হাসি ফোটে,—মাল কিছু সরাইয়া রাখছি। হোঁৎকারে এত বুদ্ধু ভাবস ক্যান?

এই বলে হোঁৎকা এবার নিজের পায়ের মোজাটা খুলে তার ভিতর থেকে বেশ কিছু টাকা বের করে।

আমাদের পকেটে এখান ওখানে কুড়িয়ে কাড়িয়ে সাড়ে তিনশো। আরও দুশোর মত বের হয়। হোঁৎকা এবার বলে,—চ, বনেই যাই গিয়া। সস্তায় বনে যাবার কোন ব্যবস্থা হইব মনে হয়। তাইলে বনে ক'দিন থাইকা বের হবার মুখে পটলার মামার লগে দেখা কইরা দরকার হয় কিছু ক্যাশ লইয়া কলকাতা ফিরুম।

কথাটা আমাদের মনে ধরে। পটলাই ভেবেচিন্তে বলে,—তা মন্দ বলিস নি হোঁৎকা। বনে ঢোকার আগে ম-মামার বাড়ি গেলে মামা যা লোক, তাতে আর বনে যেতেই দেবে না। তার

চেয়ে আগেই ব-বনে চল।

ট্রেন ঘন বনপাহাড়ের বুক চিরে এবার এই লাইনের শেষ ইস্টিশনের দিকে ছুটে চলেছে।

ট্রেন থেকে নেমেছি, চারিদিকে গভীর বনে ঢাকা পাহাড়, বিশেষ করে তিন দিকে যাবার পথ নেই। এক দিকে বেশ খানিকটা উপত্যকা—কিছু সারবন্দি পাতা বাড়ি। ওদিকে একটা ছোট্ট ঝোরা, পাহাড় থেকে জলধারা বুকে নিয়ে আপন খুশিতে ছুটে চলেছে।

ওই ঝোরার ধারে চোখে পড়ে একটা ধাবা। স্টেশনের বাইরে এসে এবার খিদেটা চাগিয়ে ওঠে। বেলা প্রায় একটা বাজে। এখান থেকে বনের গভীরে সেই থলকোবাদ বাংলোয় যাবার চেষ্টা করতে হবে।

ঝোরার ধারে ধাবায় এসে দোকানদারের কাছে রুটি তড়কার অর্ডার দিয়ে এবার ওই ঝোরার জলেই ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে খাটিয়ায় এসে বসলাম।

দোকানদার কি ভেবে বলে,—রূপসিংকে দেখলাম বটে ট্রাকে মাল নিয়ে এসেছে!

দোকানের ছেলেটা বলে,—ওই তো—ঝোরার ধারে ওর ট্রাক ধোলাই হচ্ছে।

খিদের মুখে ওই পোড়া মকাই বাজরা মেশানো ফাটা ফাটা রুটি আর ঝাল ঝাল তড়কাই যেন অমৃত লাগছে। বেশ কয়েকখানা করে খেয়ে ঢক্‌ঢক্ করে জল গিলে যেন দম ফিরে পেলাম। এবার মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে থাকি—কী করা যায়?

এমন সময় দশাসই একটা লোক, মুখ যেন চাষ দেওয়া জমির মত কর্কশ, পরনে ঢিলে পায়জামা আর পাঞ্জাবি, পায়ে নাগরা, ধাবায় এসে লাথি মেরে একটা খাটিয়াকে সরিয়ে দিয়ে ওপাশের খাটিয়ায় বসল। বসেই হুঙ্কার ছাড়ল, আবে লৌন্ডা, রোটি, এক প্লেস মাংস—সাথমে আন্ডা তড়কা লানা ফটাফট।

ওর পিছনে চামচিকের মত শীর্ণ একটা লোকও রয়েছে। নির্ঘাত চামচা। সেও এবার মেজাজ নিয়েই শীর্ণ গলায় হাঁক দেয়,—আবে শুনা, জলদি খানা লাগা।

ধাবামালিক এসে বলে—ওই রূপসিং, জঙ্গলের কনট্রাকটারের ড্রাইভার। খুব কামকা আদমি। উস্‌কো বলো—ও যদি লিয়ে যায়।

ক্যা? থলকোবাদ বাংলোমে যায়েগা? রূপসিং, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের দেখল। তারপর ঠা ঠা করে হেসে ওঠে। বলে ঃ ক্যা বনবাংলোমে নৌটঙ্গি হোগা? নাচা-গানা-বাজনা?

অর্থাৎ ও আমাদের দেশওয়ালী নাচগানের দলই ভেবেছে, জানাই,—না। এইসে ঘুমনে যায়েগা। জঙ্গলমে যানেকা পারমিট, বাংলোকা ডরমেটারিমে রহনে কা পারমিট ভি হ্যায় সাথমে।

সব শুনে এবার বলে সে,—ঠিক হ্যায়। ট্রাকমে লে যায়েগা বাংলোমে। ফি আদমিকে লিয়ে দশ রুপিয়া।

ওই চামচিকের মত স্যাঙাতটা সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলোয়। এক পয়সা কম হলে নেহি চলেগা, হ্যায় তো নিকালো, ফটাফট!

ট্রেনেও বেশ কিছু টাকা গার্ডকে গচ্ছা দিতে হয়েছে ভুল ট্রেনে চাপার জন্য। আবার এখানেও পঞ্চাশ টাকা! পুঁজিও কম, তারপর ফেরার খরচা আছে—সেখানে থাকা খাওয়ার খরচও কম নয়, অথচ টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে, ওই দূরের স্টেশনে ফেরার শেষ ট্রেনটা তখনও রয়েছে।

বলি—চলরে, ফিরেই যাই। পয়সার অবস্থা করুণ। ঢের হয়েছে, চল ফিরে যাই।

হোঁৎকাই এবারের সর্বনাশের জন্য দায়ী—সেই-ই বলে—নারে আসছি যহন, ফিইর‍্যা যামু না। টাকা যেমন কইরা হোক জুটাইমু, কিরে গোবরা, বল!

ঠিক আছে।—রূপসিংকে বলি,—সর্দারজি, চল্লিশ টাকা নাও, কৃপা করকে।

চারখানা কড়কড়ে দশটাকার নোট দেখে সর্দারজি কি ভেবে বলে,—ঠিক হ্যায়, যাও, ট্রাকমে ওঠো। আরে এ পটকা, জলদি কর—

সেই চামচিকের মত ওর হেল্পারের নাম তাহলে পটকা।

পটকা ট্রাকের ডালাটা খুলে দিতে আমরা একে একে উঠছি ট্রাকে। পটকা বলে,—হম্‌কো পাঁচ রুপেয়া, কমিশন!

ট্রাকটা তখনও ছাড়েনি, হঠাৎ একটা জিপের শব্দে চাইলাম। লাল ধুলো উড়িয়ে চড়াই ভেঙে জিপটা ঠেলে উঠছে। হুডখোলা।

ওই জিপের সামনের সিটে বসা লোকটাকে দেখে চমকে উঠলাম।

গত রাতে ট্রেনের সেই লোকটা, জিপের পিছনে তার দুটো সেই চ্যালাও মজুত আছে।

হোঁৎকার চোখ জ্বলে ওঠে—হেই হালায় দেহি, ওইতো খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ দিইয়া কাল বিবাক লই গেছে গিয়া, হালায়,

—ওকে থামাই, বলি,—এখন বীরত্ব দেখিয়ে লাভ নেই, চুপ কর।

লোকটা রূপসিংকে কি সব বলে জিপ নিয়ে চলে গেল। রূপসিং ওকে নমস্কার জানাল। মনে হল রূপসিং ওর কর্মচারীও হতে পারে।

চামচে পটকা বলে,—শেঠজি বহুত বড় ব্যাপারী আছে। কাঠগোলা-স মিল, ট্রাক-বহুৎ সা ধান্দা।

অর্থাৎ লোকটা যা করেছে তা প্ল্যান করেই করেছে। পটলার মামার দেওয়া এই দামি ম্যাপটাও নিয়ে গেছে বিশেষ মতলবে। বনে ঢুকে কি বিপদে পড়ব কে জানে!

কিন্তু ওসব ভাবার উপায় বা সময় কোনটাই নেই। ট্রাক চলতে শুরু করেছে বনের দিকে।

বেশ কিছুটা এসে ফরেস্ট গেট। দেখা গেল, ওই রূপসিং এদের খুবই চেনা। তাই ট্রাক আসতেই গেট কিপার গেটের বাঁশটা তুলে ধরল। রূপসিং ওই গেটকিপারকে একটা কাগজে মোড়া বোতলের মত কি বস্তু দিল। লোকটাও একগাল হেসে মাথা নাড়ল।

দু'পাশে গভীর গহন বন—তার বুক চিরে মোরাম ঢালা সরু রাস্তাটা লাল সিঁথির মত চলে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। কখনও পাহাড়ের ঢালুতে নেমে যাচ্ছে, কখনও চড়াই।

এরপরই আসল খেলা শুরু হয়।

ঝড়ঝড়ে ট্রাকটা নীচে নেমে একটা ঝোরায় আটকে গেছে। চাকাটা বসেছে মাটিতে। ইঞ্জিন গর্জন করে গাড়ি এগোয়।

রূপসিং চিৎকার করে,—আরে এ পটকা—লৌন্ডা লোগ্‌কে উতারকে ট্রাক ঠেলনে বোল্ জলদি। নেহি তো চাক্কা আউর দাব যায়েগা, গাড়ি নেহি চলেগি!

অর্থাৎ এই গহন বনে হাড় কাঁপানো শীতের রাতে এখানেই পড়ে থাকতে হবে।

তাই প্রাণভয়ে আমরাও নামলাম, ঠেলছি প্রাণপণে ট্রাকটাকে, ওদিকে রূপসিংও ইঞ্জিনের সব শক্তি প্রয়োগ করে গাড়িটাকে তুলতে চাইছে। চাকাটা খানিকটা উঠেছে এবার...বোঁ বোঁ

বইঘর.কম

করে ঘুরছে আর তার থেকে নরম লাল লাল কাদামাটি মেশা জল ছিটিয়ে পড়ছে। হোঁৎকা আর গোবরা ছিল ওদিকে, ওদের দুজন মুহূর্তে অচেনা হয়ে গেল। নরম লাল মাটির কাদা স্প্রে করে ওদের দুজনকে যেন কেষ্টনগরের মাটির কোন কিম্ভূত মূর্তি বানিয়ে দিয়েছে।

ট্রাকটা কোনমতে উঠল। আমরাও ধুলোকাদা মাখা অবস্থায় ট্রাকে উঠলাম, চালু হল ট্রাক।

কিন্তু এবার শুরু হল অন্য উৎপাত। শুকনো পথে এসেও ইঞ্জিন প্রায়ই বন্ধ হয়, আর রূপসিং চেঁচায়,—আবে পটকা, ছোকরালোগ্‌কো বোলো ঠেলনে হোগা। উত্তরে হোঁৎকা গর্জে ওঠে হালায় পয়সা লইছে দশ টাকা, আবার ঠেইল্যা দিতি হবে? ঠ্যালার মজুরি দাও!

রূপসিংও চেঁচায়, তব্ পড়ে, রহে জঙ্গলমে। রাতমে হাতি আয়েগা, খেল খতম! ঠেলরে ছোকরা, জাদা বাত মৎ কর।

আমরা চুপ করে যাই। ওই ড্রাইভার এখন তার নিজের জগতে এসে পৌঁছেছে। ডাঁট তো দেখাবেই। আমাদের করার কিছুই নেই।

বনের মধ্যে এবার সমতল মত। তবে অরণ্য এখানেও গভীর।

হঠাৎ ট্রাকটা আবার থেমে গেল। পাশে ওদিক থেকে একটা জিপও এসে দাঁড়াল। রূপসিং ট্রাক থেকে নেমে গিয়ে লোকটাকে সেলাম করে।

মাঝবয়সি একটি বলিষ্ঠ লোক, পরনে দামি চামড়ার জ্যাকেট, চোখে গগল্‌স। রূপসিং এগিয়ে গিয়ে ওর হাতে একটা ব্রিফ কেস তুলে দিয়ে বলে, পঞ্চাশ হাজার দিয়া শেঠজি। আরও কিছু দামি লগ, আর হাতির দাঁত চেয়েছে, ভালো দামই দেবে সাব্।

লোকটা মাথা নেড়ে বলে,—

ডিপোতে চলে যাও—পিছে বাতচিত হবে।

বলেই জিপটা হাঁকিয়ে চলে যায় সে।

সব দেখে শুনে হোঁৎকা বলে,—শুনলি ওদের কথা? এসব শালা একটা গ্যাঙ।

পটলাও বলে, স্-সেই ট্রেনের লোকটাকে দেখছি এখানে কিসের ধ-ধান্দা রে?

হোঁৎকা বলে,—শোনস নি—হালায় চোর কাঠ হাতির দাঁত, বাঘের চামড়া এসবের বিজনেস করে? চোরের দল।

বলি, এসব তো বেআইনি কাজ রে। বনের দামি গাছ চুরি করে কাটছে, হাতি মারছে, বাঘ মারছে। বনকে তো এরাই শেষ করে দেবে রে। পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

হোঁৎকা বলে—হে ত করছেই, আর আমাগোরও পথে বসাইছে, ওগোরে ছাড়ুম না।

পটলা বলে—এখন চ-চুপ কর, ম-মাথা গরম করিস না।

ট্রাকটা এসে থামল, এদিকে-ওদিকে পাহাড়ের বুকে সামনের উপত্যকায়। কিছু বসতি দেখা যায়। বোধহয় ফরেস্ট অফিস, ফরেস্টের কর্মীদের কোয়ার্টার। রাস্তার ধারে একটা ছোট পাহাড়ী নদী কুলকুল করে বয়ে চলেছে।

ওপারের উপত্যকায় আদিবাসীদের কিছু ঘর, রঙিন লাল-কালো ছাই দিয়ে রং করা—বেশ পরিষ্কার।

আর একটা পথ সামনের পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে, পাহাড়ের মাথায় বিস্তীর্ণ সমতলে বনবাংলো ডরমেটরি।

রূপসিং-এর চ্যালা পটকা বলে ওঠে,—উতরো। থলকোবাদ বাংলো আগিয়া, ওহি পাহাড়কা উপর মে।

অর্থাৎ যাত্রা শেষ। আমরাও নেমে পড়লাম ঝুপ্‌ঝাপ্ করে, তখন বৈকাল হয় হয়।

সামনের নদীর জলধারা দেখে হোঁৎকা বলে,—তরা যা গিয়া, ডরমেটরিতে সিট রেডি কর। আমরা স্নান কইর‍্যা যাইত্যাছি উপরে। আমরা তিনজনে ওই পাহাড়ী চড়াই ভেঙে উপরের দিকে চলেছি, বেশ চড়াই, উঠতে বুকে টান ধরে। উপরে দেখা যায় বাংলোর কিছুটা।

গৌরব দত্ত ভেবেছিলেন, মিলিটারির জাঁদরেল অফিসার হবেন। মনে মনে তিনি স্বপ্ন দেখতেন, লড়াই-এ যাবেন। কামান বন্দুক চালাবেন, ইয়া গোঁফ আর দশাসই চেহারায় খাকি প্যান্ট আর শার্ট পরে পাড়ার মাঠে ছেলেদের ড্রিল করাতেন, হেঁড়ে গলায় চিৎকার করতেন ট্যান্ সেন—

জীবনে এর বেশি আর কিছু হয়নি গৌরব দত্তের। কারণ নিদারুণ ভূতের ভয়! দিনের বেলাতেই সেবার নাকি ভূত দেখে ভিরমি খেয়েছিলেন। মিলিটারি ভূতগুলো নাকি বেজায় শয়তান।

তাই মিলিটারিতে কিছুদিনের জন্য ভর্তি হয়ে ওই কঠিন জীবনের পরিশ্রম দেখে আয়েশি দত্তকুলতিলক মিলিটারি ছেড়ে পালিয়ে আসেন।

কিন্তু তার হাঁকডাক তবু যায় না, বরং বেড়ে ওঠে। এখনও গৌরব দত্ত খাকি প্যান্ট বুশশার্ট পরেন। আর মিলিটারির স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রেখেছেন ইয়া টাঙির মত একজোড়া পুরুষ্টু গোঁফ।

এককালে কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি ব্যবসাপত্র ছিল দত্ত পরিবারের। কিন্তু সে দুই পুরুষ আগে।

এখন কিনারাম, ভোগারাম থেকে বেচারামের দিনে এসে পড়েছে ওই দত্ত কুলতিলক। বিষয়-আশয় বাড়ির অংশ এখন বিক্রি করে দিয়ে বেলেঘাটার দিকে একটা ভাড়াবাড়িতে স্ত্রী মালতীদেবী আর তাদের দুই মেয়ে বর্ণা আর পর্ণাকে নিয়ে থাকেন। রোজগারপাতিও নেই গৌরব দত্তের, টুকটাক দালালি করে যা পায় তাতে সংসার, মেয়েদের লেখাপড়ার খরচাও জোটে না।

বেলেঘাটার দিকে গৌরব দত্তের পৈতৃক প্রায় বিঘে খানেক জায়গা আছে। অতীতে এখানে ছিল জলা বাঁশ ঘেঁটু বন।

হঠাৎ একদিন কলকাতার ওই দিকটাও বাড়তে শুরু করল! বস্তি-জলা বুজিয়ে বিশাল বিশাল বাড়ি, চওড়া রাস্তা তৈরি হল। আর তারপরই ওই পূর্বপ্রান্তের বিস্তীর্ণ জলা বুজিয়ে শুরু হল সল্টলেক সিটি। ব্যস তারপর থেকেই ওইসব জায়গা হয়ে উঠল সোনার খনি। তিন-চার লাখ টাকা কাঠা।

গৌরব দত্তের ওই একবিঘের বাঁশবনের দাম উঠে গেল সত্তর লাখ টাকা।

আর চিটেগুড়ের আশপাশে যেমন মাছি জুটে যায়, তেমনি গৌরব দত্তের ওই সোনার খনির লোভেও তার আশপাশেও এসে জুটলো বেশ কিছু ছোট বড় মেজো ধরনের প্রমোটার।

কেউ এর মধ্যে দত্তসাহেবকে মেজর দত্তই বানিয়েছে, কেউ আনে নানারকম ভেট, দাদা বৌদিদের সেবার জন্য ব্যস্ত।

এদের মধ্যে গৌরব দত্ত আর মালতী দুজনে কুনাল চৌধুরীকেই বেশি বিশ্বাস করে ফেলে। কুনাল চৌধুরী এর আগে দুটো বড় বাড়ি বানিয়ে বেশ ভালো লাভ রেখেই বিক্রি করেছে।

কুনালের এই ফ্ল্যাট বিক্রি করা ছাড়াও নানান ব্যবসা আছে। নিজের একটা অ্যামবাসাডার ছাড়াও সাইটে ঘোরার জন্য বেশ শক্ত পোক্ত জোঙ্গা জিপও আছে। তাছাড়া আছে কাঠের ব্যবসাও।

কুনালই বলে গৌরব দত্তকে,—মেজর সাহেব, আপনি হবেন আপনার জমিতে বাড়ি তৈরির প্রজেক্টের হাফ পার্টনার। জায়গা আপনার, বাড়ি তৈরির খরচ আমার। আপনার একটা ফ্ল্যাট থাকবে ওখানে আর লাভের আধা বখরা। আপনাকে ঠকাতে চাই না।

মালতীও খুশি হয়। বলে সে স্বামীকে,—এ তো ভালো কথা, তুমি রাজি হয়ে যাও।

গৌরব দত্তও তা জানে। কারণ তার সংসার চলে এখন কুনালের টাকাতেই। না চাইতেই কুনাল ওদের টাকা দেয়, তাদের দেখভাল করে। দত্তসাহেবের জন্য বিলেতি পাইপ, সেরা তামাক আনে।

মালতী দত্ত প্রতিবারই মাসখানেকের জন্য কলকাতার বাইরে কোথাও বেড়াতে যায়। দত্ত পরিবারের এই বাৎসরিক ভ্রমণের ব্যাপারেও খরচ আছে। অথচ দত্তের তেমন কোনো ধরাবাঁধা রোজগার নেই।

এবার সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে আসে ওই কুনাল চৌধুরী। সেই-ই বলে,—এবার চলুন সারাঙ্গার জঙ্গলে। দারুণ বন পাহাড় আর বাংলোও সুন্দর। বেশ নিরিবিলিতে কিছুদিন কাটিয়ে আসবে সবাই মিলে। হিল্লি দিল্লি তো অনেক দেখলেন, এবার প্রকৃতির রাজ্যকেই দেখুন।

মালতীও বলে,—তাই চলো, এবার বনেই যাই।

গৌরব দত্ত বলে,—বনবাসে রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়ার কী হবে? কিছুই তো মেলে না সেখানে। কুনাল বলে,—সেখানের বাংলোর চৌকিদারই রান্নাবান্না করে দেবে। গাড়ি থাকবে। সপ্তাহে দু'দিন বাইরের শহরে এসে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যাব। ওখানে আমার অনেক চেনাজানা। কোনও অসুবিধা হবে না।

গাড়িতে প্রায় সাড়ে চারশো কিলোমিটার পথ, সকালে কলকাতা থেকে বের হয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যা আটটা নাগাদ ওরা এসে বনের বাইরের শেষ শহর বড়বিলেই রইল একটা হোটেলে।

গৌরব দত্ত বলে,—তবে বনে রাতের বেলাতেই ঘুরতে হয়। না হলে বনকে চেনা যায় না। মালতী বলে,—রাত বিরেতে বাঘ সিংহের সামনে যাবে?

গৌরব দত্ত তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে,—দূর! সেবার বুঝলে কুনাল, আফ্রিকার নাইরোবির জঙ্গলের গভীর রাতে জিপ নিয়ে ঘুরছি। ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেল। দেখি তিন দিকে তিনটে লায়ন ওৎ পেতে বসে আছে। মুখোমুখি দু'ঘণ্টা বসে কাটিয়েছি। সকাল হতে ওরা ঘুমোতে চলে গেল—আমিও জিপ ঠিক করে বের হয়ে এলাম। তাই বলছি, আফ্রিকার জঙ্গলে হেসে খেলে বেড়িয়েছি, তোমাদের সারাঙ্গা!

কিন্তু পরদিনই সারাঙ্গার আসল রূপ দেখে ঘাবড়ে যায় গৌরব দত্ত। সকালেই ওরা শহরে হাট-বাজার সেরে জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে ব্রেকফাস্ট সেরে বের হয়ে সারাঙ্গার দিকে।

বিশাল পাহাড়গুলোর গা গভীর শাল সেগুন পিয়াশাল গামার নানা গাছে ঢাকা। পথটা ওই গভীর বনের বুক চিরে চলেছে। নীচে দিনের আলো ঠিকমত ঢোকে না। আবছা অন্ধকার আর ভিজে ভিজে। গাছগুলোয় শেওলা জমেছে।

গাছের বাকলগুলো কারা যেন কিছুটা টেনে ছিঁড়ছে। ড্রাইভার বলে,—বুনো হাতিতে ওই বাকলগুলো খায়।

অর্থাৎ এই বনে হাতিদের আস্তানাও আছে। গৌরব দত্ত বিপন্ন চোখে এদিক ওদিকে তাকায়!

জিপটা চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। উপরের দিকে জঙ্গল কিছুটা কম। গৌরব দত্তর ভয় তবু যায় না। কেন যে মরতে শহর থেকে দূরে এই গভীর জঙ্গলে এসেছে, যত বাজে শখ। মালতী তখন খুব হৈ চৈ করছিল এখন এই গভীর জঙ্গলে ঢুকে তারও কথা বন্ধ হয়ে গেছে বরং তাদের মেয়ে পর্ণা আর বর্ণা খুশি হয়েছে।

দত্তসাহেব ধমকে ওঠে—চুপ কর। জঙ্গলে গান গাইতে নেই, জন্তু জানোয়ার এসে পড়বে।

কুনাল বলে না-না। গাক্ না! কোন ভয় নেই। গাড়িকে কোনো জন্তুই অ্যাটাক করবে না।

তবু বনের মধ্যে এখানে কিছু ফাঁকা জায়গা বাড়িঘর আছে। বনবিভাগের রেঞ্জারের অফিস স্টাফ, গার্ডদের বাসা। ওদিকে বেশ কিছু আদিবাসীদের ঘরবাড়ি ক্ষেতও রয়েছে।

আর ওপাশে টিলার উপর সুন্দর বাংলোটা দেখে ভালোই লাগে এবার মালতীর। পাহাড়টার মাথা উড়িয়ে সমতল করে সেখানে টেরাস গার্ডেন করা হয়েছে। ওদিকে ফরেস্ট বাংলোর আর একটা নতুন সংযোজন। ওখানেই রয়েছে ডরমেটরি আর কিছু ঘর।

ওই ফরেস্ট বাংলোর তিনটে ঘরে এসে উঠেছে গৌরব দত্ত আর কুনাল চৌধুরী।

এবার চৌকিদার বলে,—বাড়িতে জরুর বিমার। হামি দশদিন ছুট্টি নিয়ে যাচ্ছে।

অবাক হয় কুনাল,—তাহলে বাংলোয় রান্নাবান্না কাজকর্মের কী হবে?

চৌকিদার বলে—আমি একজন লোক দিয়ে যাচ্ছি।

মালতী বলে,—সে পারবে তো?

চৌকিদার বলে,—একটু সমঝে দেবেন।

চৌকিদার তো গেল! রেখে গেল ওই লোকটিকে। বাংলোর পিছনে একটা চালা মত, একটা মহুয়াগাছের নীচে সেই চালাটাই রান্নাঘর, ওপাশে বাংলোর মাথায় একটা ট্যাঙ্কি বসানো। হ্যান্ডপাম্প আছে, ওতে পাম্প করে নীচের ওই ঝোরা থেকে জল তুলতে হয়।

নতুন লোকটা একেবারে কিছুই জানে না। খাস বুনো। ভাত যা রেঁধেছে, তাকে পিণ্ডিই বলা যায়, আর রুটি! ওদের ময়দার তালকে একটু হাতে গোল করে আগুন ঝলসেছে, ভিতরে কাঁচাই রয়েছে। আর সবজি রেঁধেছে তাতে ভয়ানক ঝাল!

গৌরব মুখে দিয়ে গর্জে ওঠে,—একেবারে অখাদ্য!

লোকটা বলে মিনমিনে গলায়,—হম ই কম না করব!

ব্যস, অকূল পাথারে পড়ল মালতী। বলে সে,—কাজের লোক নেই, জল ওই নীচের ঝোরায়, এখন রান্না খাওয়ার কী হবে? কী করতে এই পোড়া বনবাসে এলাম গো!

কুনালও বের হয়ে গেছে। বিপদে পড়েছে এবার গৌরব দত্ত। বলে সে স্ত্রীকে—আহা, এত ভেঙে পড়লে চলবে না। দেখি কোনো লোকজন পাই কি না।

গোবর্ধন আর হোঁৎকা গা হাত পা ধুতে ঝোরার জলে নেমেছে। দুজনে স্নান সেরে লুঙ্গি বদলে পাথরে বসে জিনিসগুলো কেচে নিচ্ছে হঠাৎ কার ডাকে পিছন ফিরল হোঁৎকা, গোবরা।

গৌরব দত্ত। বলে সে,—কাজ করবে? অবশ্য খাওয়া থাকা ছাড়া মাইনেও দেব।

এ যেন মেঘ না চাইতে জল। গোবরা জানে ফান্ডের অবস্থা। এখন কিছু টাকার দরকার। তাই গোবরা শুধোয়,—কি কাজ স্যার? কোথায়?

দত্তসাহেব এগিয়ে আসে। বলে,—না কাজ তেমন কিছু নয়, ওই বাংলোয় আমরা দিন দশেক থাকব, একজন রান্নাবান্নার কাজ করবে, অন্যজন বাংলোর কাজ, ফাই ফরমাস খাটবে। থাকা খাওয়া ফ্রি আর দিনে তিরিশ টাকা করে পার হেড, দুজনে ষাট টাকা।

হোঁৎকা কি বলতে যাবে, গোবরা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,—এসব কাজ আমাদের করা স্যার, ওর নাম উদয় চাঁদ, জামশেদপুরে হোটেলে রান্নার কাজ করে। আর আমিও সেখানেই থাকি। রুম সার্ভিসের লোক। বেড়াতে এসেছি।

দত্তসাহেব খুশি হয়—গুড। ভেরি গুড। তাহলে কাজে লেগে যাও।

হোঁৎকা আবার কি বলতে চায়, গোবরা তাকে থামিয়ে দেয়,—কিন্তু টাকাটা ভেরি 'এস্‌মল' স্যার—ওটা পার হেড অন্তত ফর্টি করুন। নইলে—দত্ত সাহেব এমন সুযোগ ছাড়ে। তাড়াতাড়ি বলে, ঠিক আছে! তাই হবে। চলো।

ওদের নিয়ে দত্তসাহেব দিগ্বিজয়ী বীরের মত বাংলোয় উঠে এল। বাংলোর বাগানে মালতী মেয়েদের নিয়ে মুখ কালো করে বসে আছে। জল নেই রাতের খাওয়াও বোধহয় হবে না। কালই ফিরে যেতে হবে তাদের এই সুন্দর জগৎ থেকে।

এমন সময় দত্তসাহেব ঢোকে, এই উদয় আর এই বোধন—তোমার নতুন কাজের লোক, এদের কিচেন আর ওপাশের আউট-হাউস দেখিয়ে দাও, ওরা দুজনে ওখানে থাকবে।

উদয় দারুণ রান্না করে, হোটেলের কুক। আর বুধো, তুমি মালপত্র রেখে ওই হ্যান্ডপাম্প চালু করো। ট্যাঙ্কে জল তুলতে হবে।

একটা চালাঘরই বলা যায়, দুটো নড়বড়ে তক্তপোষ পাতা। এই ওদের থাকার জায়গা। হোঁৎকা ঘরে ঢুকে ধপ্ করে বসে চেঁচিয়ে ওঠে,—এডা কি হইল? আমি উদো—হোটেলের কুক আর তুই বুধো—বেয়ারা? এহন?

হাসে গোবর্ধন—দিনে থাকা খাওয়া ফ্রি আর দুজনের আশি টাকা আমদানি। ছ-দিনে যাবার ভাড়া সব উঠে যাবে। ওদিকে ফান্ড তো 'নিল'। এই টাকাটার খুব দরকার। উদো বুধো সেজে কদিন নাটক করে যা। আর রান্না ভাত ডাল রুটি সবজি এসব হয়ে যাবে। যা চা বানা—দেখলাম পাঁউরুটি মাখন ডিম সবই আছে মায় কলাও। খিদে লেগেছে চা দে সাহেবদের। আমাদেরও সাঁটানো হবে। তুই কিচেনে যা, আমি ট্যাঙ্কিতে জল তুলে দিচ্ছি।

গোবরার স্বাস্থ্যটা আমাদের মধ্যে সরেস। সে গিয়ে হ্যান্ড পাম্প চালাতে শুরু করে এবার। বাংলোয় খুশির সাড়া ওঠে। বর্ণা বলে,—মা, টাঙ্কিতে জল এসে গেছে।

গুম হয়ে বসেছিল মালতী। তখনও চা মেলেনি। বিকেল হয়ে গেছে। হঠাৎ কার ডাক শুনে তাকাল।

মেমসাব চা—!

একেবারে ট্রেতে করে চা বিস্কুট এনে হাজির করেছে উদো,—নতুন কুক। দত্তসাহেব খুশিতে ফেটে পড়ে,—দ্যাখো, কেমন কাজের ছেলে দেখো! গুড-ভেরি গুড।

আমরা ওপাশের বিল্ডিং-এর একতলায় ডরমেটরিতে ঠাঁই পেয়েছি তিনজন তিনটে বেডে।

ওদিকে পাহাড়ের নীচে একটা ক্যান্টিন আছে। ফরেস্ট কলোনির কিছু স্টল যারা এই বনবাসে ফ্যামিলি আনেনি, তারা খায় টায়, বিকেলে চা আর পোড়া বিস্কুটই মিলেছে এখানে। এখনই রাতের খাবারের কথা বলতে হবে অথচ হোঁৎকা আর গোবর্ধনের দেখা নেই।

পটলা শুধোয়,—দু-দুটোতে গে-গেল কোথায় বলত? শে-শেষে বাঘের পেটেই যায়নি তো?

এইসময় ওদিক থেকে হোঁৎকা আর গোবরা এসে পড়ে। গোবর্ধন কিছু বলার আগে হোঁৎকা বেশ ডাঁটসে একখানা একশো টাকার নম্বরী নোট পটলাকে দিয়ে বলে,—জ-জমা কইরা রাখ। ফিউচারে আরও দিমু।

অবাক হই,—টাকা কোথায় পেলি এখানে?

—আরও পামু, ডেলি।

হোঁৎকার কথায় অবাক হই। গোবরাই বলে,—বিজনেস ব্রেনটা কামে লাগালাম রে। ও এখন উদো—বাংলোর কুক, আর আমি বুধো, বেয়ারা। দুজনে জামশেদপুরের হোটেলের ছুটিতে বেড়াতে এসেছি। থাকা-খাওয়া ফ্রি। ডেলি মাইনে চল্লিশ ইনটু টু অর্থাৎ আশি টাকা।

বলি,—এ কাজ কখনও করিসনি। পারবি?

হোঁৎকা বলে,—পারুম, গিন্নীমা দিদিমণিরা ভালোই, ওই ধাড়িটা বেড়ালের ল্যাজের মত গোঁফ লইয়া হুমহাম করে। হাঁ, তোরা আমাগো চিনস না, আমরাও চিনি না। বুঝলি?

ঘাড় নাড়ি। তারপর বলি,—এ কেমন বেড়ানো রে? কোন কিছু করার নেই, ঘোরার নেই, নো অ্যাডভেঞ্চার?

হোঁৎকা বলে—দেখা যাক।

আর এখানেও যে করার কিছু আছে সেটা হোঁৎকা, গোবর্ধন সন্ধ্যার পরই বুঝতে পারে।

সন্ধ্যা নেমেছে বন পাহাড়ে। চারিদিক অতল অন্ধকারে ডুবে গেছে। এর মধ্যে হোঁৎকা কিচেনে কাঠ জ্বেলে রুটি ডাল সবজি করেছে।

মালতীও এসে হাত লাগায়। গোবরা ওদিকে বাংলোর ঘর ঝাঁট দিয়ে হ্যারিকেনের পলতে ঠিক করে বাতি জ্বেলেছে।

এইসময় বাংলোর বাইরে একটা জিপ এসে থামল, তার থেকে নামছে বলিষ্ঠ একটি মূর্তি। পরনে প্যান্ট, ঊর্ধ্বাঙ্গে চামড়ার জার্কিন, মাথায় টুপি।

গৌরব দত্তের প্রমোটার কুনাল।

সকালেই লাঞ্চ করে কুনাল বের হয়েছিল। কাজকর্ম সেরে এখানে ওখানে ঘুরে আদিবাসী বসতিতে গিয়ে মালের ব্যবস্থা করে এসেছে।

আসলে কুনাল তাদের দিয়ে চোরাশিকার করায়। হাতির দাঁতের দাম এখন দশ হাজার টাকা অবধি এক কেজির। একটা হাতির দুটো দাঁত-এর ওজন অন্তত কেজি আষ্টেক হবেই।

একজোড়া দাঁতের দাম অন্তত সত্তর হাজার টাকা। আর বাঘের চামড়ার দাম তো লাখ-এর উপর। তা বাদে হরিণের, চিতার চামড়া, ময়াল সাপের চামড়ার দামও কম নয়। এছাড়া দামি কাঠ পাচার তো করেই, গোপনে দামি গাছ কেটে রাতারাতি পাচারও করে।

মেজর দত্ত বলে,—আর বলো না কুনাল, তোমার চৌকিদারের লোক তো কিছুই জানে না। রান্না অখাদ্য, পাম্পে জল নেই—ভেগেছে।

সেকি! তাহলে উপায়? চমকে ওঠে কুনাল স্নান করতে হবে যে!

হাসে দত্তসাহেব। বলে,—উপায় করেছি হে। যিনি খান চিনি, তারে জোগান চিন্তামণি, তোমার কুক, বেয়ারা সবই পেয়েছি। ট্যাঙ্কিতে জলও রেডি। তবে ডেইলি দুজনকে আশি টাকা দিতে হবে।

কুনাল খুশি হয়,—নো ম্যাটার। দেবেন।

শিস দিতে দিতে সে তার ঘরের দিকে চলে যায়। মালতী এবার হাঁক পাড়ে,—উধো! ছোটা সাহেবের জন্য ওমলেট আর চা আন। বুধো,—সাহেবের ঘর সাফ হয়েছে?

বুধো অর্থাৎ গোবরা প্রথমে খেয়ালই করেনি কে বুধো। তাই সাড়াও দেয়নি। এবার গিন্নীমার ডাকে চমক ভাঙে গোবরার,—দেখছি মেমসাহেব।

হোঁৎকা সাহেবের জন্য চা-বিস্কুট আর ওমলেট নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে দেখে, কুনাল তখন গোবরাকে নিয়ে পড়েছে।

রোজ মাইনে নিবি, আর কাজে ফাঁকি? গোবরা বলে,—আপনি ছিলেন না তাই সাফ করি নি।

—আবার জবাব। রাস্কেল ইডিয়ট!

হোঁৎকা চা ওমলেট নিয়ে ঢুকে ওই লোকটাকে দেখেই চিনে ফেলেছে। এই লোকটাই সেই চোরা শিকারিদের লিডার, বনের শত্রু। টাকার গরমে এর মেজাজও এখন সপ্তমে চড়ে আছে।

হোঁৎকা বলে,—গালি দ্যান কেন স্যার? কি করতি হবে কন, বুধো কইরা দিচ্ছে। চা ন্যান।

কুনাল ভ্রূ কুঁচকে তাকালো, দ্যাখো, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না, গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

কিচেনে হোঁৎকা রান্না করছে, গোবরা এসে বলে, এ চাকরি ছেড়ে দেব।

হাসে হোঁৎকা—না। ওই লোকটার ঘর সাফ করার সময় খোঁজ কর মাল চালানের কাগজ, নোট বই। কোথায় কী করে, সব খবর নে। ওর মেজাজের বারোটা বাজাইমু।

কুনালকে খেতে হবে। আজ রাতেও মাল যাবে, কিছু হাতির দাঁতও পেয়েছে, কাঠের নীচে পাতা ডালের ভিতর কৌশলে ওই দুটোকে সবুজ রং করে ডাল সাজিয়ে পাচার করে। শেঠজির আড়তে মাল পৌঁছলে তার দায়িত্ব শেষ।

রাতের বেলায় জিপে চলেছে কুনাল। ও জানে না ওর পিছনে জিপের সিটের নীচে গুঁড়ি মেরে মালপত্রের আড়ালে চলেছে হোঁৎকা। একটা কালো কম্বল চাপা দিয়ে।

কুনাল চলেছে বনের মধ্যে একটা বস্তিতে।

সর্দার মত একজন বের হয়ে আসে বস্তি থেকে। ওদের কথায় বস্তির নামও জানা যায়—তিরুল পোষি।

অবাক হয়ে হোঁৎকা দেখে, দুটো হাতির দাঁত আর চ্যাটাই-এ মোড়া কিছু হরিণের চামড়া দেয় সে। টাকাও দেয় তাকে কুনাল।

বইঘর.কম

তারপর ওরা আসে বনের মধ্যে যেখানে ওদের কাঠ কাটাই হচ্ছে কাঠুরিয়াদের অস্থায়ী বস্তিতে।

জিপের ভিতর থেকে সব দেখছে হোঁৎকা। পচা চামড়ার বিশ্রী গন্ধে এতক্ষণ তার দমবন্ধ হয়ে আসছিল, সেগুলো নিয়ে গেছে।

হোঁৎকা দেখে একজন গালকাটা লোককে, পরনে খাকি পোশাক। ফরেস্ট গার্ড। কুনাল চৌধুরী তাকে কিছু টাকা দিচ্ছে। লোকটা যেন ঘেয়ো কুকুরের মত লেজ নাড়ছে ওর সামনে। বলে সে,—ভাববেন না সাব। ট্রাক কেউ আটকাবে না। সব চেকপোস্টে বলা আছে। শচীন মহান্তিকে সবাই চেনে।

ওরা ফিরছে এবার বাংলোয়। জিপ থেকে নেমে কুনাল খুশি মনে বাংলোয় তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো শিস দিতে দিতে। এখনও গভীর রাত্রি। হোঁৎকা সাবধানে নেমে তার ওই চালাঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঢুকল। গোবরা তখন নিশ্চিন্তে নাক ডাকাচ্ছে, হোঁৎকার এই অ্যাডভেঞ্চারের খবরও জানে না।

বাংলায় বেয়ারা আর কুক হওয়ার যে এত ঝকমারি তা হোঁৎকা, গোবরার মগজে আসেনি। তখন এমন চাকরি পাকা ফলের মত সামনে আসতে খপ্ করে ধরে নিয়েছিল। এরপর হাড়ে হাড়ে বুঝেছে ওই কুনাল চৌধুরীর মত একটা অমানুষের কাছে চাকরি করার জ্বালা কী!

হোঁৎকার রাতে ওইসব করতে গিয়ে ভালো ঘুম হয়নি, ভোরের দিকে ঘুম এসেছে, এমন সময় গৌরব দত্তের হাঁক-ডাকে ঘুম ভেঙে যায়।

গৌরব দত্তের ভোরে ওঠা অভ্যাস, তখনই বেড-টি চাই। বেড-টি না হলে তার প্রাতঃকৃত্যাদি হবে না, এরপরে হাফপ্যান্ট আর কেড্স পরে মর্নিং ওয়াকে বের হবে।

তাই ভোরেই হাঁক পাড়ে,—এই উদো—ওঠো, উঠে পড়ো, বেড-টি বানাও।

এখনও তো রাত আছে স্যার।—হোঁৎকা জবাব দিতে গিয়ে দত্তসাহেবের হাতের ওয়াকিং স্টিক-এর খোঁচা খায়,—আবার জবাব। গেট আপ, হাউ লেজি বয়।

উঠতে হল হোঁৎকাকে। সাহেবের জন্য চা চাপায়। দত্তসাহেব এবার খোঁচা মারে গোবর্ধনকে, ইউ বুধো, উঠে পড়ো—

স্যার!—গোবরা পিট পিট করে বলে, এখন তো অনেক রাত।

সাট আপ! ওঠো, এই জুতোগুলো একটু সাফ করে রং পালিশ করে বাংলোর বারান্দায় ঝাঁট দিয়ে চেয়ার টেবিল লাগাও।

সাত সকালে হোঁৎকা চা চাপিয়েছে আর গোবরা বসেছে সাহেব মেমসাহেবদের একগাদা জুতো নিয়ে, রং পালিশ করছে আর গজগজ করছে,—ছিঃ ছিঃ, সাতসকালে জুতো পালিশ!

হোঁৎকাও দেখেছে। বলে সে,—কর! তারপর দেখছি ব্যাটাদের। এর মধ্যেই কুনাল চৌধুরী গর্জন করে ওঠে,—চা লাগা! কী করিস ব্যাটারা? সব কটাকে লাথি মারতে হয়। তবে সযুত হবি তোরা।

গৌবর দত্ত মর্নিং ওয়াকে বের হয়েছে। পাহাড়ের উপর থেকে নামছে। ওদিকে কাঠের ব্রিজ পার হয়ে বড় রাস্তার ধারে যাবে ফরেস্ট কলোনির দিকে। আপন মনে গান করতে করতে চলেছে। হঠাৎ মনে হয় কে যেন বনের ভিতর থেকে বের হয়ে তার সঙ্গে দুলকি চালে হেলে দুলে চলেছে। বোধহয় বাংলোর কোনো বোর্ডারই।

দত্তসাহেব তাকে সম্বোধন জানায়,—গুড মর্নিং!

সঙ্গীটা সাড়া দেয় না। তবে পাশে পাশেই চলেছে। গৌরব দত্ত বলে,—কোথা থেকে আসা হচ্ছে? হ্যাল্লো—

হাতটা বাড়াতেই লোমশ গায়ে হাত পড়তে চমকে উঠল গৌরব দত্ত!

ভোরটা এখানে মনোরম। নতুন কচি পাতা এসেছে শালবনে, মহুয়া ফোটার দিন, ভোরের বাতাস মহুয়ার মিষ্টি গন্ধ, আর মহুয়ার লোভে এখন ভালুকের আনাগোনা বেড়ে যায়, বন থেকে একটা ভালুকই কি কৌতূহলবশে গৌরব দত্তকেও ভালুক মনে করে এসে জুটেছে। আর এবার ভালুককে নাগালের মধ্যে দেখে দত্তমশাই পরিত্রাহি চিৎকার করে দৌড়চ্ছে বাংলোর দিকে।

বাঁচাও, বাঁচাও—!

ওর ওই চিৎকারে উপর বাংলো থেকে হোঁৎকা গোবরা দুটো চ্যালাকাঠ নিয়ে দৌড়ে এসেছে, পিছনে মালতী তার মেয়েরা আর্তনাদ করছে—একি সর্বনাশ হল গো!

দত্তমশায় দুহাত তুলে তুড়ি লাফ খাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। ব্যাপার দেখে লজ্জায় বনের ভালুকও সরে গেছে। নীচের বাংলো থেকে আমরাও ছুটে গেছি।

ভালুক তখন নেই। একা গৌরব দত্তই তখনও ওই উদ্দাম নৃত্য সহযোগে চিৎকার করে চলেছে। কুনাল চৌধুরী তো বন্দুক নিয়ে বের হয়ে আসে। বলে সে,—উড়িয়ে দেব ব্যাটাকে, এখানে ভালুক। অবশ্য বনের ভালুক তখন বনে, কুনাল চৌধুরী গোবরাকেই এবার বন্দুকের নল পেটে লাগিয়ে শাসায়,—সাহেবকে একা কেনে যেতে দিলি? যদি কিছু হত? এবার তুই সাহেবের সঙ্গে থাকবি। না হলে গুলি করে শেষ করে দেব। এ যেন গোবরারই দোষ! লোকটা একেবারে জানোয়ার।

হোঁৎকা গোবরা একফাঁকে এসেছে আমাদের ঘরে, বলি,—এই চাকরি তোদের! জুতো সাফ করছিস আর উঠতে বসতে ধমকাচ্ছে ওই লোকটা। চাকরি ছেড়ে দে।

হোঁৎকা হাসে,—শেষতক দেইখা যা। গোবর্ধনও এর মধ্যে অপারেশন শুরু করেছে। কুনাল চৌধুরীর ঘর সাফ করার অবকাশে এবার গোবরা বিছানার তলে ওর নোটবইটা হাতিয়েছে।

তাতে বেশ কিছু পার্টির নাম ঠিকানা আছে। যাদের সঙ্গে ও চোরাই কাঠ, বাঘ-চিতা-হরিণের চামড়া, হাতির দাঁতের কারবার লেনদেনও করে। মায়, কোন আদবাসী বস্তির কে ক'টা হাতির দাঁত দিয়েছে—চামড়া দিয়েছে, তার জন্যে কত টাকা নিয়েছে সে সব হিসাবও আছে।

আর আছে বুলাকী সোরি নাম। এই শেঠই মূল মদতদার আর মহাজন। হোঁৎকাও চিনেছে শেঠজিকে।

বলে, এই ব্যাটাই ট্রেনে আমাগো কাগজপত্র মাল সব লইয়া গেছে। আর এই ব্যাটাই ওই কুনালকে দিয়া এই জঘন্য কাজ করায়। ওটারেও দেখাইমু।

হোঁৎকার মুখে কুনালের এই আসল ব্যবসার কথা শুনে চমকে উঠি আমরা। পটলা বলে—

—ব্যাটা দেশের শত্রু। বনের শত্রু।

হোঁৎকা বলে—তাই ওর সব খবরই জোগাড় করেছি এবার বাধা দিতেই হবে।

বলি—কী করে তা সম্ভব? ওদের বহু লোকজন, অনেক বড় চক্র ওদের। আর ফরেস্টের বাবুরাও যে টাকার লোভে ওর দলে কেউ নেই তা কি করে বলি। সরষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে, সেই সরষে দিয়ে ভূত ছাড়ানো যায় না রে।

বইঘর.কম

পটলা বলে—স-সবাই এমন নয়। দেখ না রেঞ্জার সাহেবকে বলে যদি কিছু করতে পারি।

আমাদের কলকাতায় চিঠি দেবার কথা ছিল গুয়া স্টেশনে নেমে। বনে ঢোকবার আগে। কিন্তু সব ওলটপালট হয়ে গেছে—কোনমতে ট্রাকে চেপে বনে এসেছি, চিঠি দেবার কথা মনে ছিল না।

তাই কলকাতায় পটলার ঠাক্‌মা ভাবতে শুরু করেছে। একমাত্র বংশধর তার নাতি পটলচন্দ্রের জন্যই। আমরা তো ফাউ।

তাই পটলের বাবা কলকাতা থেকে ওই বড় বিলের বড় নেতা ওদেরই কোন আত্মীয় পল্টুবাবুকে ফোন করে। যেমন করে হোক বনবাংলো থেকে এই ছেলেগুলোর খবর চাই।

পল্টু মিত্র এখানকার এম. পি। বড় ব্যবসাদারও। আর তেমনি দশাসই চেহারা, পল্টু মিত্র ফোন পেয়ে ভাবছে জঙ্গলের মধ্যে ফরেস্ট বাংলোয় যাবে কি না, কিন্তু কতকগুলো জরুরি কাজে তাকে দু'দিনের জন্যে পাটনা যেতে হবে। তারপরে বনে যেতে পারে, এর মধ্যেই অবশ্য খবর নিতে হবে।

তাই ফরেস্ট অফিসে চলে এল সে। দেখা হয়ে গেল থলকোবাদ-এর রেঞ্জার মিঃ ওঝার সঙ্গে। মিঃ ওঝা সৎ নিষ্ঠাবান অফিসার।

পল্টুবাবু বলে,—মিঃ ওঝা আপনার ফরেস্ট বাংলোয় পটল মানে প্রবুদ্ধকুমার মিত্র আর বন্ধুরা উঠেছে কি?

ওঝাজি বলে,—হ্যাঁ-হ্যাঁ স্যার। ক'জন ইয়ং বয় এসেছে বটে প্রবুদ্ধ মিত্র ইয়ে পটলবাবু থাকতে পারে ওদের মধ্যে।

পল্টুবাবু বলে,—নিশ্চয়ই আছে। আপনি একটু গিয়ে ওর খবর নিয়ে আপনাদের অফিসে রেডিওগ্রাম করে দেবেন। আমার ভাগ্নে! ওকে একটু সাহায্য করবেন দরকার হলে। আমি পাটনায় চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে কাজ সেরে ফিরে এসেই বনবাংলোয় যাব ওদের দেখতে। আপনি আজই গিয়ে বিকেল নাগাদ রেডিওগ্রাম করবেন, আমি কলকাতায় মেসেজ দিয়ে দেব।

মিঃ ওঝা বলে,—ঠিক আছে স্যার।

হোঁৎকা-গোবরা গোপনে বেশ খবর সংগ্রহ করেছে। হোঁৎকা জেনেছে, এর মধ্যে কিছু হাতির দাঁত, বাঘের চামড়াও এসে যাবে।

খাবারে বিষ মিশিয়ে ওরা বনের বাঘকে মেরে ফেলে। হাতিকে গর্তের গভীরে কৌশলে ফেলে তাকে শেষ করে তার দাঁত হাড়গুলোও বস্তাবন্দি করে চালান দেয়। ভালো দামে বিক্রি হয় বাজারে।

আরও মাল পাচার করা হবে দু'একদিনের মধ্যে। তার তোড়জোড় চলেছে। ভাবছি, রেঞ্জারকে বলব কি না!

যেতে আর হল না। আমাদের ডরমেটরিতে এসে ঢুকলেন বলিষ্ঠ খাকি পোশাক পরা একটি ভদ্রলোক। আশ্চর্য, ইনিই তো রেঞ্জার সাহেব।

মিঃ ওঝা শুধোয় ভাঙা বাংলায়,—পটলবাবু কৌন আছে।

পটল তাকাল। রেঞ্জার বলে,—হামি মিঃ ওঝা। এখানের রেঞ্জার। তুমি এম. পি সাহেবের ভান্‌জা তা তো বলোনি। এসেছ, এখানে বাড়িতেও চিঠি দাওনি। আভি বড়বিল

হেডকোয়ার্টারে রেডিওগ্রাম করে তোমাদের খবর জানাতে হবে এম. পি সাবকে, উনি কলকাত্তায় ফোন করে দিবেন। সব ঠিক আছে তো পটলজি?

পটল এবার মওকা পেয়ে বলে,—এখানে আমরা ভালোই আছি। কিন্তু বিরাট গড়বড় চলেছে। ওই কুনাল চৌধুরী বহুৎ বেআইনি কাজ করছে।

হোঁৎকাও ছিল এখানে। ও বলে,—হালায় বনকে সাফ কইরা দিব আর হাতি বাঘ হরিণও মাইরা শেষ কইরা দিব। ই বন যেন ওর বাপেরই।

মানে?—মিঃ ওঝা চমকে ওঠেন।

হ্যাঁ, রেঞ্জার সাহেব।—আমি বলি—এর ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

মিঃ ওঝা বলেন,—কিন্তু প্রমাণ? সব খবর তো চাই।

হোঁৎকা বলে—যদি দিতি পারি?

মিঃ ওঝা দৃঢ়কণ্ঠে বলেন,—আমাকে বিশ্বাস করতে পারো! সব প্রমাণ পেলে আমি কাউকেই ছাড়ব না, সে যেই-ই হোক।

গোবরা বলে—শেঠ বুলাকি দাসই এদের মাথা, কুনাল চৌধুরী আর সে দুজনে এই সর্বনাশ করছে। সব খবর প্রমাণ কাগজপত্রও আপনাকে দেব আজই।

তাহলে সন্ধ্যার পর—রাতে এসো। না হয় দুপুরে নিরিবিলি থাকি, তখন এসো।

দুপুরবেলা দত্তসাহেব খেয়ে-দেয়ে নাক ডাকেন আর কুনাল বের হয়ে যায় বনের গভীরে ওর চোরা-কারবারের ধান্দায়।

এই দুপুরেই উদো বুধোর ছুটি মেলে। আজ উদো বলে মালতীকে,—মেমসাব, বস্তি থেকে কিছু আনাজপত্র, সবজি আনতে হবে।

মালতী বলে—কিছু টাকা নিয়ে তাই আনো গে।

ওরা দুজনে বের হয়। কাগজপত্র নিয়ে আমরাও চলে গেছি ফরেস্ট রেঞ্জারের অফিসে।

রেঞ্জার মিঃ ওঝার কাছে কিছু খবর ছিল বেআইনি কাঠ পাচার হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু এইভাবে একটা চক্র তো কিছু বেআইনি কাজ করে চলেছে সে খবর ছিল না। আজ তাই ওই কাগজপত্র, নোটবই-এর ঠিকানা দেখে তিনিও সব নোট করে নেন।

হোঁৎকা বলে—ওই সব আদিবাসী গ্রামের কিছু সৎ মানুষকে ওরা সর্বনাশা চোর ডাকাত বানিয়েছে। ওরাই বনের জানোয়ারদের মারছে—দামি গাছ চুরি করে কাটছে।

মিঃ ওঝা বলেন,—ওই কুনালকে হাতে-নাতেই ধরতে হবে। হোঁৎকা বলে,—সব খবরই দিলাম, ওই লোকগুলোর উপর নজর রাখুন আর কুনালের বন কাটাই যেখানে হচ্ছে সেখানেও রাতে নজর রাখুন সব দেখতে পাবেন। দু-একদিনের মধ্যে এরা আরও কিছু হাতির দাঁত, বাঘের চামড়া চোরাই কাঠ পাচার করবে।

এদিকে বাংলোয় ফিরে কুনাল উদো বুধোকে না দেখে গর্জন শুরু করেছে। দত্তসাহেবও গর্জায়,—কোথায় যায় ব্যাটারা? চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব, এখনও চা হল না? বিকেল হয়ে গেছে।

আমরা ফিরে এসেছি বন অফিস থেকে, হোঁৎকা গোবরাও ওখানেই ছিল। তারপর ওরা বস্তিতে গেছে।

ফিরছে দুজনে কুমড়ো-পেঁপে-মুলো আর আন্ডা নিয়ে, কুনাল লাফ দিয়ে গিয়ে হোঁৎকার জামার কলার ধরেছে,—ইউ রাস্কেল।

আমরাও ব্যাপারটা দেখে চটে উঠি। পটলাই বলে, চুপ করে থাক।

হোঁৎকা বলে—দ্যাখছেন তো স্যার, বস্তিতে খুঁইজা খুঁইজা সবজি আন্ডা আনতে গেছলাম। কাল থেকে বাজার আসেনি তো।

চোপ। জিভ টেনে ছিঁড়ে দেব। যা চা করগে।

হোঁৎকা জবাব দিল না। ওই জানোয়ারটার এ সবের সে কঠিন জবাবই দেবে। তাই সব অপমান মুখ বুজে সহ্য করে চলেছে।

সন্ধ্যা নামে। শাল মহুয়া গামার বনে আঁধার ঘনিয়ে আসে, কুনাল দিনভোর ঘুমিয়েছে, এবার রাতে তার কাজ শুরু হবে। আজই প্রচুর মাল পেয়ে গেছে সে। দু'জোড়া বিরাট হাতির দাঁত এসেছে, একটা আসলি বাঘের চামড়া—আর প্রচুর দামি রোজউড গাছও কেটেছে তারা।

ওদের গেটও খোলা থাকবে। ট্রাক-বোঝাই ওই লাখ লাখ টাকার মাল বন থেকে বের হয়ে শেঠজির গুদামে পৌঁছে গেলে তার কোনও দায়িত্ব আর থাকবে না।

জিপ নিয়ে রাতের অন্ধকারে বের হয়ে গেল কুনাল চৌধুরী।

ওদিকের ঘর থেকে গৌরব দত্তের নাকে তখন ব্যান্ড ব্যাগপাইপ বাজছে। অন্যঘরে গিন্নীমা মেয়েরাও গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

হোঁৎকা গোবরা ওদের পিছনের চালাঘর থেকে দরজাটা ভেজিয়ে বের হয়ে এসে আমাদের ডাকে,—আয়।

খবর আগেই দেওয়া ছিল মিঃ ওঝাকে। তিনি এর আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে তৈরি হয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

আমাদের দেখে বলেন,—এসো। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

হোঁৎকা বলে—আইজ রাতে ওর মাল যাইব। শোনলাম চারখান হাতির দাঁত জোগাড় করছে, এ্যাকখান খাস রয়্যাল বেঙ্গলের চামড়া।

—ইস্। এইভাবে বনের হাতি বাঘকে মারছে ওরা? তবে আজই ওদের খেলা শেষ। আমি হেড কোয়ার্টারে ওয়ারলেস করে স্পেশাল ফোর্স পোস্টিং করেছি। বনে, ফরেস্টের আশপাশে। ফরেস্টের স্টাফরাও জানে না। আজ ওদের বেরুতে দেব না, হাতে-নাতেই ধরব। চলো—!

আমরা ফরেস্টের জিপেই রওনা হলাম। বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল জিপটা অন্ধকারেই। হেডলাইট জ্বাললে দেখতে পাবে ওরা—তাই তারার আলোয় বনের বুকে মোরাম ঢালা রাস্তায় জিপটা কিছু পথ এসে থামল। আমরা নেমে এবার নীরবে বনের ভিতর চলেছি গাছের আড়ালে।

রাতের অরণ্যে বিচিত্র শব্দ ওঠে। ভারী বাতাসে কেমন অজানা সুবাস। হঠাৎ বনের এদিকে এসে সামনে কিছুটা ফাঁকা জায়গায় দেখা যায় আলো জ্বলছে। দু-তিনটে মশাল জ্বেলে ওরা ট্রাকে মাল তুলছে। দামি দামি কাঠ—ওই সব বহু মূল্যবান মালপত্র তুলে ট্রাক বোঝাই করে এবার ওরা রওনা দেবে।

আমরা সরে এলাম। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। রাক্ষুসে মশার কামড়ে হাত-পা জ্বলছে! পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যায় নীচের রাস্তা দিয়ে ট্রাকটা রাতের অন্ধকারে খুব অল্প আলো জ্বেলে কোনমতে চলেছে। আর এবার বেশি দামি মালই যাচ্ছে। তাই পিছনে জিপ নিয়ে চলেছে কুনাল চৌধুরী নিজে, যাতে ফরেস্ট চৌকিতে কেউ না আটকায় বনের বাইরে বের হতে পারলে আর তাকে কেউ ধরতে পারবে না।

মিঃ ওঝাও তাঁর ওয়ারলেস মেশিনে বনের মধ্যেকার চেক পোস্ট আর মোবাইল গার্ডদের গাড়িতে খবর দিতে থাকেন। তারা যেন রেডি থাকে। ওই ট্রাককে ধরতেই হবে। এবং জিপের আরোহী ওই কুনালকেও। কোনোমতে যেন পালাতে না পারে।

আমরা ফরেস্ট বাংলোতে ফিরে এসেছি। হোঁৎকা গোবরাও ফিরে গেছে তাদের সেই চালাঘরের আউটহাউসে। যেন কোথাও কিছুই ঘটেনি। বাংলোর ওদিকের ঘরে তখনও ওই দত্তসাহেবের নাকের বাদ্যিতে কাড়া নাকাড়া বেজে চলেছে। ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কুনাল ফেরেনি।

ঘুম ভাঙে সকালে। এখানের সকালটা বেশ মিষ্টি! রকমারি পাখির ডাকে বনভূমি ভরে ওঠে। গাছে গাছে বসন্তের আগমনী, শাল গাছে এসেছে নতুন কচি হলুদ পত্রমঞ্জরী, মহুয়া ফোটে। বাতাসে তারই মদির সুবাস।

বাংলোটা তখনও নিঃশব্দ। হঠাৎ গর্জন শোনা যায় গৌরব দত্তের,—বেড টি হল না। এখনও এত ঘুম! গুলি করে উড়িয়ে দেব! এ্যাই উদো—!

উদো ওরফে হোঁৎকা শুয়েছে দেরিতে। এখন সেই ভালুক দেখার পর থেকে দত্তসাহেব বেলা না হলে মর্নিং ওয়াকে যায় না। তবু ভোরে চা তার চাই-ই। আর ভালুকের ভয়ে বন্দুক নিয়ে ঘোরে, বাংলোর সামনের লনে।

হোঁৎকা বলে,—দিচ্ছি তো।

আবার জবাব! সাট আপ! গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেবো!

হোঁৎকা বলে—এত গুলি করলে এ চাকরি আর করুম না! আমি রেজিগনেশন দিত্যাছি সার!

বুধো ওরফে গোবরাও বলে—আমি চাকরি করব না।

হোয়াট। দুটোকেই গুলি করে শেষ করব। অবাধ্য ইডিয়ট-রাস্কেল, দেখছ বন্দুক!

রীতিমত বন্দুক তুলে ধমকাচ্ছে দত্ত, এমন সময় হঠাৎ এসে পড়েন পল্টুবাবু নিজে। পাটনার কাজ সেরে আসার সময় পেয়েছেন তিনি।

পটলা ওঁকে আসতে দেখেই চিনেছে। আমরা সকালে লনেই বসেছিলাম। মামাবাবুকে দেখে পটলা এগিয়ে যায়।

পল্টুবাবুও বলে,—ভালো আছিস তো!

বলতে বলতে সে ফেরে দত্তের দিকে,—একি করছেন? গুলি করবেন নাকি?

দত্তসাহেব গর্জে ওঠে,—হু আর ইউ? আমরা লোককে গুলি করি কি না তা আমি বুঝব। তার জন্য আর কারোকে কৈফিয়ত দিতে রাজি নই। গেট আউট—!

পল্টুবাবু নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখছে ওই বিচিত্র লোকটাকে।

এমন সময় জিপ নিয়ে এসে হাজির হয় রেঞ্জার মিঃ ওঝা। এসেই এম-পি সাহেবকে দেখে নমস্কার করেন।

—স্যার, আপনি!

পল্টু বাবু বলে,—এরা কারা! কথায় কথায় গুলি চালাতে যায়?

এবার মিঃ ওঝা বলে,—ডেঞ্জারাস লোক স্যার! ওদের একজনকে আজ হাতে-নাতে ধরেছি। এতদিন ধরে জঙ্গলের বহু ক্ষতি করেছে ওরা। ধরেছি আজ মালসমেত। তাই ওদের এখনি বাংলো থেকে বের করে দেব। এমন লোকদের বনে থাকার পারমিটও ক্যানসেল করে দেবো।

দত্তসাহেবের দিকে মিঃ ওঝা এগিয়ে যায়।

দত্তসাহেব শুনেছে ব্যাপারটা। শুধোয় সে,—মানে?

মিঃ ওঝা বলেন,—আপনারা এ মুহূর্তে সব চার্জ মিটিয়ে বাংলো ছেড়ে বনের বাইরে চলে যান। এখানে থাকার হুকুম নেই।

মানে,—এবার গৌরব দত্ত মিনমিনে গলায় বলে, আগে কুনাল আসুক।

মিঃ ওঝা বলে,—সে আর আসবে না। সে এখন পুলিশ হাজতে। সেখান থেকে সদর আদালতে তোলা হবে।

চমকে ওঠে গৌরব দত্ত। টাকাকড়ি কোনো কালেই তার ছিল না। চিরকাল পরের পয়সাতেই ক্যারামতি করেছে। আজও বাংলোর খরচ, যাতায়াত সব ওই কুনালের ঘাড়েই চলেছে।

সুতরাং অথৈ জলে পড়ে যায় দত্তসাহেব।

মিঃ ওঝা বলেন,—বের হয়ে আসুন বাংলো থেকে। আমি এখনই আপনাদের বের করে ওই ঘর তালাবন্ধ করে দেব। আর অফিসে গিয়ে চার্জ মিটিয়ে চলে যান আজই এখান থেকে।

দত্তসাহেবের বেলুন চুপসে গেছে। সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

এবার মালতীই বলে পল্টুবাবুকে,—বাবা, সব তো কুনালের কাছে। সে যে এই ধরনের ছেলে, তা তো জানতাম না, বিশ্বাস করো। এখন এই গহন বনে কি যে করি।

মিঃ ওঝা মাথা নাড়েন,—সেটা আপনাদের ব্যাপার, আমাকে ঘর খালি করতেই হবে।

গোবরা বলে—কই দত্তসাহেব, তিনদিনের বেতন পাইনি, তিন আশি দুশো চল্লিশ টাকা, মিটিয়ে দিন চটপট। তারপর বেরোন এখান থেকে। অবশ্য আমাদের কাজও করে দিতে পারেন, করবেন নাকি?

গৌরব দত্ত অসহায়ভাবে গজরায়,—ব্যাটা কুনাল যে একটা ঠগ্ জোচ্চোর—ক্রিমিন্যাল, তা জানতাম না। এখন কী হবে?

মালতী বলে পল্টুবাবুকে,—তুমি একটা ব্যবস্থা করো বাবা।

পল্টুবাবুই শেষ অবধি ওদের নিজের গাড়িতে বের করে আনেন বন থেকে।

এখন ফরেস্ট বাংলো একেবারে খালি।

পটল বলে, মামাবাবু, ক'দিন বহুৎ ঝামেলায় কেটেছে। এবার দু-তিনটে দিন শান্তিতে বনে থাকতে দিন, সামনের বুধবার সকালে জিপ পাঠাবেন। আমরা বন থেকে আপনার ওখানে যাব।

মিঃ ওঝা সাপোর্ট করেন, তাই করুন স্যার। ছেলেদের সাহায্যেই বিরাট একটা চক্রকে ধরেছি। ওদের ক'দিন আরাম করতে দিন।

সেবার বনভ্রমণটা ভালোই জমেছিল।

পটলার ইন্দ্রজাল

পটলা ইদানীং ম্যাজিক নিয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগে ওর কাকার কাছে বহরমপুরে গিয়ে ওখানে এক সুবীরকুমার না কার যাদুর খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে ওই দিকে ঝুঁকেছে বেশ কিছুদিন থেকে।

সেই যাদুকরের তাঁবুতেই যাতায়াত করে বেশ কিছু খেলা শিখেছে, হাত সাফাই, তাসের খেলা—এসব শিখে এরপর বাক্স থেকে বের হবার খেলা প্র্যাকটিস করছে। একদিন নাকি আলমারিতে বন্ধ হয়ে নিজেই দমবন্ধ হয়ে টেঁসে যাবার উপক্রম হতে ওর ছোটকাকা আলমারি থেকে বের করে দু চারটে চড় চাপড় দিয়ে বাসের টিকিট কেটে ওকে আবার তার বাবা মায়ের কাছে ফেরত পাঠিয়েছিল।

কিন্তু পটলার ঘাড় থেকে ভূত তবু নামেনি। এখানে এসেও দিনরাত ওই সব ম্যাজিকের নক্সা হচ্ছে, বটতলার বই-এর দোকান থেকে লাল কালিতে ছাপা বহু পবিত্র ম্যাজিকের বইও এনেছে। ও বলে—নি-নিজেই ভ্যানিস্ হতে পারি, অন্‌লি একটা কোকিলের ডিম পেলে। কোকিলের ডিম স্বর্ণভস্মে রঞ্জিত করে মুখে রাখলে ম—মানুষ ত—ভ্যানিস হয়ে যায়।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—তরে ভ্যানিস্ করতি এত সব লাগ্‌বো না। ফিনিশ কইরা তরে ভ্যানিস্ করুম। ক্লাবের ফাংশন—টাকা পয়সার দরকার তাই দ্যাখ এহন ওসব ছাইড়া।

আমরাও ভাবনায় পড়েছি। ক্লাবের ডে টু ডে খরচাও কম নয়। আলুকাবলি, ঝালমুড়ি, ফুচকা, নকুলের দোকানের চা এসবের পয়সা জোগায় পটলাই। যদি এখন পি-সি সরকার এর মত ম্যাজিসিয়ান হয়ে ওঠে, দেশ বিদেশে ঘোরে আমাদের কি হবে!

কিন্তু পটলা এখন ম্যাজিসিয়ান হয়ে গেছে। বাড়ির দু'তিনটে বিড়ালের উপর নাকি হিপ্‌নোটিজম চালিয়ে তাদের কায়দা করেছে। আর তাদের করাতকল থেকে একটা ছোট মটর লাগিয়ে করাত দিয়ে এবার কাউকে দুখণ্ড করে আবার জোড়া লাগাবার চেষ্টাও করবে।

এহেন পটলা আমাদের ক্লাবের আর্থিক অনটনের কথা শুনে বলে—কু-কুছ পরোয়া নাই। এবার রাসের মেলায় ম্যাজিক দেখিয়ে ক্লাবের জন্য ম্—মোটা টাকা তুলে দেবো। ত—তোরা একটু হেল্প করলেই হয়ে যাবে।

অবাক হই—তুই ম্যাজিক দেখাবি?

হাসে পটলা বিজ্ঞের মত। বলো স—সিওর। এতদিন কি শিখলাম ত—তাহলে!

হোঁৎকা বলে—কিন্তু তাতে তো খরচা লাগবো। তাঁবু-এস্‌টেজ-যন্ত্রপাতি, বাদ্যি বাজনা—

ফটিক একপায়ে খাড়া। সে সঙ্গীত বিশারদ। এহেন মৌকা ছাড়তে সে রাজি নয়। ফটিক বলে মিউজিক এর জন্য ভাবতে হবে না। ওসব করে দেবো। বাঁশি-বেউলো-তবলা একটা ড্রাম। ওসব ক্লাবেই আছে।

বইঘর.কম

পটলা মাথা নাড়ে—গুড্! আর তাঁবু স্টেজ-এর খরচা টিকিট বিক্রি থেকেই এসে যাবে, তাছাড়াও লাভ থাকবে। ব-ব্যবসা বুঝিস?

ওটা আমাদের চেয়ে পটলা বেশি বোঝে। ওর বাবা-কাকারা এখানের বড় ব্যবসায়ী; আড়ত, তেলকল, করাতকল বড় দোকান সব আছে। পটলা বলে—নবমী ডেকরেটার এর নটবরবাবুকে বলেছি। দু-দুশো টাকা অ্যাডভান্স দিলে তাঁবু স্টেজ সব বানিয়ে দেবে।

হোঁৎকা আশাভরে বলে—তয় ভাবনা নাই। দিনকার সেল হইতে ওগো ডেলি টাকা দিমু।

পটলা তখুনি কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ে। আমরাও দারুণ উৎসাহী হয়ে উঠেছি। পটলার অঙ্কে মাথা খুব সাফ। সে দুপাতায় হিসাব করে দেখায় ডেলি দুটো শো-তে কম করে আড়াই শো টাকা ধরে পাঁচশো তো হবেই। ছুটির দিন ম্যাটিনিতেও শ'খানেক। সেটা ফালতু রোজগার। ডেলি চারশো করে হলেও দশ দিন মেলা থাকে। নিদেন চার হাজার বিক্রি হবেই। তাঁবু স্টেজ ভাড়া হাজার টাকা, পাবলিসিটি পাঁচশো, ইলেকট্রিক দুশো—টিফিন ক'জনের তিনশো। সাকুল্যে দু হাজার খরচা, আর পাচ্ছি চার হাজার। পটলা থার্ড স্যারের মত প্রশ্ন করে।

—তা-তাহলে ল-লাভ?

আমরা জানাই—দু হাজার।

দু হাজার টাকা পঞ্চপাণ্ডবের হাতে এলে এবারে হেমন্তদাকে এনেই প্রোগ্রাম করানো হবে, নিদেন সেল হবে দশ হাজার টাকা পটলা বলে,—দিস্ ইজ বিজনেস। দু হাজার থেকে—দ-দশ হাজার। লাভ আট হাজার।

মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। হোঁৎকা বেদম গ্যাস খেয়ে বলে, নাইমা পড়। পোস্টার দিমু—পটলা দি ম্যাজিসিয়ান।

আমি এর মধ্যে ডজন খানেক কবিতা লিখেছি। স্কুল ম্যাগাজিনে কবিতা ছাপা হয়েছে। তারই জোরে জানাই—ওটা না। পটলকুমারের ইন্দ্রজাল—এই হবে ব্যানার।

ভোটে ওই নামই গৃহীত হল।

পটলা বলে—দিদিমাকে হ-হাতিয়েছি। তিনশো টাকা ম-ম্যানেজড।

সুতরাং কাজে নামতে আর বাধা নেই। পটলার দিদিমার জয়জয়কার হোক। নাতি তার পি-সি সরকার হবেই এবার। গোকুল প্রেসে হ্যান্ডবিল ছাপা হচ্ছে, গোবরার মামা কোন সিনেমা হলের ম্যানেজার। তাদের চেনা প্রেসে তিনশো লাল নীল পোস্টারও ছাপা হয়ে গেছে। পটলকুমারের পাগড়িতে পালক গোঁজা ছবি সমেত (অবশ্য ছবিতে পটলাকে চেনা যাচ্ছে না)।

ডেকরেটার কোম্পানির নসুবাবু বলে—

—পাঁচশো টাকা আগাম দিতে হবে।

আমাদের বাজেট বর্তমানে দুশো টাকা, তার বেশি দেবার সাধ্য নেই। কিন্তু নসুবাবুও রাজি হবে না। বলে—অর্ধেক দিতে হবে।

তীরে এসে তরী ডোবে আর কি? ওদিকে রাসতলায় মেলার কাজ শুরু হয়েছে। বিরাট উঁচু বিজলি নাগরদোলা, হাত পা হীন মাস্টার জগুর অত্যাশ্চর্য খেলার পোস্টার পড়েছে, তাঁবুর বাঁশ খুটি এসে গেছে, দোকান পশার বসছে। আমাদের জায়গায় শুধু চ্যাটাই এ পোস্টার ঝুলছে। পটলকুমারের ইন্দ্রজালের। যেন দড়িতে ওই পটলকুমারকে আমরা লটকে দিয়েছি।

হোঁৎকা বলে—নসুবাবু একখান শয়তান—ডেভিল। শেষ অবধি আর দুশো টাকা ম্যানেজ করা হল। আখতার খাঁ কাবুলিওয়ালার পাড়াতে অনেকদিনের ব্যবসা। মাঝে মাঝে দুপুরের রোদে টাকার 'তাগাদায়' এলে গরম লাগলে ক্লাবে এসে জিরোয়। জলটল খায়। সেই সূত্রেই আমাদের সঙ্গে পরিচয়। এহেন আখতার খাঁ আমাদের সেদিন চুপচাপ বসে থাকতে দেখে শুধোয়—কি হোয়েসে বাবা লোগ্‌রা। হোঁৎকা বাবু?

হাতের মুঠো থেকে নিদেন আট হাজার টাকা বের হয়ে যাবে মাত্র দুশো টাকার জন্যে, এই খবর শুনে লম্বা চওড়া দশাসই চেহারার আখতার খাঁ-এর কঠিন বুকটা নরম হয়। বলে সে—তিক্ হ্যায় হোঁৎকাবাবু শোচো মৎ, হম্ দেগা।

অবাক হই আমরা—তুমি দুশো টাকা দেবে খাঁ সাহেব? আখতার খাঁ তামাটে দাড়ি নেড়ে বলে হ্যাঁ! লেকিন ছুদ্ দিতে হোবে। দুশো রুপেয়া দিবে, তুম্ হোঁৎকাবাবু এক মাহিনার অন্তর দোশো রুপেয়া হামাকে আসল আর চল্লিশ রুপেয়া ছুদ, দোশো চালিশ রুপেয়া হামাকে দিবে।

আমাদের কাগজে কলমে ইন্দ্রজাল থেকে নিট লাভ দুহাজার টাকা। ফাংশন করলে তো ক্লিন আট হাজার, সেটা না করলেও দু হাজার থাকছেই। পটলার হিসাব খুবই সাফ। তাই হোঁৎকা, গোবরা সমস্বরে বলে—তাই পাবে খাঁ সাহেব। কিন্তু টাকার আজই যে দরকার।

—হোবে! খাঁ সাহেব ওয়াসকিট-এর পকেট থেকে রসিদ বই বের করে বলে হোঁৎকাকে—দস্তখৎ করো। লেকিন ছুদ মে আগারি কাট লেতা হ্যায়, স্রিফ তুম্‌কো বারে পিছু লেগা।

হোঁৎকা ইংরাজিতে বেশ পাকাপোক্ত ভাবে সই করে, গোবর্ধন হল তার জামিনদার। ওর বাবার বাজারে সোনা রূপার দোকান আছে। খাঁ সাহেব তার ভিতরের পকেট থেকে দোমড়ানো দুখানা একশো টাকার নোট দিয়ে দেয়।

এরপর ঝড় বয়ে যায় পঞ্চপাণ্ডবের ক্লাবের দরমাঘেরা আস্তানায়। পটলা গিয়ে ডেকরেটারকে চারশো টাকা আগাম দিয়ে কাজ শুরু করিয়েছে। গোবর্ধন নিজে দাঁড়িয়ে থিয়েটারের স্টেজ বাঁধায়, সে ওই কাজে লেগেছে। পটলার সময় নেই।

হোঁৎকা আমি এর মধ্যে লাল শালুর উপর লম্বা টুপি, ছক্কর বক্কর প্যান্ট পরা ছবি—কোনটা বাক্সবন্দি অবস্থায় মুক্তির সংগ্রাম, করাত দিয়ে মানুষ আধখানা করার বিপর্যয় কাণ্ডের ছবি সেটে ব্যানার করেছি। আর পাড়ার ভুতো, ন্যাপলা—গোবিন্দের দল স্রেফ ভাঁড়ের চা আর লেড়ো বিস্কুট চুষে সারা এলাকার বাড়ির থাম, বটগাছ রেললাইনের গা—ভরিয়ে দিয়েছে পটলকুমারের পোস্টারে।

পটলাও খুব ব্যস্ত। নতুন খেলার মহড়া দিচ্ছে, হোঁৎকাকে সহকারী করে নিয়েছে। হোঁৎকা ওদের পাড়ার বুড়ো ভবেশ উকিলকে ম্যানেজ করে তার একটা ঢলঢলে কালো প্যান্ট আর কোট বাগিয়ে রীতিমত কাগজ খেয়ে কাগজের নল বের করার খেলাটা শিখে নিয়েছে। তারপরই পটলকুমারের সঙ্গে স্টেজে খেলা দেখাবে।

ফটিক তার চ্যালাদের নিয়ে বাঁশি—বেহালা আর ড্রামে গুরু গুরু শব্দ তুলে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক-এর মহলা দিচ্ছে। ক্লাবের থিয়েটারে লাইট দেয় পঞ্চা, সেও এসে হাজির হয়েছে একান্ন টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে দু-তিনটি ফোকাসের মুখে লাল নীল বেগুনি কাগজ লাগিয়ে আলো ফেলছে।

বইঘর.কম

আমি আর গোবরা এদিক সামলাচ্ছি। কাউন্টারেও বসতে হবে। হোঁৎকা বলে—তরাই দেখ। নগদ পয়সা হুঁশিয়ার; থাকবে গোবরার হাতে ক্যাশ।

সে বলে—ক্যাশে কিন্তু আর আশি নয়া পয়সা আছে। ইন্দ্রজাল বিশারদ পটলা বলে—তোরা কাওয়ার্ড। দেখবি আজ থেকেই পয়সা ছপ্পর ফুঁড়ে আসবে।

মেলা জমে উঠেছে এবার জোর। মাঠ—মন্দিরের চত্বর—রাসতলা, দিঘির ধার ছাড়িয়ে চলে বড় রাস্তা অবধি। আমাদের পটলকুমারের ইন্দ্রজালের তাঁবুটা পড়েছে সামনেই। লাল নীল ব্যানার-এ ওই সব বহু বিচিত্র খেলার ছবি, মাঝখানে পটলার রাজা বাদশার মত উষ্ণীষপরা ছবি দারুণ মানিয়েছে। পটলকুমার-এর অন্তর্ধান, 'ভ্যানিশিং-পটল' নাকি দারুণ খেলা!

এর মধ্যে ফটিক করতাল-হারমোনিয়াম-বাঁশি-বেহালা নিয়ে মাইকের সামনে সুরলহরী তুলছে। মাঝে মাঝে হোঁৎকা হেঁড়ে গলায় ঘোষণা করছে—মিশর এর পিরামিড থেকে যাদুবিদ্যা শিখে পটলকুমার আজ প্রথম অভিবাদন জানাইত্যাছেন দর্শকগো। আহেন—চক্ষু সার্থক করেন। পৃথিবীর নবম আশ্চর্য দ্যাখেন—শ্রীপটলকুমার-এর ইন্দ্রজাল। ফটিক এর পরই দুরু দুরু শব্দে ড্রাম বাজিয়ে চলেছে।

পটলকুমার এখন বেশ চালু হয়ে উঠেছে। স্টেজে পঞ্চা, ফোকাস ফিট করেছে, ফটিকও যন্ত্রপাতি নিয়ে বসেছে। হোঁৎকা ভূপেন উকিলের দুসাইজ বড় প্যান্ট আর ঢলঢলে কোট সঙ্গে কালো টাই বেঁধে পাকা সহকারী হয়ে গেছে।

লোকজন ঢুকছে তাঁবুতে। চেয়ার পিছনে—সামনে তেরপল পেতে লোয়ার ক্লাস। গোবর্ধন ফটাফট্ টিকিট কাটছে, পয়সা নিচ্ছে। ওদিকে বসেছে ন্যাপলা। হোঁৎকা একফাঁকে এসে দেখে যায়।

বলছে—বিক্রি বাটা ক্যামন রে?

জানাই—লোয়ার ক্লাস ফুল, আপার ক্লাসও ফুল হয়ে যাবে।

হোঁৎকা বলে—ভেরিগুড। তালি তিন শো ট্যাকা হইব।

ওদিকে পাটকলের মজুর-রা ঢুকছে দল বেঁধে, কুলেপাড়ার রতে, নীলু—পিকুদের দলকেও দেখলাম টিকিট কেটেছে। ওরা পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের শত্রু, আমাদের ফাংশানে এসে পিক্ দেয়, গোলমাল করে। থিয়েটারে আওয়াজ দেয়। সে তো বিনাপয়সাতেই করে কিছুটা রেখে ঢেকে। এখন পয়সা দিয়ে ঢুকছে। কী হবে কে জানে। বলি হোঁৎকাকে—পটলা সব ম্যাজিক ট্যাজিক ঠিক ঠিক দেখাতে পারবে তো রে।

হোঁৎকাও এখন পটলকুমারের এক নম্বর চ্যালা। সেও নাকি এই ম্যাজিকের দলকে আরও বড় করবে। দেশবিদেশে ঘুরবে। তাছাড়া পয়লা শোতেই হাউসফুল হতে দেখে হোঁৎকার সাহস বেড়ে গেছে। বলে সে—পারবে না মানে? ওর নাম দেখস্ ফাইটা পড়বো ফার্স্ট শোর পরই। দশদিনে হক্কল শো হাউসফুল টানব। আর 'ভ্যানিসিং পটলা' আইটেম খান্ যা করছে—হক্কলই ভ্যানিস্ হইব। টিকিট বেইচ্যা যা, দরকার হয় বিশপঁচিশখান একস্ট্রা সিট দিয়া দিবি। কামাইয়া ল—

ঝিনি ঝিনি সুরে ফটিক কোম্পানির আবহ সঙ্গীত বাজছে। হাউসফুল। একস্ট্রা সিটও পড়েছে। এখনকার মত টিকিট বিক্রি বন্ধ। কাউন্টারের ফোকরের সামনে দু'এক রাউন্ড

বইঘর.কম
লড়াইও হয়ে গেছে মিশরের পিরামিড-এর মধ্যে শিখে আসা ম্যাজিক দেখার জন্য। লাইন পড়বে একটু পর থেকেই।

তাঁবুতে তখন পঞ্চার লাল নীল বেগুনি আলোর কেরামতি আর দপ করে লাল আলো জ্বলে ওঠে। মঞ্চে দেখা যায় রাজপুত্রের মত জরির ভাড়া করা যাত্রার দলের পোশাক পরা পটলকুমারকে, মাথায় তাজ—গলায় ঝুটো মুক্তোর মালা, হাতে কালো ছোট একটা লাঠি। চড় চড় শব্দে হাততালি পড়ে। পটলা মাথা নুইয়ে দর্শকদের অভিনন্দন জানায়।

তার প্রথম খেলা 'ওয়াটার অব ইন্ডিয়া'—দিদিমার একটা পুরানো কমণ্ডলু। তার মধ্যে থেকে জলটা ফেলে দিয়ে ওপাশের একটা ঢাকা স্ট্যান্ড এর মধ্যে রেখেছে কমণ্ডলুটাকে। পটলকুমার মাথা খাটিয়ে সাইফন্ যোগে নীচে দিয়ে নল এনে কমণ্ডলুর মধ্যে সেই পাইপ রেখেছে যাতে জল জমতে পারে সবসময়।

তারপর ওর বাক্স থেকে রুমাল শাঁখআলু বের করার খেলা। হোঁৎকাও গালে রং মেখে কালো প্যান্ট কোট টাই পরে সাহেব সেজে সেই বাক্স এগিয়ে দিচ্ছে, পটলকুমার ইল্লিগিল্লি পো—বিজাতীয় ভাষায় চিৎকার করে ফড়ফড় করে রঙিন রুমাল বের করছে, দুচারটে শাঁখআলু বের করে ছুঁড়ে দিচ্ছে দর্শকদের মধ্যে। চড় চড় হাততালি পড়ে। খেলা জমে উঠেছে। এরপরই খোল থেকে বের করে পায়রা!

তারপরই ঘটনাটা ঘটে যায়, হোঁৎকা চিৎকার করে ওঠে দেশজ ভাষায়—ধর। ধর হালায় পটলা!

তার আগেই পায়রা দুটো স্যাৎ করে বাক্সয় পোরার আগেই উড়ে যায়, ডানা বাঁধা হয়নি ঠিকমত। এবার পায়রা বের করে তাক লাগাবার কথা। তার আগে পায়রাই উড়ে গেছে।

দর্শকরা হৈ চৈ করছে, তাঁবুর ভিতর হকচকিয়ে গিয়ে পায়রা দুটো বনবনিয়ে উড়ছে। সিটি বাজছে তারস্বরে। কে চিৎকার করে।

—এইবার ঘুঘু চরাবি পটলা!

কুলেপাড়ার পিতু তিনু মস্তানের দল আওয়াজ দিচ্ছে আর পায়রা দুটো ঘুরে ঘুরে উড়ছে। সারা তাঁবুর দর্শকরা পায়রা ওড়ানোই দেখছে সিটি বাজিয়ে।

শেষ অবধি কানাতের ফাঁক পেয়ে ওরা উড়ে বের হয়ে গেল আকাশে। পটলকুমার ঘামছে—হোঁৎকাকে যেন খুন করেই ফেলবে। তবু ভরাটি গলায় পটলকুমার যাদুকাঠি নেড়ে হাঁক দেয়—ওয়াটার অব ইন্ডিয়া।

কমণ্ডুলুটা তুলেই চমকে ওঠে। তাড়াতাড়িতে দিদিমার বাতিল ফুটো কমণ্ডলুটা নিয়ে এসেছে, পাইপের জল যা এসেছে ফুটো দিয়ে সোজা চৌকির নীচে পড়ে গেছে। কমণ্ডলু শূন্য। কে চিৎকার করে—ওয়াটার কইরে—খরায় সব ওয়াটার শুকিয়ে গেছে। এখন গর্জন করে ওঠে—পহা দিয়ে ম্যাজিক দেখতে ঢুকেছি, পেঁদিয়ে মেক্ ওয়াটার করিয়ে দেব।

চমকে উঠি। হৈচৈ দানা বাঁধছে। এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিল ন্যাপলা। ইন্টারভ্যালে দু'একটা নাচ-এর ব্যবস্থাও রেখেছিল পটলকুমার। ন্যাপলা সাপুড়ে সেজে ফটিকের ঝমাঝম বাজনার তালে নাচতে নাচতে এসেছে। ন্যাপলা যাত্রার দলে নাচে, বেশ জমিয়ে দেয়। উত্তেজিত দর্শকদল তবু কিছুটা চুপ করে, তখন ন্যাপলার উপর লাল, নীল, বেগুনি আলোর বন্যা বইয়ে দিয়েছে লাইটম্যান।

ভিতরে গিয়ে দেখি পটলা আর হোঁৎকায় হাতাহাতি হবার জোগাড়। হোঁৎকা গর্জাচ্ছে—ফুটো কমণ্ডলু আনছস—পায়রাটারে বাঁধলাম, খুলছে কোন হালায়? তর ফুটানির বাজি দেখামু না—

ওকে থামাই—চুপ কর হোঁৎকা। ম্যানেজ হয়ে গেছে। এখন ভালো করে বাকি খেলা দেখা। দারুণ হবে কিন্তু।

এরপর পটলকুমারের মানুষ দ্বিখণ্ডীকরণ খেলা, দুচারটে ছোট আইটেমের পর এই খেলা দেখায়, তারপর প্রধান এবং শেষ খেলা ভ্যানিশিং পটলা।

ওদিকে পরের শোর টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। ফুটো কমণ্ডলুটাকে বদলে এনেছে গিরিধারী, সতুদের দুটো নতুন পায়রাও এসে গেছে আবার। এবার আর ভুল হবে না।

ইন্টারভ্যালের পর দুতিনটে খেলা বেশ নির্বিবাদেই হয়ে গেল। এরপর সেই মানুষ কাটার খেলা।

উত্তেজিত দর্শকদের অনেকে শান্ত হয়েছে, টেবিলে শুয়েছে নামো বস্তির রমু। তাকে দশটাকা দিতে হবে। তার কাজের মধ্যে শুয়ে চাদর চাপা দেবে, তারপরই টেবিলের ডালা খুলে নীচে চলে যাবে, করাতটা চালু হবার আগেই। আবার করাত বন্ধ হলে উপরে আসবে। করাত তাকে যাদু বলে কাটতে পারেনি।

রমু বলে—ভালো বিক্রি হয়েছে পঁচিশ টাকা দিতে হবে।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—ক্যান দিমু। দশ দিছি—বেশি চাইলে এক্কেবারে করাত দিই ফাড়ি দিব হালায়।

রমুর ভয় হয়। টেবিলে শুইয়েছে তাকে, উপরে ধারালো কাঠকলের করাত, চক চক করছে। পটলকুমার লেকচার দিচ্ছে—রানিং স্। মানুষটাকে দ্বিখণ্ডিত করে দেব আমাদের সামনে—

হঠাৎ লাফ দিয়ে ওঠে রমু, বিকট শব্দে চিৎকার করছে। হোঁৎকাও টিপে ধরেছে তাকে। রমু চিৎকার করে—বাঁচাও। আমাকে এরা সত্যি সত্যি কেটে ফেলবে—বাঁচাও ওরে বাবা—বিকট চিৎকার আর ধস্তাধস্তিতে এবার কুলেপাড়ার পিনু-তিনু-পাটকলের মজুরের দল লাফ দিয়ে ওঠে। পায়রা উড়ে গেছে—জলও আনতে পারেনি—হোঁৎকা একবার চিৎপাত হয়ে পড়ে খেলা মাটি করেছে, তার উপর ওই খুন-খারাপির ব্যাপারে এবার বেশ কয়েকজন লাফ দিয়ে উঠেছে স্টেজে। নসুবাবু ডেকরেটার স্টেজ তেমন যুৎসই করেনি। ওদের লাফানিতে সবশুদ্ধ মড় মড় করে ভেঙে পড়েছে।

তারপরই শুরু হয়ে যায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। কে চিৎকার করে।—ধর ব্যাটাদের। পটলকুমারের পটল তুলে দে।

কে খপ্ করে ধরেছে হোঁৎকাকেই, বেকায়দায় ভাঙা স্টেজের উপর পড়ে আছে হোঁৎকা, ধরে ফেলছে তাকে, ঢলঢলে প্যান্টটাই রয়ে গেল তার হাতে। হোঁৎকা প্যান্ট ফেলে আন্ডারওয়ার পরে সটকেছে, পটলাকে ওরা ধরেছে। ওর রাজপুত্রের ভাড়া করা জরির পোশাক ফর্দাফাঁই হয়ে গেছে, কপালটা কার ঘুসিতে ফুলে গেছে। ফটিক তার আগেই হারমোনিয়াম—ড্রাম নিয়ে দৌড়েছে।

গোবর্ধন হিসাবি ছেলে; তাঁবুর মধ্যের সংগ্রাম তখন বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। ফড ফড

করে ফাঁদছে তাঁবু, কানাত। কে পট করে খুঁটিই তুলেছে। চারিদিকে কলরব আর্তনাদ। দর্শকরা দৌড়াদৌড়ি করে বের হবার চেষ্টা করতে সারা তাঁবুই ফেড়ে ফেলেছে, বাঁশের খুঁটিগুলোয় চাপ পড়তে দু চারটে তাঁবুর ছাউনির তেরপল নিয়েই পড়ে যায়।

গোবরা সুটকেশের ক্যাশ নিয়ে ওই ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে বলে।—ফুটে যা সমী।

তবু বলি—পটলা, হোঁৎকা ওরা কোথায়?

গোবরা বলে—সব ভ্যানিশ হয়ে গেছে। এই বেলা কেটে পড়। ধরতে পারলে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দেবে।

তখন দর্শকরা টিকিটের পয়সা উসুল করার জন্য বাঁশখুঁটি-চেয়ার—কেউ পটলার ওয়াটার অব ইন্ডিয়ার ফুটো কমণ্ডলু—কে হোঁৎকার পরনের ভূপেন উকিলের ঢলঢলে প্যান্টটা হাতিয়ে বেরুচ্ছে, তাঁবু ভেঙে পড়েছে, কে সুন্দর লাল শালুর ব্যানারটাই টেনে পাগড়ি করে নিয়ে গেল, যেন লুটপাট শুরু হয়েছে।

ততক্ষণে পটলা হাওয়া কেটেছে, হোঁৎকাও বেপাত্তা। শেষ অবধি পুলিশ এসে পড়ে। আমরা সকলেই তখন 'ভ্যানিশ' হয়ে গেছি।

এরপর কদিন ধরেই গা ঢাকা দিয়ে ফিরছি আমরা। আখতার খাঁ সাহেব জোব্বা লাঠি নিয়ে ক্লাবঘরের দরজায় দম্মাদম বাড়ি মেরে হুঙ্কার তোলে।

—হোঁৎকা কাঁহা বাগ্‌লো, মেরা রুপেয়া, ছুদ—সবকুচু উশুল কর লেগা যব্ পাকড়ে গা।

নকুলের দোকান, লেকের ধারে—ক্লাবের মাঠ তন্নতন্ন করে খুঁজছে খাঁ সাহেব। ওদিকে ডেকরেটার নসুবাবুও ঘুরছে আমাদের সন্ধানে বিরাট এক লিস্টি হাতে নিয়ে।

তার তেরপল—বাঁশ—চেয়ার—তক্তা-যা হারিয়েছে, তাও কম নয়। কুল্যে হাজার দুয়েক টাকা তো হবেই।

বাধ্য হয়েই রাসমেলা ছেড়ে পটলার মামারবাড়ির অজপাড়াগাঁয়ে এসেছি। হোঁৎকা গর্জায়—তর হিসাব পুরোপুরি ভুল আছিল পটলা। দুহাজার টাকা লাভ হইব? তারপর অষ্ট হাজার টাকা। এহন অষ্টরম্ভা দেহি চক্ষে। উঃ ফেরবারও পথ নাই রে। ইন্দ্রজাল যা দেখাইলি, হক্কলেরে ভ্যানিশ্ কইরা ছাড়লি।

আপাতত অজ্ঞাতবাসে রয়েছি, কবে স্বস্থানে ফিরব জানি না। পটলার জন্যে আর কত দুর্ভোগ সইতে হবে কে জানে।

পটলার আইডিয়া

পটলার মাথায় আবার একটা আইডিয়া এসেছে।

অবশ্য এই আইডিয়াগুলো মাঝে মাঝে পটলার মাথায় ঠেলে ওঠে। বর্ষাকালে নরম মাটিতে গজানো ব্যাঙের ছাতার মত। কাঠে যেমন ঘুণপোকা লাগে—কুরে কুরে কাঠকে খায়, পটলার মাথাতে তেমনি আইডিয়ার ঘুণপোকা পার্মানেন্ট বাসা বেঁধে আছে। মাঝে মাঝে চাগিয়ে ওঠে আর তখনই পটলার কর্মযজ্ঞ শুরু হয়।

এই নিয়েই বাধে ঝামেলা। এসব ঝামেলার কথা পটলা প্রসঙ্গে তোমরাও কিছু কিছু জেনেছ।

এবার পটলা পড়েছে নিরক্ষরতা দূরীকরণ নিয়ে।

অবশ্য কিছুদিন আগেই পটলা সেদিন ক্লাবের মাঠে আমাদের ফুল কমিটিকে ন্যাপার দোকানের ডবল ডিমের ওমলেট, টোস্ট আর চা খাইয়ে মেজাজ খুশ করে জানায়,—বুঝলি, স-সমাজের জন্য বা কিছু স-সমাজসেবার কাজ করতে হবে।

হোঁৎকা তখন ওমলেটের শেষ পর্যায়ে এসে টোস্ট সহকারে চিবুচ্ছে। সে বলে—সমাজসেবার কাজ! হেটা তো হকলেই করত্যাছে। কাগজে দেখসনি? মিঠুন, তগোর সৌরভ থনে শুরু কইরা প্রসেনজিৎ-টিৎ হকলেই করত্যাছে। বন্যাত্রাণ, খরাত্রাণ, থ্যালা...কী কয় রে?—

আমি জানাই 'থ্যালাসেমিয়া'।

—হঃ! আরো কত কী কাজকাম করত্যাছে।

পটলা বলে—ওরা তো করছেই। ক-করুক, আমরা পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব থনে নতুন কি-কিছু করব। স-সমাজের বুক থেকে নিরক্ষরতা দূর করব।

গোবর্ধন, অর্থাৎ আমাদের অন্যতম সভ্য গোবরার চেহারাটা বেশ গোলগাল। ওর মামার কলকাতায় হোলসেল কুমড়োর ব্যবসা। কুমড়োর গুদামে থেকে ওটারও কুমড়োর মত চেহারা হয়েছে। তিন বছর ধরে ক্লাস নাইনে গড়ান দিচ্ছে। এ হেন গোবর্ধন লেখাপড়ার কথা শুনে বলে,—ধ্যাৎ, তার চে মাঠে ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প কর। এখন সৌরভের জোর বাজার, দেখবি কত দিদি-মাসিমার দল তাদের হ্যাংলা-প্যাংলা, টিকটিকির মত ছেলেদের নে আসবে মাঠে। মাসে দুশো টাকা রেট, ক্লাবেরও নাম কাটবে।

ফটিক কালোয়াতি গানের চর্চা করে। ক্লাবের একটা দরমার বেড়ার ঘরে বসে হারমোনিয়াম নিয়ে 'মেরে সঁইয়া' নিয়ে ঘণ্টা দেড়েক চেল্লামেল্লি করে চলেছে, তা বছরখানেক ধরে। ওকে বলি,

—আর গান নাই রে! ওই একই গান, 'মেরে সঁইয়া'?

ফটিক বলে—এ কি তোর আধুনিক গান, যে তিনখান গান তুলে পাড়ায় পাড়ায় ফাংশন করতে বেরুতে হবে? এসব তানসেনের ঘরানা—জন্মভোর সাধতে হয়।

বইঘর.কম

তাই সে সেধেই চলেছে। ফটিক আরও বলে—তার চে সঙ্গীত শিক্ষার ক্লাস চালু কর। আমি তো আছি।

হোঁৎকা চা-টোস্ট শেষ করে, একটা ঢেকুর তুলে বলে—তার চে ক'পঞ্চপাণ্ডব কেলাব তুইলাই দিমু।

অবশ্য পটলাকে চটানো সম্ভব নয়। কারণ ক্লাব-মাঠ তাদের জায়গাতে। সে-ই আমাদের ক্লাবের কামধেনু। সে বলে—

—নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ এর আগে এদিকে কোনো ক্লাবই করেনি। এক্কেবারে নতুন ব্যাপার। খ-খরচার জন্য ভাবিসনি। দেখবি, পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের নাম যা কাটবে!

অগত্যা রাজি হতে হল। হোঁৎকা বলে—কর, তয় আমার বিদ্যার বহর তো জানস, তায় মাস্টারি, শুনে লোকে হাসব।

গোবরা ক্লাসে গড়ান দিলে কী হবে, মাস্টার হবার লোভেই বলে, ঠিক আছে।

হোঁৎকা বলে—তালি ওই নিরক্ষরই কর—

পটলা শুধরে দেয়—নি-নিরক্ষরতা দূ-দূ-

পটলার জিভটা বিনা নোটিশে যখন-তখন আলটাকরায় সেট হয়ে যায়। আমিই পাদপূরণ করি—দূরীকরণ।

পটলা বলে—হ্যাঁ, তাহলে কা-কাজে লেগে পড়। কী করতে হবে বলছি, ঘটাও এসে যাবে।

পটলা ওদের বংশের একমাত্র বংশপ্রদীপ। বাবা-কাকাদের বিরাট ব্যবসা-কারখানা, এদিকের বহু জায়গা, বাড়ি, বাজার রয়েছে। পটলার টাকার অভাব নাই।

এর মধ্যে ক্লাবের মাথায় নতুন সাইনবোর্ড উঠেছে—'নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিদ্যালয় পরিচালনায় পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব'। ক্লাবের বড় ঘরটায় এর মধ্যে বড় শতরঞ্চি বাড়তি লাইট ফিট করা হয়েছে। হোঁৎকা বলে পটলা, তার ইস্কুল বেশ ঘটা কইরা ওপন করতি হইবো। ফটিক বলে—সিওর! উদ্বোধন সঙ্গীত, সভাপতি...

হোঁৎকা বলে—পটলা, কিছু খরচা করতি হইবো—সভাপতি ঠিক করছি, ফাংশনও হইবে।

পটলাও শ-পাঁচেক টাকা বের করে দেয়।

এর মধ্যে সারা এলাকায় কথাটা প্রচার হয়ে গেছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ফেস্টুন পড়েছে। ফটিক, হোঁৎকা দু'জনেই মাঠে মুক্ত মঞ্চ করেছে। সভাপতি পাড়ার এম. এল. এ. কৃতান্তবাবু আর প্রধান অতিথি বাজারের মাছের বড় আড়ৎদার পুনুবাবু।

পুনুবাবুর চেহারাটা ভেটকি মাছের মত বেশ নধর, মাথাটা ছোট। মাঠের আড়তে বসে বসে ওর গায়ে মাছের আঁশটে গন্ধ। তবু সে নাকি স্কুলের ফান্ডে হাজার টাকা দিয়ে এই পদ লাভ করেছে। কোনো সদ্য গজিয়ে ওঠা কেবল্ টিভির লোকও ক্যামেরা নিয়ে এসেছে।

ফটিকের উদ্বোধনী সঙ্গীত। হোঁৎকা বলে আড়ালে—তিন মিনিট তর টাইম ফট্‌কো। তারপর ব্যা ব্যা করছস তো, তরে এই আধলা ইট মারুম।

ফটিক বলে—তান-আলাপ....

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—যা পারস ওই তিন মিনিটেই কর, নালি তরে বিলাপই করতি হইব। তারপর বক্তিতা, পাঁচুদার ভাষণ।

ফাংশন শুরু হবার আগে দেখি ছাত্রের দলও আসছে। ওসব হোঁৎকা-পটলা জোগাড় করেছে, গোবরাদের গুদামের গোটা দুয়েক প্রমাণ সাইজের তারকেশ্বরী কুমড়োও এসেছে। ত্যানারাও পড়বেন। দেখি, রূপকথা সিনেমার সামনের টিকিট ব্ল্যাক পার্টির দু-চারজনও আছে। ওরা সিনেমার সামনে নতুন নামতা পড়ে—পাঁচ কা দশ, দশ কা পন্‌রো। এখানে ওরা কী পড়বে জানি না। দেখি সিঁটকে মদনাকে, এলাকার কুখ্যাত সিঁধেল চোর। পাড়ার লোকের ঘটিবাটি, আলনার জামাকাপড় হরণ করে। সেও এসেছে পড়তে।

আর এসেছে বাজারপাড়ার বেশ কিছু মাল, যারা নিখুঁত ব্লেড চালিয়ে লোকজনের পকেট সাফ করে, ব্যাগও কাটে নিপুণভাবে। আর ওদিকে আগে থেকেই ছাত্রদের শতরঞ্চিতে বসে ঝিমুচ্ছে বংশীলাল। সে আবার জলপথের যাত্রী। দ্রব্যগুণে এখন ঝিমুচ্ছে। সেও অক্ষর জ্ঞান অর্জন করতে চায়।

আমি বলি—এসব কী ছাত্র রে?

পটলা তখন সমাজসেবার নেশায় মশগুল। সে বলে—এদেরই প্রকৃত শি-শিক্ষার দরকার।

মিটিঙে এলাকার মানুষ ভেঙে পড়ে। ফটিক তখন পুরো স্পিডে 'সইয়া'র গান ফিনিশ করেছে। হাততালি পড়ছে। হোঁৎকা নিশ্চিন্ত ফটিক পাঁচ মিনিটেই 'সইয়া'র গান সেরেছে।

তারপর পাঁচুদা, এখানকার জননেতা। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব যে সমাজের নিরক্ষরতা দূর করতে নেমেছে তার জন্য তাদের দেবতাই বানিয়ে দেয় (সামনে ভোট, তাই এত আমড়াগাছি)। আর মাছের কারবারি পুনুবাবু, ইদানীং মাছের দর বেড়েছে, তাই খুশি হয়ে ছাত্রদের আশীর্বাদ করে। তারপর কাউন্সিলের ভুতোদাও সব ক্লাবকে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের মহান আদর্শ অনুসরণ করতে বলে। তারাই প্রকৃত সমাজসেবা করছে। এরপর ওইসব মার্কামারা ছাত্রদের বলে, তোমরা মন দিয়ে পড়বে। বিদ্যালাভ করে নিজেদের ধন্য করবে।

সভা শেষ। এরপর ছাত্রদের নিয়ে পড়ি আমরা। বংশী উঠে পড়ে। বলি—কোথায় চললে?

বংশী বলে—পড়া তো হবে যত ঠ্যালার কাজ। ঠেক থেকে দু'ঢোক ঢেলে এসে ফিট হয়ে বসব মাইরি—বংশী দৌড়োল।

অন্য ছাত্ররা তখন বই-শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে বসেছে মন দিয়ে।

পাড়ার লোকও অবাক হয় ওই ছাত্রদের দেখে। পটলার নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ঠিকুজি কুষ্ঠী এলাকার সব মানুষেরই জানা।

ওদের মধ্যে ন্যাপাও এসেছে। তার ডান হাতের তালু নাই। কথিত আছে যে, বোমা বাঁধতে গিয়ে ওর হাতটাই উড়ে গেছিল। তবে এখনও সে বোমের ব্যবসা করে। বাঁ হাতেই উৎকৃষ্ট বোম বাঁধে।

এ হেন কৃতী ছাত্রদের বিদ্যাদানের সুযোগ পেয়ে আমরাও ধন্য হয়েছি।

পটলা বলে—এদেরই শি-শিক্ষার আলো দরকার।

হোঁৎকা তখন কোনো ছাত্রকে নিয়ে পড়েছে।

শ্লেটে দাগা বুলোচ্ছে অনেকে। ন্যাপা বাঁ হাতেই দাগা বুলোচ্ছে, বংশীও এর মধ্যে ফিট হয়ে ঢুকছে টলতে টলতে। হোঁৎকা গর্জে ওঠে ছাত্রের এ হেন ব্যবহারে। বলে—গেট আউট।

বংশী বলে—তাহলে আজ ছুটি?

পটলা বলে—ওসব খেয়ে ইস্কুলে আসবে না। ওসব ছাড়ো বংশী।

বংশী বলে ওঠে—লাও ঠ্যালা। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে মাস্টার। পড়তে হলে ওসব চলবে না?

পটলা বলে—না।

বংশী বলে—তা'লে পড়ে আর কাজ নাই। ই বড় বাজে জিনিস।

পটলা ছাত্র হটাতে চায় না। বিদ্যাদান করবেই। তাই বলে-ওদিকে বই নিয়ে বসো।

বংশী বসে পড়ে। অবশ্য চোখও খোলে না, বইও নেয় না। ঝিমুতে থাকে।

নিরক্ষরতা কতদূর দূরীকরণ হচ্ছে তা জানি না, তবে আমাদের ইস্কুলে ছাত্রদের জমায়েত ঠিকই হয়। পাড়াতেও নাম কাটে—হ্যাঁ, কাজের কাজ করছে।

সেদিন পটলা স্কুলের পর চা-টোস্ট আনাতে দেবে আমাদের জন্য, পকেটে হাত দিয়েই হাতটা হঠাৎ সিধে বের হয়ে যায়। পকেট সাফ, মানিব্যাগে শ-চারেক টাকা ছিল, নাই।

পটলা চমকে ওঠে—আরে, কে পকেট সাফ করেছে? চা-চারশো টাকা!

হোঁৎকা বলে—কেউ গুরুদক্ষিণা দিছে তবে। হালা আর ছাত্র পাইলি না? ওগোরই কাম।

পটলা বলে—না, না, বাজারেই গেছে। ছেলেরা কেউ করেনি।

ক'দিন পরেই ফটিক সকালে ক্লাবে গলা সাধতে এসে দেখে হারমোনিয়ামটা নাই। বাক্সটা পড়ে আছে, মাল সাফ!

ফটিক আর্তনাদ করে—আমার হারমোনিয়াম কোথায় গেল?

খবর পেয়ে গেলাম। পটলা-হোঁৎকাও এসেছে।

গোবরা বলে—ওই ছাত্রদেরই কাজ। সেদিন পটলার পকেট সাফ করেছে, আজ গেল হারমোনিয়াম। এটাও ওদেরই কারো কাজ। হোঁৎকা বলে—পটলা তর ছাত্রদের লই যা। নালি কুনদিন কেলাবই সাফ কইরা দিবো।

পটলা বলে—না, না, ওরা এসব কাজ আর করে না। শিক্ষার আলো পেলে ওরা বদলাবেই।

এর কিছুদিন পর পাড়ায় হইচই ওঠে, মোড়ের ইলেকট্রিকের দোকানে চুরি হয়েছে শাটার-এর তালা ভেঙে। টিভি, টেপ, ইস্ত্রি নানা কিছু চুরি গেছে। অনেক টাকার মাল। পুলিশও আসে সেখানে। দোকানদার বিভূতিবাবু কপাল চাপড়াচ্ছে।

খবর আসে, এর আগেও পাড়ার গোবিন্দবাবুর নীচের ঘর থেকে জামাকাপড়, রেডিও চুরি হয়েছে।

সাত নম্বরের হরিধনবাবুর বাড়িতেও চোর হানা দিয়েছিল। তবে বিশেষ কিছু নিতে পারেনি। হরিধনবাবুর মেজ ছেলে জেগে উঠে আলো জ্বালাতেই চোর দু'জন পাঁচিল টপকে গলির অন্ধকারে পালিয়েছিল। অবশ্য তার আগে ওরাই পাড়ার সব আলো নিভিয়ে অভিযানে এসেছিল।

নিশিকান্তবাবুও এবার গর্জে ওঠে পুলিশের সামনে—পাড়ায় চোর, পকেটমারের ডিপো হয়েছে মশায়। সেদিন এই গলিতে আমার পকেট কাটা গেল—আড়াইশো টাকা সাফ! কী হচ্ছে এখানে? আজ দোকানে ডাকাতি হয়ে গেল!

সমবেত জনতা এবার পুলিশকেই ধরে। পুলিশ অফিসার বলে—আমরা দেখছি।

পাড়ায় খোঁজ-খবর চলছে। অবশ্য, আমাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজও চলছে। ছাত্রসংখ্যা দু-চারজন বেড়েছে, পটলাও খুশি।

সেদিন দোকানে চুরির খবর দেখেছি আমরা। হোঁৎকা ভাবনায় পড়েছে। গোবরাও বলে—মামার গুদামে আবার চুরি না হয়!

হোঁৎকা বলে—কী পাইব সেখানে? কুমড়া আর চালকুমড়া লইব কোন ব্যাটা? চুপ মাইরা থাক গোবরা।

গোবরা বলে—কুমড়োর কেজি এখন সাত টাকা। কম দাম?

পটলা বলে—ওসব ছাড়। এই সপ্তাহে ছাত্রদের পরীক্ষা নিতে হবে। কে কতটা শিখল জানা দরকার।

হোঁৎকা বলে—কিন্তু এদিকে পাড়ায় যা হইত্যাছে, ডিফেন্স পার্টি করনের লাগবো। তর ছাত্রদের নিই একখান ডিফেন্স পার্টি করুম।

পটলা বলে—ওদের পড়াশোনায় ডিসটার্ব করিস না। মন দিয়ে পড়ছে, ওদের পড়তে দে।

ক্লাবের ওদিকে একটা ঘরে পুরোনো বাতিল খবরের কাগজ, ভাঙা ক্যারাম বোর্ড, গোলপোস্টের জাল, দুর্গাপুজোর কাঠামো, হাবিজাবি জিনিসে ঠাসা থাকে। ওঘরে কেউ ঢোকে না। বন্ধই থাকে।

সেদিন পাড়ার দোকানে ডাকাতির পর পুলিশ এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে ক্লাবে এসেছে। ফটিকের হারমোনিয়াম নাই, একটা তানপুরা এনে ফটিক সেই 'সঁইয়া'কে নিয়ে পড়েছে। ওদিকে গোবরা বারবেল করছে। পুলিশ দেখে চাইল তারা।

পুলিশ অফিসার এদিক-ওদিক দেখে, তারপর সেই বন্ধ ঘরটা দেখিয়ে বলে—এটা খোলো।

ফটিক বলে,—দরজা ভেজানোই থাকে ঠেলুন, খুলে যাবে।

পুলিশ ঠেলতেই দরজা খুলে যায়। পুলিশ ভেতরে ঢুকে দেখে জালের তলায় কাঠামোর পিছনে রয়েছে কয়েকটা টিভি, টেপ। সেই দোকানদার বিভূতিবাবু বলে—এসব আমার দোকানেরই চুরি যাওয়া মাল। ফটিক অবাক, এখানে এসব কারা রেখে গেল? দরজা তো খোলাই থাকে।

এরপরই সেক্রেটারি হোঁৎকা আর প্রেসিডেন্ট পটলার খোঁজ পড়ে। আমরাও গেছি।

পটলার কাকাও গাড়ি নিয়ে এসে পড়েন। হইহই ব্যাপার। কুলেপাড়ার ক্লাব চিরকাল আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, তারা এতদিন আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে চুপ করে ছিল। এবার তারাই বলে—চুরির ইস্কুল করেছে এরা। তাই বলি, পাড়ায় হঠাৎ চুরি-চামারি, পকেটমারি বেড়ে গেল কেন? বুঝুন এবার।

পুলিশ অফিসারও সব খবর রাখেন।

পটলার নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্লাসের ছাত্রদের নামগুলো দেখে এবার পুলিশ অফিসার বলে—এলাকার জুয়েলগুলোর অনেকের নামই দেখছি। ওগুলোকে তুলে নিয়ে গিয়ে ওষুধ দিলেই সব খবর বের হবে।

পটলা বলে—আর কোনো দল ওদের বিপদে ফেলার জন্যই এসব এখানে রাখতে পারে।

পুলিশ অফিসার এর মধ্যেই লোক পাঠিয়ে গোটা পাঁচেক ছাত্রকে ধরেছে। তাদের দু-চার

ঘা দিতে তারা স্বীকার করে এ কাজ তাদেরই। সব মাল পাচার করতে পারেনি। এই বন্ধ ঘরে বাকিগুলো রেখেছিল পরে সময়মত নিয়ে যাবার জন্য।

চুরির কিনারা হতে এবার পুলিশ ছাত্রদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে। পটলার নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিদ্যালয়ের সুনাম এই পর্যায়ে দাঁড়াবে, ভাবিনি। আমরাও হতাশ।

পুলিশ অফিসার বলে—শোনো পটলবাবু; এরা জীবনের ইস্কুলে এইসবই এত শিখেছে যে তোমার অক্ষর পরিচয়ের এইটুকু আলো এদের মনের শেডের অন্ধকার দূর করতে পারবে না। তোমরা বরং যারা ছোট, জীবনের এই শেডের অন্ধকার দেখেনি এখনো, তাদের মধ্যেই শিক্ষার কথা ভাবো। হয়তো তাতেই সত্যিকার কাজ হবে। কাঁচামাটির তাল নিয়ে ভালো কিছু গড়া যায়, এই পোড়ামাটি দিয়ে নয়।

সেদিন ওর কথাটা সত্যি মনে হয়েছিল। পটলাও বলে—এই ধেড়েদের নিয়ে আর নয়, রে, সারা এলাকার পথের ছেলেমেয়েদের নিয়েই ইস্কুল হবে।

এখন আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের ইস্কুল কচিকাঁচাদের কলরবেই মুখর হয়ে ওঠে। পাড়ায় আর চুরি-চামারিও হয় না। পাড়ার বহু মানুষও এখন আমাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে নানাভাবে সাহায্য করছেন।

পটলা বলে—কী রে, ইস্কুল কেমন চলছে? আমার আইডিয়া কেমন, বল?

হোঁৎকা বলে—ভালোই। তয় অগোর সাথে বকাঝকা কইরা গলা শুকাই গেছে গিয়া। চা-টোস্ট আনতি কইয়া দে। হঃ, সাথে ওমলেটও দিতি ক, ডবল ডিমের ওমলেট।

পটলার অগ্নিপরীক্ষা

টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট বের হতে দেখি আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের মেম্বারদের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে কাঁপ ছটকানো ঘুড়ির মতই।

চাঁদিয়াল —একতো , লক্কা ঘুড়িগুলো যখন আকাশে ওড়ে তখন দেখতে দারুণ লাগে, আর মুক্ত উদার নীল আকাশে তারা খুশিতে ফরফর করে ওঠানামা করে, হেলেদুলে যেন আকাশে রাজত্বি করে।

আর যখন এক একটা উড়ন্ত ঘুড়িকে কেটে নীল আকাশে ভাসিয়ে দেয় তখন তাদের মেজাজই আলাদা, বাজপাখির মত রাজকীয় ভাব ফুটে ওঠে ওদের উড়ুক্কু মেজাজে।

আমরা পঞ্চ ক্লাবের সভ্যরাও কিছুটা তেমনি মেজাজ নিয়েই কুলেপাড়ার মধ্যগগনে বিরাজ করছিলাম।

আজ কালচারাল ফাংশন, কাল এ পুজো, সে পুজো, ফুটবল মরশুমে তো আমাদের অবস্থা এই অঞ্চলে খুদে 'পেলে'র মতই। কেউ পেলে, কেউ গারিঞ্চা, কেউ ইউসিবিয়ো ইত্যাদি। পাড়ার সকলেই চিনত, আর পটলার দৌলতে অনিল কেবিনের 'ডিম' এর বংশনাশ করতাম। তারপর খরাত্রাণ, বন্যাত্রাণ এসব ত্রাণ টান-এর কার্যেও আমরাই ছিলাম অগ্রণী।

সেবার কদিনের বর্ষায় কুলেপাড়ার নামো বস্তি, তিন নম্বর বস্তি ডুবুডুবু হয়েছিল জমা জলে, খাটাপায়খানার গামলাগুলো বের হয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে, ঘরেও জল ঢুকছে অনেকের। এ হেন আপদকালে আমাদের সেক্রেটারি হোঁৎকাই এগিয়ে এল আমাদের নিয়ে।

আমরাই ওদের তুলে নিয়ে গিয়ে তাবত ইস্কুল ঘরে, মায় পটলাদের একটা গুদামে আশ্রয় দিয়েছিলাম। কাগজেও আমাদের উদ্ধারকার্যের ছবি বের করে দিয়েছিল এ পাড়ার ভটুক দা। ও কোন কাগজের অনাহারী (সঠিক কথাটা নাকি অনারারি) সংবাদদাতা। আমরা ওই পরিচয়েই জানতাম ওকে। তিনিই কাগজে খবরটা প্রকাশ করেছিলেন।

সব মিলিয়ে আমরা ছিলাম কুলেপাড়ার মুক্তাকাশে বিচরণশীল চাঁদিয়াল ঘুড়ির মতই স্বাধীন।

কিন্তু এত দিয়েও স্কুলের ইংরেজিস্যার নবনীবাবু, অঙ্কের গোবিন্দ স্যার মায় সংস্কৃতের হেডপণ্ডিত ভবানী স্যারকেও কায়দা করতে পারলাম না। হোঁৎকা আবার বাংলাতেও ফেল করেছে। গুপিস্যার তো বলেন— তুই বঙ্গসন্তান না কি রে?

অর্থাৎ জন্মবৃত্তান্ত তুলেও শুনতে হয়েছে।

হোঁৎকা কুল্যে চার বিষয়ে, পটলা ইংরাজিতে, ফটিক কুল্যে তিন সাবজেক্টে লটকেছে। আমিই কোনো রকমে বেদাগ অবস্থায় বের হয়েছি।

হোঁৎকা কটাই কর্মকারের দোকানে হাপরের মত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—তহনই

কইছিলাম আমার হইব না। কাকার কারখানাতেই কাম করুম। তরা শুনলি না। কইলি পড়। পইড়া কিছু হইব না। কর্মই ধর্ম।

হোঁৎকা মাঝে মাঝে দার্শনিক হয়ে ওঠে, তখন অমনি বেশ দামি দামি কথা বলে। ফটিক এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। ক্লাবে সন্ধ্যার পর যেন শোকসভা বসেছে ওদের। কেবল ফুলমালা ধূপটুপই নেই। নাহলে তেমনি শোকস্তব্ধ পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

ফটিক বলে—ইস্কুলে পড়া টড়ার চেয়ে সঙ্গীতবিদ্যাই বড় রে। ভাবছি মন প্রাণ দিয়ে এবার সঙ্গীতসেবাই করবো।

হোঁতকা বলে— কচু হইব এতে! অ্যাদ্দিন তো বমিই করছিলি, কী হইছে?

ফটিক আর্তনাদ করে ওঠে।

—ফুট কাটবি না হোঁৎকা, রক্তগঙ্গা বইয়ে দোব।

সুইসাইড করব।

আমি ঘাবড়ে যাই। ওদের মধ্যে আমিই ভালোভাবে পাস করে ওদের কাছে দোষী হয়েছি। তাই চুপ করেই ছিলাম। এবার রক্তটক্তের কথা, সুইসাইডের কথা শুনে ঘাবড়ে যাই। বলি, —আবার ওসব কেন, এখনও সময় আছে। পড়াশোনা কর।

আমার উপদেশ ওদের আশ্বস্ত করতে পারে না। হঠাৎ গোবরাকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে চাইলাম। ওর বাহন একটা ধ্যাড়ধেড়ে সাইকেল। ওটা নাকি ও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।

ইতিপূর্বে ওর বাবা সেদিনে ওটায় চড়ে সারা কলকাতা উত্তর দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার তাবত মেছো ভেড়ি পরিভ্রমণ করত। তার বয়স হতে তস্য ভ্রাতা ওটায় চড়ে বারাসাত অবধি তাগাদায় বের হত, তিনি গত হতে তাঁর কোনো যোগ্য ওয়ারিশন না থাকায় ওটা গোবরার দখলে এসেছে।

ততদিনে স্রেফ ফ্রেমখানা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বাকিটা গোব্‌রা লাগিয়ে এখন চালু করেছে। ওতে সে তাবত বেলেঘাটা কুলেপাড়া চষে বেড়ায়। অবশ্য ব্রেকগুলো আর লাগিয়ে বাজে খর্চা করেনি, ওর কাজ ঠ্যাং দিয়েই করে থাকে। আর বেলটেল লাগাবার দরকারও বোধ করেনি।

কারণ সাইকেলটা চললে যে রকম ঢং ঢং কড় কড় শব্দ ওঠে ওতেই বেলের কাজ হয়ে যায়। লোকজন আগেই ওর সাইকেলের শব্দ পেয়ে যায়।

গোবরা এ যেন সাইকেলে চড়েই একটা পা দাওয়ায় ঠেকিয়ে গতিবেগ সামলে বলে।

—সব্বোনাশ হয়ে গেছে র‍্যা।

হোঁৎকা উদাস নয়নে চাইল ওর দিকে। এর চেয়ে আর কী সর্বনাশ হতে পারে জানা ছিল না। ফটিক বলে।

—আর হতে কী বাকি আছে বল? বাবা তো চুলের মুঠি ধরে গর্জাচ্ছেন খুন করেঙ্গা। তাই ভাবছি অন্যের হাতে এ জীবন বিকিয়ে দেবার আগে নিজে হাতেই এটাকে শেষ করবো।উঃ—

গোবরা বলে—তাই করতে হবে এবার। ওদিকে ইস্কুলে তো ধেড়িয়েছিস, এবার কেলাবও

তুলে দিতে হবে। কী নিয়ে থাকবি?

চাইলাম ওর দিকে। গোবরা তখনও ওর কথা শেষ করার চেষ্টা না করেই মোক্ষম ঘাটা দেয়। বলে সে।

—পটলাকে ওর কাকাবাবু ওর রাঙা পিসেমশাই না কে এক জাঁদরেল হেডমাস্টার আছেন কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে সেখানেই চালান করছে। তিনমাস ওখানে তাঁর হেপাজতে রেখে একেবারে ফাইনালের মুখে আনবে।

চমকে উঠি সকলেই। পটলা আমাদের মধ্যমণি, কামধেনু, প্রতিপালক। ওদের অবস্থাও ভালো। ওর ঠাক্‌মার বিরাট সম্পত্তি, কারখানার ও-ই ভবিষ্যৎ ওয়ারিশান। ওর টাকাতেই ক্লাবের এত নামডাক, আমাদের এত গুডউইল অর্থাৎ সুনাম টুনাম। অনিল কেবিনের টোস্ট ওমলেটের বিল ও দেয়, গোকুলের কুলপিমালাই-এর দেনা ও শোধ করে, ভজুয়া ঝালমুড়িওয়ালা, এতোয়ারি ফুচকাওয়ালাদের দেনাও শোধ করে। ওদের অনেক বিল বাকি—

ক্লাব ব্যাডমিন্টন পড়েছে, তার খরচাও আছে। সর্বোপরি পটলার এই নির্বাসনের কথায় চমকে উঠি আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে। সূর্যহারা দিন হতে পারে, কিন্তু পটলাহারা পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের কথা ভাবাই যায় না।

হোঁৎকা চমকে ওঠে— কি কইলি? পটলা তো শুধু ইংরাজিতে কম নাম্বার পাইছে। তয় ওরে তাড়াইবো ক্যান? কলকাতায় থাইকা ইংরাজিতে পাকা হইতে পারবো না পটলা, ওরে ওই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের অজগাঁয়ে যাইবার লাগবো ইংরাজি শিক্ষকের জন্যে?

ফটিক বলে—একে একে নিভিছে দেউটি!

স্বর্ণলঙ্কা ডুবিছে আঁধারে।

হোৎকা গর্জে ওঠে— নাটক ফাটক রাখ। এহন কী হইব ভাব। হালায় ওগোর ট্যাকা কে দেবে? তহন তো ওমলেট, কুলপি-ঝালমুড়ি ভরপেট খাইছস?

কাদের কথা ভেবে ফটিক বলে।

—ক্লাবে আমি রেজিকনেশন দেব। পদত্যাগ করবো— হোঁৎকা ফুঁসে ওঠে।

—কইরা দ্যাখ? তর পদ দুইখানা খুইলা নিমু। টেংরি টুকরো কইরা দিমু।

হাতাহাতি বেধে যাবার উপক্রম। থামাই ওদের। —কী হচ্ছে তোদের! পটলার সঙ্গে কাল সকালেই দেখা করে ব্যাপারটা কি জানতে হবে।

হোঁৎকা বলে— তুই যা গিয়া। আমাগোর দেখলে ওর ছোটকাকা গুলি কইরা দিবে। তুই 'গুড বয়' তরে কিছু কইব না। তুই ম্যানেজ কর।

পরদিন সকালে পটলাদের বাড়ি যেতে দেখি ওর ছোটকাকাই এগিয়ে আসেন। ওদের বাড়িটাও বিরাট। পেছনে বেশ খানিকটা বাগান মত, আগেকার আমলের বাড়ি। বাগান পুকুরও রয়েছে। এদিকে তিনতলা বাড়িটায় ওরা থাকে।

দারোয়ান, মালি, চাকর বাকরের অভাব নেই। ওদিকে দুখানা গাড়ি ধোয়ামোছা হচ্ছে। সামনে বৈঠকখানা, ওপাশে পটলার ঘর।

পটলার ছোটাকাকা ওদের কারখানা দেখাশোনা করেন। সবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছেন তিনি।

ছোটাকাকাও আমাকে চেনেন। বলেন।

—টেস্টে তো সেকেন্ড হয়েছো। না।

ঘাড় নাড়ালাম । তিনি বলেন।

—ভালোভাবে পাস করতে হবে। নাহলে মেডিক্যালে ইঞ্জিনিয়ারিং এনট্রান্স কোন পরীক্ষাতেই বসতে পারবে না।

পরক্ষণেই বলেন তিনি।

—পটলা ইংরাজিতে এত কাঁচা তা ভাবিনি। এখানে পড়াশোনা ঠিক মত হবে না। তাই ওকে বাইরেই পাঠাচ্ছি। কিছুদিন নিরিবিলিতে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা করুক। কি বলো?

আমার কাছেই যেন পরামর্শ চাইছেন। অগত্যা আমি জানাই। —তা ভালোই হবে।

ছোটকা খুশি হয়ে বলেন—গুড! পটলা আজই চলে যাচ্ছে। দেখা করবে তো, ওর ঘরে যাও। ওকেও বুঝিয়ে বলো ও যেন শায়েস্তাগঞ্জে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা করে।

জায়গাটার নামও জানা গেল। শায়েস্তাগঞ্জ? কিন্তু অবস্থান জানা যায় না, আর ম্যাপেও বোধহয় ওসব জায়গার কোন নামধাম নেই।

পটলার ঘরে গিয়ে দেখি ওর বইপত্র সব বাক্সবন্দি হয়ে গেছে, সুটকেশ জামা-কাপড়ও পোরা হয়েছে, পটলাই শুধু বাইরে রয়ে গেছে। উদাস বেদনার্ত চাহনিতে আমার দিকে চেয়ে বলে পটলা।

—আমারে শাস্তি দেবার জন্যে শ্-শ্ শায়েস্তা —গ।

পটলার ব্রেক ফেল করেছে। বিশেষ করে উত্তেজনার মুহূর্তে ওর জিবটা আলটাকরায়, আটকে যায়, অনেক কষ্টে আর সেটাকে মুক্ত করে বাকি কথাটা শেষ করতে হয় পটলাকে।

আজ নিদারুণ দুঃখে ওর ব্রেক ফেল করেছে। আমিই বলি সান্ত্বনার সুরে—তিন মাস তো, দেখতে দেখতে কেটে যাবে রে শায়েস্তাগঞ্জে।

পটলা বলে—রাঙা পিসেমশাইকে চিনিস না। ড-ড- ডেঞ্জারাস হেডমাস্টার।

হেডমাস্টারদের কিছুটা চিনি। গুরুগম্ভীর টাইপের মুখ। হাসির ছিটেফোঁটা নেই। বুলডগ মার্কা চেহারা। অমনি কোন লোকের সঙ্গে একদিন বাস করলেই হাত ছেড়ে যাবে, পটলাকে তিন মাস কাটাতে হবে সেখানে। পটলাকে এর চেয়ে ওদের সুন্দরবনের কাঠের গোলাতে পাঠালেও ভালো করত। ওখানে বাঘটাঘ আছে, কিন্তু ওর পিসেমশাই তো সিংহবিশেষ।

পটলা হতাশ কণ্ঠে বলে— আর -বেঁচে ফিরে আসব না রে। একটা শোকসভা করিস যদি কিছু হয়ে যায়।

আমার চোখও জলে ভরে আসে। শুধোই, —তো ঠাক্মা মত দিল যেতে?

পটলা বলে—ওর মেয়ের কাছে যাচ্ছি—উনি তো এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলেন বুড়িও বিশ্বাসঘাতক কনস্পিরেটার নাম্বার ওয়ান। ষড়যন্ত্রকারী।

ছোটকাকার ডাকে চাইলাম। ছোটকাকা বলেন—চল পটলা। তোকে পৌঁছে দিয়ে আবার কাজে বেরুতে হবে। দশটায় ট্রেন, হরিপাল স্টেশনে লোক থাকবে, ওখান থেকে বাসে টেম্পোতে গিয়ে মাইলখানেক হাঁটতে হবে নবীগঞ্জ থেকে। কাছেই শায়েস্তাগঞ্জ। সব বলা আছে, চল। ও ঠিক পৌঁছে যাবি।

বইঘর.কম

পটলার বই-এর পুঁটলি, সুটকেশ সব তুলে শেষমেষে পটলাকে তুলে ছোটকাকা বের হয়ে গেলেন। পটলার বাবা মা মায় ঠাক্‌মা অবধি এহেন করুণ দৃশ্যটা বেশ উৎসাহ ভরে দেখলেন।

আমি ছলছল চোখে পটলাকে বাঘ সিংঘের রাজত্বে নির্বাসন দিয়ে বের হয়ে এলাম।

ক্লাবের জামতলায় হোঁৎকা —ফটিক— গোবরা আরও দু-একজন নতুন সভ্য বসে আছে হা পিত্যেশ করে। এর মধ্যে অনিল কেবিনের মালিকও পটলার নির্বাসনের খবর পেয়ে তার বাকি টাকার জন্যে এসে ধরেছে হোঁৎকাকেই।—তুমিই সেক্রেটারি, ক্লাবের টিফিনের টাকা তোমাকেই দিতে হবে।

হোঁৎকা বলে —আমি পদত্যাগ কইরাছি। এখন প্রেসিডেন্টের কাছে যাও গিয়া।

অর্থাৎ পটলাকেই 'রেফার' করছে সে। অনিল বলে —ওসব বুঝি না। তোমাকেই দিতে হবে। পরে আসব।

ফুচকাওয়ালা নোটিশ দিয়েছে। সাতরুপেয়া উধার হ্যায়। দেনে পাড়েগি।

ওরা ছটফট করছে এমন সময় আমাকে আসতে দেখে ওরা লাফ দিয়ে এসে একযোগে শুধোয়।

—কিছু হইল? পটলারে আটকাইছিস?

ফটিক শুধোয়—থামরে তো র‍্যা?

জানাই—না। পটলকে একটু আগেই ওর ছোটকা গাড়িতে তুলে পাচার করে দিল শায়েস্তাগঞ্জে।

অস্ফুট আর্তনাদ ওঠে—এ্যাঁ! পটলা নাই?

বলি— পটলা আছে। তবে কদ্দিন বেঁচে থাকবে তা জানি না রে! ও বলে গেল, যদি তেমন কিছু হয় ওর ফোটোতে মালাটালা দিয়ে শোকসভা করবি।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে— হক্কলের শোকসভাই করনের লাগবো। তার আগে ঝাঁপে লাঠি দেই কেলাব বন্ধ কইরা দে।

ফটিক করুণসুরে গেয়ে ওঠে— বাবুল মেরে নৈহার ছুটকে যায়।

হোঁৎকা বলে—চুপ মাইরা থাক্ ফট্‌কে। নয়তো তবে মার্ডার করুম।

পটলা হরিপাল স্টেশনে নামতে একটি ছেলে এগিয়ে আসে। লোকজন-যাত্রীরা বের হচ্ছে। বেলা তখন দুপুর, মনমেজাজ ভালো নেই পটলার।

ছেলেটি নৃত্য করতে করতে আসছে। একটা পা যেন ছোট। বলে সে পটলাকে— তুমিই সুভাষচন্দ্র । না?

পটলার ওইটাই পোশাকি নাম। পটলা মাঝে মাঝে ওই নামও ভুলে যায়। আজও হকচকিয়ে চাইল ওর দিকে। ছেলেটি নৃত্যছন্দে একপায়ে ভর দিয়ে দেহটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে।

—কলকাতা থেকে আসছ শায়েস্তাগঞ্জে যাবে নৃসিংহবাবুর বাড়ি?

পটলার পিসেমশাই এর নামধামই ওসব। আর পটলারও এবার মনে পড়ে তার নামটা। বলে সে—হ্যাঁ!

ছেলেটি বলে—আমার নাম পরান। হেডস্যার আমাকে আর বোঁচাকে পাঠিয়েছেন

তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য। কইরে—

বোঁচাও এসে পড়ে। বেশ ভরাটি গড়ন— তবে নাকটা কে যেন ওর কিলিয়ে ফাটিয়ে দিয়েছে। তাই বোধহয় বোঁচা নামই হয়ে গেছে তার।

ওরা দুজনে ওর বই-এর পুঁটলি —সুটকেশ নিয়ে নেচে নেচে চলেছে বাস এর দিকে।

স্টেশনের বাইরেই একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। বাস না জনসমষ্টি একটা জমাট পুঞ্জ ঠিক বোঝা যায় না। ভিতরেও ঠাস বোঝাই, বাইরে বনেটে, সর্বাঙ্গে— পা দানিতে লোক ঝুলছে। আর কনডাকটার তখনও চিৎকার করছে।

খালি গাড়ি। নবীগঞ্জ কুসুমপুর তেড়েকোনা পচাখাল বোধহয় তারপর ও নরকপুরেও যাবে।

পটলা বলে—কোথায় উঠব?

ততক্ষণে পরান সেই ঘোড়া নৃত্য ঘোড়া বিশারদ এক পায়েই তর-তরিয়ে ছাদে উঠে গেছে, সেখানে সুটকেশ জমা করে বলে।

—উঠে পড়ো। জায়গা রেখেছি। পটল ইতিউতি করছে। বাসের ছাদে চড়ে ভ্রমণ ইতিপূর্বে সে করেনি, কিন্তু বোঁচা ততক্ষণে ওর পিছনে ঠেলে ওকে তুলে দিয়েছে গাড়ির মাথায়। নিজেও উঠেছে।

বোঁচা বলে—বাতা ধরে টাইট হয়ে বসে থাকো। নড়ো না। এ বাস ছাড়লে আজ আর বাস নেই। কাল মিলবে। এতেই যেতে হবে।

পটলা চোখ বুজে প্রাণপণে সেই লোহার ছোট্ট রেলিং ধরে বসে আছে। বাস চলেছে —আর রাস্তাও তেমনি। খানাখন্দে ভরা। বাসটা লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে। মনে হয় এখুনি খাদে নেমে পড়বে।

পটলা ঘামছে, মনে হয় শায়েস্তাগঞ্জে আর এ জীবনে পৌঁছতে হবে না, তার আগেই সে ছিটকে পড়বে। হাড় গোড় চূর্ণ হয়ে শেষ হবে। অবশ্য হাড় গোড় এর মধ্যে আলগা হয়ে গেছে প্রায়।

এক একটা ঝাঁকানি দেয় বাসও আর নড়বড় করছে দেহটা। ওদিকে কে ওয়াক্ তুলে বমি করছে। ছাদ থেকে তরল বমিটা নীচের যাত্রীদের গা জামা ভিজিয়ে পড়ছে। কলরব উঠে।

কে কার কথা শোনে। বাস ছুটে চলেছে বিকট শব্দে। পটলার মনে হয় এ জীবনে আর কোনদিন কলকাতা ফিরতে পারবে না! বিদায় কলকাতা, বিদায় কুলেপাড়া, বিদায় পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব।

এখন বোধহয় ওরা আমতলায় আড্ডা দিচ্ছে। আর পটলা চলেছে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে কোন দূরে।

কতক্ষণ চলেছে এভাবে জানে না পটলা। দু একবার পথে বাস থেমেছে, যত না যাত্রী উঠেছে নেমেছে তার থেকে বেশি।

একটা ছোট গঞ্জমত জায়গায় বাস থামতে বোঁচা লাফিয়ে নেমে পড়ে পটলার সুটকেশ, বই-এর পুঁটলি নামিয়ে বলে, নেমে এসো সুভাষ। নবীগঞ্জ এসে গেছি।

পটলা কোনমতে এর তার ঠেলায় ছাদ থেকে পাকা আমের মত পড়েছে, দাঁড়াবার

সামর্থ্য নেই। হাঁটু দুটো যেন 'লুজ হয়ে গেছে। ফলে ধপাস্ করে মাটিতেই পড়েছে।

বোঁচা বলে—প্রথম প্রথম এ লাইনের বাসে উঠলে এমন হয়। দু-এক বার যাতায়াত করলে 'সেট' হয়ে যাবে। পা হাত নাড়া, দেখবে আবার লুজ হাড়গোড় ফিট' হয়ে যাবে।

পটলা কোনমতে উঠে দাঁড়াল। হাতে পায়ের খিলটা এবার ঠিক হচ্ছে।

ল্যাংচা পরান বলে—মাইলটাক পথ, রিক্সা করে গেলে হেডস্যার রেগে যাবে। হেঁটেই চলো। উনি আবার 'সেলফ্ হেলফ'টা বেশি পছন্দ করেন।

নাক বসা বোঁচা নাকি সুরে বলে—বাড়ির কাছে গে সুভাষ তোমার সুটকেশ পুঁটুলি তুমি নিজে বইবে। নাহলে উনি রেগে গিয়ে অনথ বাধাবেন। আমার নাকে সেবার কিল মেরে নাকই ফাটিয়ে দিলেন।

ল্যাংচা পরান বলে ক্লাসে ইংরেজি ট্রানস্লেশন্ পারিনি, লাঠির ঘায়ে হাঁটুর মালাই চাকি ভেঙে দিয়েছিলেন—সিংহ স্যার।

পটলা চমকে ওঠে তার রাঙা পিসেমশাই-এর এ হেন পরিচয় পেয়ে। এর পা ভেঙেছে, ওর নাক ফাটিয়েছে, কার হাত ভেঙেছে, কার কি করেছে। এবার পটলার কি হবে কে জানে।

পটলা মিনমিন করে বলে। তোমাদের দাগি করেছেন তাহলে?

বোঁচা বলে—দেখবে শায়েস্তাগঞ্জে কত ছেলের হাত পা মচকানো—কপাল ফাটা, সব ক্লাসের ফার্স্ট সেকেণ্ড বয়রাই দাগি। তা তুমি তো এবার ফাইনাল দেবে—না?

পটলা বলে—দেখি পরীক্ষা দেবার মত অবস্থা থাকে কিনা। হাঁটছে তো হাঁটছেই। পাড়াগ্রামের মাইল যেন ফুরোতে চায় না। ধু ধু মাঠ। বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। ক্ষিধে তেষ্টাও পেয়েছে। আর গা হাত পা তখনও টন টন করছে। পটলা শুধোয়—আর কতদূর? শায়েস্তাগঞ্জ পৌঁছতে পারবো তো?

বোঁচা বলে— ওই তো এসে গেছি। সামনেই।

সামনে দূর দিগন্তে একটা গ্রামের রেখা দেখা যায় মাত্র। ওরা চলেছে ধূলি ধূসর কাঁচা সড়ক ধরে।

কাছাকাছি আসতে বোঁচা— পরান ওদের হাত থেকে সুটকেশ বই, বই-এর পুঁটুলি যুগপৎ পটলার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বলে—

এবার সিধে চলে যাও। ওই যে স্কুল ওর লাগোয়া ওঁর বাড়ি। উনি আবার সেলফ্ হেলপ্ খুব পছন্দ করেন। তোমার সুটকেশ পুঁটুলি আমাদের হাতে দেখলে আবার নাক ফাটিয়ে দেবেন কি না কে জানে। গো অন্।

পটলার কোমর যেন ভেঙে পড়বে ওই পুস্তক ভর্তি সুটকেশের ভারে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। খিদেতে পেট জ্বলছে। চোখে যেন সরষের ফুল দেখছে ওই 'সেলফ হেলপ' এর ঠ্যালায়। এমন জানলে এখানে কদাপি-ও আসত না।

কিন্তু আর ফেরার পথ নেই। দুপুরের স্তব্ধতা নেমেছে চারদিকে। স্কুলটা ওদিকে—কিছু বট আম পেয়ারা গাছও রয়েছে। পটলা ওই মোট পুঁটুলি নিয়ে টলতে টলতে মুটের মত আসছে।

হঠাৎ বিকটা গর্জন শুনে চমকে ওঠে। যেন একটা বাঘ গজরাচ্ছে। গাঁক্—গাঁক্—গোঁ —গরর—

বইঘর.কম

পটলা চমকে উঠেছে কে জানে বাঁশবনে বাঘই বের হয়েছে বোধহয়, কারণ এর আগে গুপি গায়েন বাঘা বায়েন ছবিতে এমনি বাঁশবনে বাঘ দেখেছে সে।

গাঁ—গরর—

পটলা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে—ওরে বাবারে।

মাথার সুটকেশ বইপত্তর ছিটকে পড়েছে, পটলা বনবাদাড় ভেদ করে দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়েছে, কপালটা কেটে রক্ত ঝরছে, হঠাৎ কাকে ওদিকের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে দেখে চাইল। পিসিমা পটলের পথ চেয়েছিল। কিন্তু তখনও আসেনি। এ বাড়ির কর্তা সিংহমশায় অবশ্য ঘড়ি ধরে চলেন। তাঁর খাওয়া হয়ে যায় বারোটার সময়। স্কুলে সকালে যান, স্কুল শুরু করিয়ে ওই সময় এসে খেয়ে এক পিরিয়ড গভীর নিদ্রা দিয়ে উঠে আবার স্কুলে যান। থাকেন সন্ধ্যা অবধি।

পটলের পিসিমা ওকে খাইয়ে নিদ্রার ব্যবস্থা করে ঘরের কাজ করছিল হঠাৎ ওই বিকট চিৎকার শুনে বাইরে এসে পটলাকে ওই অবস্থায় দেখে চমকে ওঠে।

—তুই! পটল! একী ব্যাপার? এত মালপত্র নিয়ে তুই—পটল এবার পিসিমাকে দেখে কিছুটা ভরসা পেয়ে বলে 'সেলফ হেলপ্' করছিলাম। মানে নিজের জিনিস নিজেই আনছিলাম তা ওই—

ফের সেই বুক কাঁপানো গর্জন শুনে পটলা ভীতচকিত চাহনি মেলে চাইল। পিসিমা বুঝতে পেরে বলে।

—ওমা। তোর পিসেমশাই নাক ডাকছে রে।

—এ্যাঁ! তাই নাকি। পটলা এবার চমকে ওঠে। পিসিমা বলে—ঘুমুলে সিংহমশায়ের নাক ডাকে কিনা। আয় বাবা—উঃ এত দেরি হ'ল।

জিনিসপত্র কুড়িয়ে নিয়ে সিংহের গুহাতে প্রবিষ্ট হল পটল চন্দর।

ততক্ষণে পিরিয়ড ওভার হয়ে গেছে। সিংহমশায়ের সবকিছু ওই পিরিয়ড ধরে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট ঘুম—তারপর ঠিক ঘুম ভেঙে যায়। তিনি উঠে বাইরে এসে পটলাকে দেখে বলেন গুরুগম্ভীর স্বরে—এসে গেছো তাহলে? গুড। এবেলায় খেয়ে দেয়ে রেস্ট নাও। ও বেলায় দেখা যাবে ইংরিজিটা।

পিসিমা বলে—এখন বাছা তেতে পুড়ে এল। ওসব রাখো তো।

সিংহমশায় বলেন—ওসবই আসল। ছাত্রানাং অধ্যয়নতপঃ। পড়াই ধ্যান জ্ঞান। ব্রত!

পটলা দেখছে ওর রাঙা পিসেমশাইকে। নামটাও জবরদস্ত ওঁর। ডবল সিংহের সমাহার। নৃসিংহ মুরারি সিংহ। দেহটাও তেমনি দশাসই। আর রাঙা পিসেমশাই না হয়ে আবলুশ পিসেমশাই হলেই নামটা মানানসই হত। পটল তবু ওঁকে প্রণাম করার জন্য এগিয়ে যেতে হুঙ্কার ধ্বনিত হয়।

—চুল কোথায় কেটেছিলে? কলকাতায়? পটলা নীরব। পিসেমশাই পুনর্বার গর্জে ওঠেন। —এই প্যান্ট! একি দাঁড়িয়ে সেলাই করানো হয়েছিল দেহের সঙ্গে লেপ্‌টে? এ্যাঁ!

পটল চমকে ওঠে। চুস প্যান্ট আর চুলও একটু বাহারেরই তার, অমিতাভ বচ্চনের স্টাইলে—যেন একটা বাবুই পাখির বাসা। পিসেমশাই ওকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে

বলেন— চিত্তবিকৃতির জন্যই অধ্যয়নে মনোসংযোগ করতে পারোনি। এবার দেখছি।

পিসিমা কাতরস্বরে বলে— এখন বাছাকে ছেড়ে দাও। নাওয়া খাওয়া করুক বেচারা।

নেহাত দয়াপরবশ হয়েই সিংহমশায় বলেন। —ঠিক আছে। তাই করুক। কিন্তু এরপর ওকে আমার ফর্মুলাতে চলতে হবে। গাধা পিটিয়ে বহু ঘোড়া বানিয়েছি। তোমার ভাইপোকেও এবার মানুষ করে দেবে এই এন-এম সিংহ। হাফপ্যান্ট আছে তোমার না সব এমনি জিনিসই এনেছো?

—হাফ প্যান্ট! পটলা বলে— একটা এনেছি খেলা করবার জন্য। গর্জে ওঠেন সিংহমশায়—জীবনটা খেলা নয় ছোকরা। হাফপ্যান্ট পরলে নিষ্ঠা বাড়ে, আর কাঁচাকলায় মেধা বাড়ে। কোন মন্ত্রী অবশ্য এসব কথা বলে বিপদে পড়েছিল। পড়বেই তো—এ যুগে সত্যকথা বললে তাকে ঠাট্টা করে লোকে। আই হেট দেম্। আমি স্কুলে যাচ্ছি। সিংহমশায় নিষ্ক্রান্ত হতে এবার পটল দম ফিরে পায়।

পিসিমা বলে—ওর কথাবার্তাই এমনি পটল। স্নানটান করে নে। আর কলকাতায় একটা পৌঁছানো সংবাদ দিয়ে চিঠি দে। সবাই ভালো আছে তো? মা—দাদা বৌদিরা—

পটল ঘাড় নাড়ে। মনে হয় বলবে সে পটলাই মারা গেছে। পটলা সত্যিই মারা গেছে। আর একদিনের মধ্যেই সেটা ঘটেছে।

সকালেই সিংহমশায় ওকে নাপিত ডেকে চুল কাটিয়েছেন—চুল কাটা তো নয় ভেড়া কামানো। ভেড়ার গায়ের লোম যেমন ভাবে কেটে নেয়—ঠিক সেই ভাবেই নাপিত-নন্দন তার মাথার সেই স্টাইলিস্ট চুলগুলোকে কেটে একদম ঘাড়-জুলপির শাঁস বের করে দিয়েছে। কদম ছাঁট করে ছাঁটা—আর পরনে হাফ প্যান্ট আর শার্ট।

কলকাতার সব চিহ্ন মুছে গেছে পটলের দেহ থেকে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার কান্না পায়। নিজেকেই চিনতে পারে না। গর্জন ওঠে—পটলা, ব্যায়াম করেছো? পঞ্চাশটা ডন-বৈঠক দিতে হবে।

—দিচ্ছি তো।

পিসেমশাই ওকে ভোরেই ঠেলে তুলে দেন। পটলার কলকাতায় বেলা সাতটায় ওঠা অভ্যাস। উঠে চা চাই।

আর এখানে? শীতে কাঁপছে তবু হাফপ্যান্ট গেঞ্জি পরে ডন-বৈঠক দিয়ে চলেছে। তারপর কলবেরুনো ছোলা—আদা—কাঁচা হলুদ আর একটু আখের গুড় দিয়ে জলপানি সেরে একটা ধুসো চাদর জড়িয়ে পড়তে বসতে হচ্ছে। তখন সূর্য কোথায় কে জানে—কাকপক্ষীরা কলরব করছে মাত্র।

—জোরে? পস্ট করে উচ্চারণ করো। প্রতিটি সিলেবল পস্ট হবে। তারপর গ্রামার—ট্রানস্লেশন করে আনো।

ওদিকে এর মধ্যে চার পাঁচজন ছাত্র বসে গিয়েছে। কে আর্তনাদ করে ওঠে—আঁক্।

সিংহমশায়ের থাবার মৃদু স্পর্শেই ছেলেটা ছিটকে পড়ে 'চিঁ চিঁ করছে। গর্জাচ্ছেন সিংহস্যার—ভাওয়েল কনসোনেন্ট জানিস না ভয়েস চেঞ্জ করবি কী করে। মারবো এ্যাক রদ্দা—

বইঘর.কম

সে বেচারার ভয়েস ভয়ের চোটেই চেঞ্জ করে গেছে। চিঁ চিঁ করে সে।—মারবেন না স্যার! এবার ঠিক করেছি।

পটলার ট্রানস্লেশন দেখে অভ্যাসমত সিংহমশায় ওর চুলের মুঠি ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। কারন নাপিত এ ব্যাপারে পটলাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। সিংহমশায় বলেন।

—কলকাতায় এই ইংরাজি শেখায়? টেন্স ভার্ব এসবও জানিস না? নিয়ে আয় গ্রামার।

পটলাকে নিয়ে পিসেমশাই আড়ং ধোলাই শুরু করেন। ইংরাজি তারপর অঙ্ক। বৈকালে আবার সেই রগড়ানি। চলে অধিক রাত্রি অবধি।

এছাড়া পটলার অন্য কাজও আছে। কয়েকজন ছাত্রও সেই কাজ করে। সিংহমশায়ের বাড়ির লাগোয়া একটানা লম্বা একটা ব্যারাকমত ঘর খোপ খোপ করা, সেখানেও কয়েকজন গরিব ছাত্র থাকে। বোঁচা—পরান আরও অনেকেই। সকালে পড়াশোনার পর তাদের দৈহিক পরিশ্রমও কিছু করতে হয়। অবশ্য সিংহমশায় বলেন—এগ্রিকালচারাল ট্রেনিং।

নিঃসন্তান সিংহমশায়ের আশ্রয়ে থেকে ওরা পড়াশোনা করে। তাঁর বাগান খেতে ধান শাকসবজি যা হয় তাই থেকেই ওদের খাওয়া চলে।

তাই বাগানেও কমবেশি কাজ করতে হয় তাদের। পটলকেও বলেন সিংহমশায় কায়িক পরিশ্রমও দরকার। কোদাল চালাতে হবে।

পিসিমা আড়ালে বলে—কি বলছো গো? দাদা শুনলেন সিংহমশায় গর্জে ওঠেন—তোমার দাদা ছেলেকে অমানুষ করে তুলেছিল আমি এই এন এম সিংহ ওকে মানুষ করে দেব। নো টক্!

পিসিমা চেনে কর্তাকে। তাই চুপ করে যায়। পটলা তখন কোদাল চালাচ্ছে কলাবাগানে। তাদের কলকাতার বাড়িতে রোজই মুরগি কাটা হয়, এখানে সিংহমশায়ের আস্তানায় 'নো মাংস' তিনি নিরামিষে বিশ্বাসী। তাই রোজ এখানে কলাগাছ কাটা হচ্ছে। থোড়-মোচা-কাঁচাকলা-গর্ভমোচা-কলা এভরিথিং রোজ চাই, তৎসহ পেঁপে-ডুমুর-সিম-বাঁধাকপি আর তারকেশ্বরের কুমড়ো। তার সঙ্গে অড়হড়ের ডাল।

পটলার কান্না আসে খেতে বসে। পিসিমা প্রথম প্রথম আড়ালে ডিম মাছ-এর ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু সিংহমশায়ের গোচরে আসতে তিনি সাবধান করে দেন।

কোনো পক্ষপাতিত্ব চলবে না এখানে। ও পিসিমার আদর খেতে আসেনি। গুরুগৃহে এসেছে অধ্যয়ন করতে। কৃচ্ছ্রসাধন করতেই হবে। না পারে ওকে 'রিটার্ন টু সেন্ডার' করে দেবে এই এন এম সিংহ।

ওর ভবিষ্যৎ-এর কথা ভেবেই পিসিমা চুপ করে যায়। ক'টা মাস এই চলছে, পটলার যেমন অদৃষ্ট। পটলার ক'মাসেই চেহারা একেবারে বদলে গেছে। কদম ছাঁট চুল, খালি পায়ে চলাফেরা করে পা ধূলি ধূসর, সেই কলকাতাইয়া কমনীয়তা কিছুমাত্র নেই। পরনে হাফ প্যান্ট ময়লা শার্ট!

ভোর থেকে পড়া আর কাজ। দুপুরেও পড়া—সন্ধ্যাতেও। অবশ্য মাস দুয়েকের মধ্যে পটলা এখন ইংরেজিতে ভালো লিখতে পারছে, অঙ্কগুলোও আর জটিল ঠেকে না; বাংলা-সংস্কৃত বেশ সড়গড় হয়ে গেছে। এখন আকবর আর শাহজাহানে একাকার করে দেয়

না। প্রথম থেকে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ মায় তার সন তারিখও সঠিক বলতে পারে। জ্যামিতি থিয়োরমে প্রবলেমও গুলিয়ে যায় না।

তবে ওই থোড় আর ডুমুর পেঁপে এখনও ঠিক রপ্ত করতে পারেনি। তবে কোদাল চালাতে শিখে গেছে। কিন্তু তারকেশ্বরের কুমড়োটা আদৌ সহ্য হচ্ছে না তাই পেটের অসুখ ধরিয়েছে। ফলে থানকুনি পাতাও গিলতে হচ্ছে।

কলকাতায় এসব খবর আমরা পেয়েছিলাম পরে, আমিই মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি যাই। সেখানে নাকি চিঠি আসে পটলা ভালো আছে। ইংরেজি কেন সব সাবজেক্টে প্রভূত উন্নতি করে চলেছে।

এদিকে আমাদের দারুণ অবনতি ঘটেছে। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। মাঠে আর খেলাধুলো নেই, ফলে ঘাস গজিয়েছে। আমরাও সেই অনিল কেবিন, গোকুল কুলপিওয়ালার তাগাদার চোটে ক্লাব ছাড়া প্রায়।

ফটিকই মাঝে মাঝে যায় আর ক্লাবের ঘরটায় গোবরার মামা এখন কুমড়োর গুদাম করেছে। অবশ্য দরকার হলেই কুমড়ো সব সরিয়ে নেবে বলেছে। এখন তারকেশ্বর থেকে ওরা ট্রাকবন্দি কুমড়ো এনে 'হোলসেল'-এ বিক্রি করছে। গোবরাও কুমড়োপটাশ হয়ে উঠেছে কুমড়োর কমিশনে। ট্রাক নিয়ে তারকেশ্বরের বিভিন্ন অঞ্চলে যাচ্ছে।

তবু হোঁৎকা বলে— এতবড় 'ডিবিট'টা মাইনা নিতে হবে? নেভার!

আমি জানাই পটলা ফিরে আসুক, হোঁৎকা বলে— যাদের পটলা নাই তাগোর কেলাব নাই? পটলা একটা 'ট্রেটার,' আমাগোর ফেলে থুইয়া পিসিমার আদর খাইতেছে। মাছ মাংস সাঁটতেছে। ওরে ছাইড়া ক্লাব করুম।

ফটিক বলে— নাহলে দুমাসে একটা পোস্টকার্ড দেয়নি। এই বন্ধু? ও নিজের তালে আছে রে। ও সেলফিস্ জায়েন্ট!

চুপ করে থাকি। বলি কি ভেবে।—কেমন আছে কে জানে। ওর ঠাকুমা তো কাল বলছিল ছোটকাকাকে খবর নিতে। ঠাক্‌মা নাকি ওকে আনতে চায় এখানে।

হোঁৎকা কি ভেবে বলে—ঠাক্‌মার কাছে খবর নে। গোবরা বলে— শায়েস্তাগঞ্জের কাছে তো আমাদের ট্রাক যায়, এই শনিবার নবীগঞ্জের মেলা। প্রচুর কুমড়ো আসে কিনতে যাবো।

ফুঁসে ওঠে হোঁৎকা—তুই থাম দিকি কুমড়োপটাশ? তর মামার কুমড়ো হঠিয়ে নিতি ক। ক্লাব না কুমড়োর গুদাম? হক্কলে হাসতিছে।

গোবরা চুপ করে যায়।

ঠাক্‌মা অবশ্য কিছুদিন পর পটলার অভাবটা বুঝতে পারেন। পটলাই এ বাড়ির একমাত্র বংশধর। তাকে এখানে রেখে ভালো মাস্টার দিয়ে পড়ালেই পারত। কিন্তু ছেলেরা তা করেনি। এবার ঠাক্‌মা বলে—পটলার ওখানে ঢের পড়া হয়েছে। এবার আন ওকে। সরোজও লিখেছে ওখানে নাকি পটলার শরীর টিকছে না।

সরোজ পটলার পিসিমার নাম। পিসিমা অবশ্য পটলাকে ওইভাবে থাকতে দেখে খুশি হয়নি। তার স্বামীর উপর কথা বলতে না পরলেও ঠারে ঠোরে মাকে কিছুটা আভাস দিয়েছে বোধহয় চিঠিতে।

কিন্তু ছোটকা বলেন—পটলা আরও একটা মাস থেকে তৈরি হয়ে আসুক। এখন তো কষ্ট করার সময়। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না মা।

ঠাক্‌মার ওইখানেই আপত্তি। কিন্তু ছেলেদের মত করাতে পারেননি।

তাই আমার কথায় বলেন পটলাকে একবার দেখে এসো না। কাছেই তো। গাড়ি ভাড়া টাড়া যা লাগে বলে নিজেই পঞ্চাশটাকা গছিয়ে দেন ঠাক্‌মা।

হোঁৎকা সব শুনে বলে— ওর তো কেস গড়বড় মনে লয়। শায়েস্তাগঞ্জে লই যাই পটলারে শায়েস্তা করনের ব্যবস্থাই হইছে। ওরে উদ্ধার করতি লাগ্‌বো।

আমি বলি—উদ্ধার করে কাম নাই, ওর বাবা কাকারা বুঝবে। শুধু খবরটা নিয়ে আসতে হবে।

গোবরা বলে—এ এ আর শক্ত কাম কী? নবীগঞ্জের মেলায় যাবো কুমড়ো কিনতে, তোরা ওই ফাঁকে খবর নিয়ে আসবি। কাছেই তো। চল আজ রাতেই ট্রাক যাবে।

কুমড়ো নিয়ে যে এমন বাণিজ্য হয় তা জানা ছিল না। মাঝরাতে ট্রাক নিয়ে বের হয়েছে গোবরা; ডানকুনি সিঙ্গুর হয়ে হরিপালের কাছে এসে সেই রাস্তা ছেড়ে আমরা চলেছি নবীগঞ্জের দিকে। দুদিকে মুক্ত প্রান্তর ধানখেত, দুচারটে গ্রামবসতও দেখা যায়। তখন সকাল হতে চলেছে।

ট্রাকওয়ালা কোন মোকামে কলকাতা থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া মালপত্র খালাস করে এবার আমাদের নিয়ে কুমড়ো গ্যস্ত করতে চলেছে নবীগঞ্জে।

নবীগঞ্জের মদনমোহনের মেলার খুবই নামডাক। দূর-দূরান্তরের গ্রাম গঞ্জ থেকে কাতারে কাতারে লোকজন আসে। কারণ মদনমোহন নাকি খুবই জাগ্রত। সারা বছর ধরে এই এলাকার মানুষ নানা আশা নিয়ে দেবতার উদ্দেশে মানসিক করে। এই মেলার সময় সেই ঋণ শোধ করতে আসে।

বেশ বড়সড় মন্দির নাটমন্দির , সামনে বড় দিঘি। গাছগাছালি ঘেরা চত্বর। আর ওদিকে ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠে সাতদিন ধরে মেলা বসে।

দিনরাত মেলা জমে থাকে। বড় বড় দোকান-পশার আসে। জামা, কাপড় মনোহারী রকমারি মিষ্টির দোকান সার্কাস ম্যাজিক পুতুলনাচ-যাত্রা এসব তো হয়ই। বিদ্যুৎ চালিয়ে আকাশছোঁয়া নাগরদোলা আসে, আরও হাজারো রকম আকর্ষণের আমদানি হয়। এছাড়া গরুর গাড়ির চাকা, লাঙল কপাট জানলা—সবই আসে। আর চারদিকে চাষীদের এলাকা। তাই কৃষিবিভাগ থেকে বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। দেড় হাত মুলো, এক কাঁদিতে দেড়শো নারকেল, তিরিশ কেজি সাইজের কুমড়ো, চোদ্দ হাত লম্বা আখ, চার সের বেগুন এসবও আনা হয় প্রদর্শনীতে। আর আসে কুমড়ো।

ফলে লোকজন ভেঙে পড়ে। এই কদিন শায়েস্তাগঞ্জের স্কুলের ছেলেদের নিয়ে স্বয়ং এন এম সিংহমহাশয় মেলায় পুলিশকে সহযোগিতা করেন। দলে দলে ভলেনটিয়ার থাকে মেলায়, বিশেষ করে মন্দিরের আশেপাশে, প্রবেশদ্বারেও মাইকে অনবরত ঘোষণা করা হচ্ছে কে কোথায় হারিয়ে গেছে। কাকে ফার্স্ট এড দিতে হবে। জনতা কোনদিকে যাবে ইত্যাদি।

ওই জনসমুদ্র দেখি আমরাও। আর দেখি মাঠে গাদা করা নধর সাইজের কুমড়ো। টাল

হিসেবে দর। খুচরো ব্যাপার নেই। পাহাড়প্রমাণ কুমড়ো।

হোঁৎকা বলে—তুই মাল কেন গোবরা, দেহি শায়েস্তাগঞ্জের খবর নিইগা।

দুতিনজন রোগা পটকা খোঁড়া বোঁচা ছেলে জামার উপর লাল ফিতে আলপিন দিয়ে আটকানো, তারা বলে— ট্রাক এখানে নয় ওদিকে রাখো।

একদল আবার পথে দড়ি ধরে একবার এদিক চেপে মেয়েদের যাবার পথ করছে, তারা কিছু চলে গেলে, দড়িটা ওদিকে চেপে এবার পুরুষদের যেতে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার বাঁশি বাজিয়ে সংকেতও হচ্ছে।

একজন কালো মুগুরমার্কা দেহ নিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে। সব যেন ঠিকমত হয় বয়েজ। স্নান যাত্রার ভিড় বি কেয়ারফুল। ভলেনটিয়ার্স ট্রাক গাড়ি সব এখন হঠিয়ে দাও ওদিকে।

একটা সর্দার মত ছেলে নাচতে নাচতে বলে সব ঠিক হবে স্যার।

স্যার ওদিকে চলে গেলেন হন্তদন্ত হয়ে। চিৎকার করে পেংটি ভলেনটিয়ারের দল গাড়ি হঠাও।

হোৎকা বলে— হালায় আদাড় গাঁয়ে শিয়াল রাজা হইছে। আমাগোর শেখায় ভলেনটিয়ারি।

ওরা চিৎকার করে গাড়ি সরান। এখন কুমড়ো কেনা চলবে না। হোঁৎকা বলে— এহানে তো ভিড় নাই।

একজন বলে আবার জবাব। ওরে ক্যাপ্টেন সুভাষদাকে খবর দে।

হোঁৎকা হেসে ওঠে। বলে সে—

—আর্সুলা আবার পক্ষী, তোমাগোর আবার ক্যাপ্টেন? তারেই ডাকো, দেহি ক্যামন ক্যাপ্টেন।

ডাকতে হয় না, পি পি বাঁশি বাজছে। ভলেনটিয়ার বাহিনীও এমন অবাধ্য লোকদের দেখেনি। স্বয়ং ক্যাপ্টেনই এসে পড়েছে চিৎকার করে সে।

ক্ কি কি হয়েছে? এখানে এত ভি-ভিড় কেন? ট্রাক হঠাও।

হঠাৎ আমাদের দেখে পটলা চমকে ওঠে। ওর বীর দর্প থেমে গেছে। এগিয়ে আসে সে। কতদিন পর আমাদের দেখছে। জিবটা আলটাকরায় সেঁটে গেছে।

ত্ ত্ ত্ তোরা! এখানে?

আমরা প্রথমে ক্যাপ্টেনকে চিনতেই পারিনি। পটলার সেই তেলচুকচুকে অমিতাভ বচ্চন মার্কা চুল একদম কদমছাঁট করে ছাঁটা, পরনে নড়বড়ে হাফপ্যান্ট আর খাকি শার্ট, ধূলিধূসর পায়ে একজোড়া পুরোনো কেডস। মুখের সেই নধর ভাবটাব গিয়ে শীতের রুক্ষতা ফুটে উঠেছে, আর আধখানা হয়ে গেছে। ঈষৎ ল্যাংচাচ্ছে ওই ছাত্র বাহিনীর মতই, কপালেও একটা নতুন কাটা দাগ পটলার বদনকে বদলে দিয়েছে একেবারে। এ যেন অন্য পটলা কোন অজ গাঁইয়া।

চমকে উঠি আমরাও। পটলাকে এখানে এইভাবে আবিষ্কার করব ভাবিনি।

—তুই! পটলা এখানে? এ কি হাল হয়েছে তোর? পটলাও তা জানে। তাই অভিমান ভরে বলে।—ক'দিন পর শোকসভাই করতিস। কেন এলি?

হোঁৎকা বলে—ইংরাজিতে ক্যামন পাকা হইছিস তাই দেখতে কইছে তোর ঠাক্‌মায়?

ঠাক্‌মার নাম শুনে পটলা বলে।—ঠক্‌মারে কইবি পটলা মরে গেছে। ডেড, এন্ড গান্। গো 'ভারবের' পাস্ট পারটিসিপল হয়ে গেছে গান্ ফট! আর কলকাতা বোধহয় ফেরা হবে না রে!

আমি ওকে ছাড়তে চাই না। পটলাকে এমনি করুণ অবস্থায় দেখে আমরাও কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি, পটলা মোটেই ভালো নেই। ক্লান্ত শীর্ণ চেহারা। ওর ঠাক্‌মা—মা হয়তো সব খবর জানেন না। বলি।

—আমাদের সঙ্গে কলকাতা ফিরে চল ট্রাকে।

পটলা বলে—সিংহমশায়কে চিনিস না। খবর পেলে তোদেরও ধরে নে গিয়ে দাগি করে ইংরাজি শেখাবে অঙ্ক কষাবে। দেখছিস না এদের?

ভলেনটিয়ার বাহিনীর প্রায় সকলেরই দেখি কেউ খোঁড়া—কারো কপাল কাটা; শুধোই। —ক্যামন মাস্টার রে!

পটলা বলে—তাই বলছি আমি মরছি, লেট মি ডাই। তোরা পালা। হোঁৎকা গর্জে ওঠে—ঢের দেখেছি এ্যামন মাস্টার? চল তুই না যাস্ তরে কল্লা ধরি ট্রাকে তুলে লই যামু তর ঠাক্‌মার কাছে। যা করবার ওই করবে।

হোঁৎকা পটলার জীর্ণ জামার কলার টেনে ধরে ওকে ট্রাকের দিকে নিয়ে চলেছে।

ভলেনটিয়ারের দল ও তাদের ক্যাপ্টেনকে এভাবে টেনে হিঁচড়ে ট্রাকজাত করতে দেখে একসঙ্গে ফুঁ ফাঁ শব্দে গোটাকতক বাঁশি বাজাতে শুরু করেছে। দু-চারজন ল্যাংচা মার্কা ভলেনটিয়ার এগিয়ে এসে বাধা দেবার চেষ্টা করতে তারাও হোঁৎকা আর ফটিকের মারের চোটে ছিটকে পড়েছে। কলরব ওঠে মেলায়।

দৌড়ে আসছে লোকজন। এত লোকের মাঝে ভলেনটিয়ারের ক্যাপটেনকে তুলে নিয়ে যারে এ হতে দেবে না।

আমরাও বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারি।

গোবরাও এর মধ্যে বেশ বাছাই সাইজের কুমড়োতে ট্রাক প্রায় বোঝাই করে তুলেছে, লোকজন এর মধ্যেই দোকানের ঝাঁপ-এর বাঁশ লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে।

ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় বিশালদেহী সিংহমশায়কে, বীরদর্পে হুঙ্কার ছাড়েন স্টপ দেম! থামাও—ওরা পটলাকে কিডন্যাপ করছে।

আমাদের আর থামার উপায় নেই, দেরি করলে গণধোলাই-এর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। পালাতেই হবে। তাই পটলাসমেত ট্রাকে উঠেছি। জনতা ট্রাক ঘিরে ফেলার উপক্রম করছে।

হঠাৎ বুদ্ধিটা মাথায় এসে যায়।

হোঁৎকা ওই সামনের জনতার উপর ট্রাক থেকে একটা আধমণি কুমড়ো তুলে ছুড়ে দেয়। বিরাট কুমড়োটা পড়েছে কার মাথায় তারপর মাটিতে পড়ে প্রচণ্ড শব্দে বিদীর্ণ হয়ে যায়, তারপরই ছুড়ছে আর একখান! কুমড়ো যে এমনি শব্দ করে বিস্ফোরিত হয় জানা ছিল না,

আর এমনি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে তাও অজ্ঞাত ছিল।

আচমকা কুমড়োর আক্রমণে সামনের জনতা সরে যায়, কে চিৎকার করে বোমা বোমা মারছে—

সামনে খালি রাস্তা। ট্রাকওয়ালা এবার পঞ্চাশ মাইল গতিবেগ তুলে ছুটছে, পিছনের যারা তাড়া করেছিল তাদের উদ্দেশে দু চারটে দশ কেজি সাইজের কুমড়ো ছুড়তে তারাও কেটে পড়েছে।

ট্রাক তখন নবীগঞ্জের মেলা ছাড়িয়ে তারকেশ্বর রোডের দিকে ছুটে চলেছে, গোবরাও খুশি। গোলমালে কুমড়ো মহাজনকে দামও দিতে পারেনি। মামার থেকেও সেটা ম্যানেজ হয়ে যাবে।

কলকাতা পৌঁছলাম তখন বৈকাল হয়ে গেছে।

ঠাক্‌মা পটলাকে ওই অবস্থায় দেখে ডুকরে কেঁদে ওঠেন। ওর মাও অবাক হন। ঠাক্‌মা বলেন—ওকে এনে ভালোই করেছিস তোরা। এখানেই বাকি পড়াটা করুক।

ছোটকা গম্ভীর হয়ে যান।

অবশ্য সিংহমশায়ের উদ্যম বৃথা যায়নি। পটলা ওই ক'মাসের পড়াতেই ফার্স্ট ডিভিশনে গেছল।

লঙ্কাদহন পালা

ফটিক অবশ্য কালোয়াতি গান নিয়ে থাকে। তিন বছর ধরে মাত্র তিনখানা গান নিয়েই এন্তার বমি করে চলেছে। বলে—রাগ রাগিণীর ব্যাপার, সাধনার দরকার।

ইদানীং পটলার নাটকে সে সুর সংযোজনা করেছে। সুতরাং ফটিক বলে—থাম দিকি হোঁৎকা ! নাটক দিয়েই এবার পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব সমাজসেবার কাজ করবে।

পটলাও বলে —সিওর!

এর মধ্যে ম্যারাপ বেঁধে পটলার নতুন নাটক 'আমরা কারা' মঞ্চস্থ হয়েছে। পটলার ছোটকাকা আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক । পাড়ায় গাছে-দেওয়ালে পটলার নাটকের পোস্টার পড়েছিল। হোঁৎকাও কোনো অরিজিন্যাল বাস্তুহারার রোল করেছে খাঁটি বাঙাল ভাষায়। ওটা ছাড়া অন্য ভাষায় ওর বোল ফোটে না। দারুণ করেছিল।

আমার অভিনয়ের জন্য একটা রৌপ্যপদক ঘোষণা করা হল, পটলার নামে ঘোষণা করা হল তিনখানা, অবশ্য তার একখানাও এতাবৎ হস্তগত হয়নি। ওরা কবুল করেই চুপ করে গেছে।

তবুও আরা এবার জোর কদমে নাট্য আন্দোলনে ভিড়ে পড়েছি।

পটলা সেদিন খবরটা আনল। ওর পিসতুতো ভাই এসেছে হাড়ভাঙা বসন্তপুর থেকে, ওদের অজগ্রামেও এখন নাকি রীতিমত সাংস্কৃতিক চেতনার মশাল জ্বলে উঠেছে। গ্রামের বাৎসরিক ধর্মরাজ পুজো উপলক্ষে তারা কলকাতা থেকে আমাদের নাটকের দলকে নিয়ে যেতে চায়।

পটলার 'আমরা কারা' নাটকের সুখ্যাতি তারাও শুনেছে। তাই ধেয়ে এসেছে।

হোঁৎকা বলে— হালায় অজ পাড়াগাঁয়ে যাবি পটলা?

হোঁৎকা কলকাতাতেই মানুষ হয়েছে। পাড়াগ্রাম সম্বন্ধে তার একটা এলার্জি রয়ে গেছে। পটলা নাটকের জন্য ডাক পেয়ে বোধহয় সুমেরু কুমেরুতেও চলে যাবে। সে বলে— কেন যাবি না? পল্লীর অন্ধকার ত-তমশার মাঝেও ন্-নাটকই পথ প্রদর্শন করতে প্—প্—

আমি পাদপূরণ করি— পথ দেখাতে পারে।

পটলা এবার ইংরেজিতে মন্তব্য করে—করেকট। তাই এ আমন্ত্রণ আমরা নেবই।

ফটিক বলে— নিশ্চয়ই। এ আমাদের পুণ্যব্রত। যেতেই হবে সেখানে।

হোঁৎকা বলে— কুনো ঝামেলা হইব না তো?

পটলার পিসতুতো ভাই-এর চেহারাটা শীর্ণ, মাথাটা বেশ বড়সড়। তাতে বাবরি চুলও রয়েছে। দেখতে অনেকটা খ্যাংরা-কাঠির মাথায় আলুর দমের মতই। নামটাও বেশ জবরদস্ত। চঞ্চলকুমার।

চঞ্চলকুমার বলে ওঠে— তাদের দেশজ বীরভূমী ভাষায়, কুন শালো কি করবেক হে? খেঁটে লাদনার বাড়িতে উদের পিন্ডি চটকাই দিব না? রং চালাকি! তবে পটলা, একটো ডাংসার লিয়ে যেতে হবেক। পালার আগে দু'একটা লাচ লাগাই দিবি।

আমি বলি—নাচ! আমাদের নাটকে ওসব তো নেই। ইঙ্গিতধর্মী নাটক তো।

চঞ্চল বলে— লাচ কিন্তুক চাই হে! বোতল নিত্য, জিপসি লাচ, না হয় ডিস্‌কো লাচ চাই কিন্তুক!

পটলা বলে— হবে। ডিসকো নাচও হবে।

চঞ্চল খুশি হয়ে বলে—তাহলে তো আর কথাই নাই। ব্যস। ওই কথাই রইল। সামনের মাসে তেরো তারিখ সকালের বাসে ইখান থেকে যেয়ে দুবরাজপুরের আগে হাড়ভাঙা বসন্তপুরের মোড়ে নেমে পড়বি। উখান থেকে আমরা লিয়ে যাবো। হুঁ!

যাবার গাড়িভাড়া আর ড্রেস-মেক্‌আপ বাবদ শ দুয়েক টাকাও দিয়ে গেল। চঞ্চল বলে— লাইট-ফাইট সিউড়ি থেকে আসবেক। ফকাস্ যা দিবেক দেখে লিবি বটে পটলা। লাল, লীল, বাসন্তী রং যা চাইবি সব পাবি।

হোঁৎকা চুপ করে আছে।

চঞ্চল বলে চলেছে—আর খাওয়ন-দাওয়নও হবেক জোর—

এবার আহারের নাম শুনে হোঁৎকা একটু চঞ্চল হয়। শুধোয় সে—মাছ-মাংস থাকবো নিশ্চয়?

চঞ্চল বলে— হেঁই দ্যাখো? দশ বারো সেরি ঘেঁটো রুই খাওয়াবো হে। আর মাংস? একটো ইয়া খাসি রেখেছি, গাদাড়ে দিব। আর হাড়ভাঙার দইও দেখবা, হাঁড়ি ফাঁটাই দাও, দই টুকিবেনও পড়বেক নাই। ত্যামন দই দিব হে।

ঘনঘন রিহার্সেল হচ্ছে। আর টেপরেকর্ডারে ডিস্‌কো মিউজিকের তালে তালে কানা বিশেও এবার নাচের মহড়া জোরদার করে তুলেছে।

পটলা তখন টিম নিয়ে এবার দূরপাল্লার বাসে যাবার আয়োজন করছে।

এর আগে এত দূরে অভিনয় করতে আসিনি। শালবন—অজয় নদী পার হয়ে বাসটা চলেছে, বেলা তখন প্রায় এগারোটা। কনডাকটার একটা মাঠের মধ্যে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলে— হাড়ভাঙা বসন্তপুর মোড়। নেমে পড়ুন।

আমরা স্যুটকেস, ব্যাগ, ওদিকে সাজের বাক্স-টাক্স নিয়ে হড়বড়িয়ে নামলাম, বাসও আমাদের বাতিল মালপত্রের মত এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের মাঠে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

একটা পুরোনো বটগাছ-এর নীচে ছোট্ট একটা চায়ের দোকান মত। বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি দুটো মাচা, ও-দুটোই বেঞ্চের কাজে লাগায় দোকানদার।

হোঁৎকা বিবর্ণ মুখে বিড়বিড় করে— ক্ষুধা পাইছে—কইল মাছ মাংস, ভরপেট দইও দিবে। হালায় ওগোর পাত্তাই দেহি না রে পটলা!

রোদও বেড়ে উঠেছে। দেখছি এদিক ওদিকে। পটলাও বিপদে পড়েছে। হঠাৎ তিন চারজন ছেলেকে সাইকেল নিয়ে আমাদের দিকে আসতে দেখে চাইলাম। ওদেরই একজন এগিয়ে এসে শুধোয়—কলকাতা থেকে আসা হচ্ছে? এ্যাঁ!

বইঘর.কম

ছেলেটার গোঁফজোড়াটা বেশ জমজমাট। গলাটাও একটু কর্কশ। পটলা আশাভরে বলে—হ্যাঁ। আপনারা হাড়ভাঙা বসন্তপুর থেকে আসছেন? চঞ্চলদা পাঠিয়েছে?

অন্যজন বলে—উসব চলবেক নাই হে। হাড়ভাঙা বসন্তপুরে ঢুকবা নাই তুমরা। ইখান থেকেই পরের বাসে পানাগড় চলে যেতে হবেক।

অবাক হই—সেকি? এতদূর এলাম নাটক করতে, শেষকালে ফিরে যেতে হবে? কেন?

ছেলেটা এবার গোঁফে চাড়া দিয়ে বলে, কেনে-মেনে বুঝি না। গাঁয়ে ঢুকলে হাড় গুঁড়ো করে দোব। গাঁয়ের নামটা জানো তো?

এবার চমকে উঠি। হাড়ভাঙা নামটা শুনে তখনও ঠিক বুঝিনি।

এবার মনে হয় সত্যিকার ওইসব কাজ এরা করে তাই ওই নামটাই বহাল হয়েছে এ গ্রামের।

হোঁৎকা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এই সব শাসানি শুনে এবার হোঁৎকা এগিয়ে আসে। খিদের চোটে জ্বলছিল আগেই, এবার ওদের কথায় জ্বলে উঠে হোঁৎকা ওদের একজনকে ধরে ফেলেছে। বলে হোঁৎকা—কি কইলা? হালায় কলকাতার কুলেপাড়ার জিনিস, আমাগোর ওই একখ্যান গাঁয়ের নাম কইরা ভয় দেখাবো? আমাগোর হাড় ভাঙার আগে তোমার গোঁফখানই খুইলা লমু!

ছেলেটা চমকে উঠেছে। ফটিক নির্বিরোধী টাইপের ছেলে। বিদেশে এসে এসব ঝামেলা সে পছন্দ করে না। তাই ওকে হোঁৎকার হাত ছাড়িয়ে বলে— থাম্ হোঁৎকা। যাও ভাই তোমরা।

ছেলেটা ছাড়া পেয়ে তার সহচর দুজনকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে বলে—ঠিক আছে। বললাম যাবেন না, তারপরও যদি যান তখন দেখা যাবে।

আমরাও ভাবনায় পড়েছি। গলা শুকিয়ে আসছে। কানা বিশের নাচের পোজ থেমে গেছে। সে বলে— কাজ নাই গাঁয়ে গিয়ে, ফিরে চল।

সেই চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছি। দোকানদারই জানায় ফেরার বাস সেই বেলা তিনটেয়।

অর্থাৎ সারা দুপুর শুধুমাত্র লেড়ো বিস্কুট চিবিয়ে বসে থাকতে হবে এখানে। ওদিকে সেই ছেলেরাও দেখছে আমাদের।

গতিক ভালো বুঝছি না। তাই বলি—ফিরেই চল পটলা। চঞ্চলদারাও কেউ এল না, গ্রামের ছেলেরা এসে শাসাচ্ছে, ওখানে নাটক করতে যাওয়া ঠিক হবে না।

হোঁৎকা গর্জায়—ওগোর শাসানি ছুটাই দিমু!

এমন সময় দেখা যায় দূরের গ্রাম থেকে শ'খানেক লোকজন ছেলেপুলে লাঠি উঁচিয়ে মত্ত কলরবে বড় রাস্তার দিকে ধেয়ে আসছে। ভয় পেয়ে যাই। মনে হয় এবার ওই ছেলেগুলোর কথা না শোনার জন্যই বোধহয় মারধরই করতে আসছে তারা।

নাটক করতে এসে পটলার জন্যে প্রাণটা বেঘোরে দিতে হবে তা ভাবিনি। বলি—পটলা! এবার মেরে ফেলবে রে!

হঠাৎ দেখি ওই দলবলকে ছুটে আসতে দেখে ওদিকের তিনটি ছেলে উঠি কি পড়ি ভাবে সাইকেলে চেপে বড় রাস্তা দিয়ে দৌড় মারল, ওই মাঠ থেকে আগত দলেরও কিছু ছেলে ওদের তাড়া করেও ধরতে পারল না।

ভিড় থেকে চঞ্চলদা এবার বের হয়ে এসে বলে, আইচ হে তুমরা। বুঝলা ভায়া—গাঁয়ে শালোরা কিষ্ট যাত্রা করাবেক; তাই লিয়ে তক্কো, কিষ্ট যাত্রা হবেক লাই, কলকাতার নাটক হবেক। শালোদের হঠাই দিলম্। চলো—

বিবাদের নমুনা কিছুটা বুঝেছি। ওরা তাই আগে এসে আমাদের তাড়াতেই চাইছিল। ফটিক বলে—ওখানে আর নাটক করে কাজ নাই পটলা। টেপরেকর্ডার, লাইট-ফাইট যদি ভেঙে দেয়?

ভাববার কথা। তাই বলি, ঠিক বলেছিস ফটিক। পটলা, তিনটের বাসে ফিরে চল। আর নাটক করে কাজ নাই!

গোবরাও সায় দেয়। কানা বিশে তো আগেই তার মতামত জানিয়েছে। আমাদের অন্যতম অভিনেতা নিতুও তাই বলে—সেই ভালো। ওদের গোলমালের মধ্যে আমরা কেন যাব?

ভোটের জোরে পটলাও এবার মত বদলায়। তাহলে ফিরেই চল।

ভরপেট মাছ-মাংস ফস্‌কাবার দুঃখে হোঁৎকা ম্রিয়মান। কিন্তু ও পক্ষ এবার অন্য মূর্তি ধরে। সিঁটকে মত একজন লাঠি উঁচিয়ে বলে—ফিরে যাবে? এ্যাঁ—রং চালাকি পেয়েছ? এ গাঁয়ের নামটা জানো? হাড়ভাঙা বসন্তপুর। হাড় ভেঙে পাউডার বানিয়ে দোব। মানে মানে গাঁয়ে চলো—'পেলে' করো, ব্যস্। বাপের সুপুত্তুরের মত ফিরে যাবে।

অন্যজন গর্জে ওঠে— না হলে কলকাতার মুখ আর দেখতে হবেক লাই, লাশগুলান দিঘির পাঁকের লীচে পুঁইতে দিব।

পটলা এবার আর্তনাদ করে ওঠে—চঞ্চলদা?

চঞ্চল এখন গদিচ্যুত। সেই বীরপুঙ্গবই শোনায়—চঞ্চলে কি করবেক হে? গাঁয়ের মাথাটি হেঁট করে চলে যাবে, তা সইব লাই। চলো—

অজ পাড়াগ্রাম। আমাদের নিয়ে গিয়ে ওদের ক্লাবঘরে তুলেছে। উঁচু পুকুরের পাড়—সেখানে খড়ের লম্বা ঘরটাই ওদের লাইব্রেরি-কাম-ক্লাবঘর, গ্রামের বাইরেই।

ওদের দলপতির নাম ভূষণ। সে-ই বলে— আজ গোলমালে মাছটাছ ধরানো হয়নি, ছাগল কাটাও হল না। এদের মহেশবাবুর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আন। কাল দেখা যাবে।

ক্লাবের নীচে পুকুরে স্নান করে গ্রামের মধ্যে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে খেতে গেলাম। হোঁৎকা খেতে বসেই গুম হয়ে গেছে। লাল বোগড়া চালের ভাত, হড়হড়ে বিরিকলাই-এর ডাল, ডিংলার তরকারি, তৎসহ আলুপোস্ত আর টম্যাটোর উগ্র টক।

হোঁৎকা বলে—পটলা, হেই চঞ্চলদা কনে গ্যাল র‍্যা, ঘেঁটো রুই, মাংস—হালায় গুল দিবার জায়গা পায় নাই।

চঞ্চলদাকে ওরা পাত্তাই দেয়নি, এখন আমরা এদের ডিরেক্ট চার্জে এসে গেছি। হাঁড়িতে জিইয়ে রাখা কইমাছের মত। হোঁৎকা কোনোরকমে খাওয়া সেরে উঠল।

সন্ধ্যার পর থেকেই আটচালায় লোকের ভিড় শুরু হয়েছে। ফাঁকা মাঠে চট, তালাই পেতে ওরা সপরিবারে বসেছে, কেউ দিনভোর মাঠে ধান কেটে এসেছে গান শুনতে। ভটভট শব্দে জেনারেটার চলেছে। তার লাল নীল বেগুনি আলোয় কানা বিশে গো গো চশমা পরে মাইকে বাজানো ডিস্‌কো বাজনার তালে বেতালে বিকটভাবে লম্ফ-ঝম্ফ করে চলেছে।

চড় চড় শব্দে দর্শকবৃন্দের হাততালি পড়ে। কারা আবার চিৎকার করে—এঙ্কোর এঙ্কোর—অর্থাৎ আবার লাগাও।

আমি নজর রেখেছি সেই আগেকার দল যেন কোনো গোলমাল না করে। অবশ্য সে ব্যাপারে ভূষণ-চঞ্চলদারাও সজাগ। তাদের দেখাও যায় না।

এবার পটলার অমর অবদান 'আমরা কারা' নাটক শুরু হল। ইঙ্গিত-ধর্মী নাটক, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্রেফ পা-হাত ছুঁড়ে গতিময়তা, নাটকীয় মূহূর্ত আনতে চেষ্টা করছি,আর নাটকের চরিত্রগুলোও দুর্বোধ্য, পটলাই তার মানে জানে। (অবশ্য মানে টানে শুধোলে পটলাও চটে যায়) তবু ওই চট-তালাই-এর শ্রোতারা কেবল হাততালি দিয়ে চলেছে। কলকাতার নাটক না বুঝতে পারলে নাকি তাদের গেঁইয়া বলবে। তাই ঘনঘন মাথা নেড়ে হাততালি দিচ্ছে।

পটলার সরল পুঁটির মত জীর্ণ বুকের খাঁচাটা ফুলে ওঠে। বলে সে—দেখছিস কেমন নাটক বোঝে এরা?

অবশ্য এ নাটক বিশেষ কোথাও পুরোপুরি ভাবে শেষ করতে পারিনি। কোথাও ইট্, কোথাও আধলা, কোথাও টম্যাটো, কোথাও পচা ডিম, আবার কোথাও স্রেফ চিৎকার করে পিনিক দিয়ে আমাদের ড্রপ ফেলতে বাধ্য করিয়েছে। এখানে সেটা হল না। নাটক শেষ হল। পটলা আর গোবরা দুজনে কুস্তির পোজে দাঁড়াল—লাল আলো পড়ল, আর হাততালি-সিটি সমানে চলেছে।

পটলা খুব খুশি, পুরো নাটক হয়েছে। বলেসে— রিয়েল নাট্যপ্রেমীদের জায়গা। কাল ভাবছি আর একটা নাটক 'আধখানা রুটি' করব।

হোঁৎকা রাতেও খেতে বসে দেখে কুমড়োর ঘ্যাঁট উইথ সজনে ডাঁটা, আর চিংড়িমাছের টক।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—তুই একাই নাটক করোস। আমরা কাল ভোরেই চইলা যামু। এই হালায় ঘেঁটো রুই, এই তগোর মাংস।

রাত হয়েছে। একটু ঝিমুনি এসেছে। হঠাৎ দরজাটা কাদের বাইরে থেকে বন্ধ করতে দেখে চাইলাম। সারা গ্রাম নাটক দেখে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। নিশুতি গ্রাম। হঠাৎ বাইরে থেকে কাদের দরজা বন্ধ করতে দেখে চমকে উঠি।

এ্যাই! কে—কে?

সাড়া নেই। দরজাটা বাইরে থেকে শিকল তোলা। খোলার উপায় নেই। হঠাৎ দেখা যায় খোলা জানালা দুটোর সামনে দুটো আংরা ভর্তি মালসা, আগুনের তাপ গনগন করছে, আর সেই জ্বলন্ত আংরার উপর কি ফেলে ফুঁ দিয়ে সমস্ত ধোঁয়া দুটো জানলা দিয়ে এই বদ্ধ ঘরে ঠেলে দিচ্ছে।

পরক্ষণেই বুঝতে পারি ব্যাপারটা। পটলা বিকট শব্দে হাঁচছে— গোবরাও। উৎকৃষ্ট পাটনাই সুপক্ক লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছে ওই মালসায় আর লঙ্কাপোড়ার ঝাঁঝালো সব ধোঁয়াটা এসে ঢুকছে এই বদ্ধ ঘরে।

নাক জ্বালা করছে, চোখমুখ দিয়ে জল ঝরছে আর হাঁচি। ঘরসুদ্ধ সবাই হাঁচছি, চিৎকার করার মত দমও নেই। মনে হয় এই বদ্ধ ঘরে হাঁচতে হাঁচতেই শেষ হয়ে যাবে। পটলার নাটকের জন্য শহিদ হতেই হবে বোধ হয়।

বইঘর.কম

ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে উঠেছে। ভিতরে একটা চাপা আর্তনাদ, হাঁচির শব্দ ওঠে। হোঁৎকা প্রাকৃতিক ব্যাপারে বাইরে এসেছিল, হঠাৎ ওই লঙ্কাপোড়ার ব্যাপার দেখে সে হকচকিয়ে গেছে। তারার আলোয় দেখা যায় রাস্তায় প্রথম দেখা সেই গোঁফওয়ালা ছেলেটাই তার দলবল নিয়ে এসেছে এবার এদের সযুত করতে।

ওরা তাক বুঝে ধোঁয়া দিচ্ছে, হোঁৎকাও অতর্কিতে লাফ দিয়ে পড়ে ওর পুরুষ্টু গোঁফজোড়াটা হাতে পাক দিয়ে দড়ির মত ধরেছে, অন্যটার মাথার লম্বা চুল ধরে দুটোকে মালসার আগুনে মাথাগুলো এনে ফেলতেই ওরাও লঙ্কার ঝাঁঝে বিকট শব্দে হেঁচে ওঠে।

অন্য দুজন বেগতিক দেখে মালসা ফেলে হাওয়া।

এ দুটো বন্দি ইঁদুরছানার মত চিঁ চিঁ করছে আর হাঁচছে বিকট শব্দে। ঘরের ভিতর থেকে পটলা-গোবরারা চিৎকার করছে।

সারা গ্রামের লোকজন জেগে গেছে, আবার লাঠি সড়কি নিয়ে তারা চিৎকার করে এসে হাজির হয়।

লম্বা চুলওয়ালা তখন প্রাণের দায়ে হোঁৎকার হাতে একগোছা চুল রেখে পালাবার জন্য লম্ফ দিতে টাল খেয়ে উঁচু পাড় গড়িয়ে শীতের রাতে ভাদুরে পাকা তালের মত বহু নীচে পুকুরের কাদাজলে পড়েছে।

গ্রামের জনগণ তখন পুকুর ঘিরে তার সন্ধান করছে আর গোঁফওয়ালা ওই বাহারি গোঁফের জন্যই বমাল ধরা পড়ে গেল লঙ্কাগুঁড়ো আংরার মালসা সমেত।

এবার মুক্ত হয়ে আমরাও ঘোষণা করি—এখানে কোনো ভদ্রলোকের বাস নাই। ডেকে এনে নাটক করিয়ে প্রাণে মারতে চায় এরা।

এবার গ্রামের মহেশবাবু আরও দুচারজন মাতব্বর এগিয়ে এসে ভূষণদেরই কড়া স্বরে বলেন—এভাবে গ্রামের বদনাম হতে দেবো কেন?

ভোরবেলাতেই জাল নেমেছে পুকুরে। ক্লাবঘর থেকে মহেশবাবুর চকমিলানো বাড়ির বৈঠকখানার ফরাসে এসেছি। আর আট দশ কেজি নধর মাছ, তাজা খাসি, আর সেই হাঁড়িভাঙা জমাট দই— সব কিছুর আয়োজনই করেছেন মহেশবাবু।

পটলা বলে—তাহলে আর একপালা হোক 'আধখানা রুটি।' আমি ভয়ে ভয়ে শুধোই—আর 'লঙ্কা দহন' হবে না তো?

মহেশবাবু বলেন—সে হনুমানদের মেরে হাড় ভেঙে ফেলে রেখেছি। শুনে চুপ করে যাই। হাড়ভাঙা বসন্তপুর থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরুতে পারলে বাঁচি।

———